শরৎপ্রসঙ্গ

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

ভাব ও লেখা
১০এ, তেলিপাড়া রোড, কলিকাতা-[illegible]

প্রচ্ছদ অঙ্কনে :
শ্রীবিভূতি সেনগুপ্ত
৭।১ বিধান সরণি, কলি-৬

ব্লক মেকার :
ইউনিয়ন প্রসেস সার্ভিস
৮৫ বি, সিমলা স্ট্রীট, কলি-৬

পুস্তক মুদ্রণে :
নিউ সর্বমঙ্গলা প্রেস
১।১-এ, বৈষ্ণব সম্মিলনী লেন, কলি-

প্রচ্ছদ ও অন্যান্য ছবি মুদ্রণে :
মোহন প্রেস
২, কার্তিক বোস স্ট্রীট, কলি—৯

পুস্তক গ্রন্থনায়
শ্রীবিদ্যাসাগর বাইন্ডিং ওয়ার্কস্
[illegible] স্ট্রীট, কলি-৬

উৎসর্গ

যাঁদের অকৃত্রিম, পবিত্র এবং পুণ্য আশীর্ব্বাদ ও শুভেচ্ছায় এই অসম্ভব কাজ সম্ভব হলো সেই মহাযোগী প্রীতিকুমার, মহাসাধিকা গুরুমা এবং রাজর্ষি বঙ্গ-হরিদার করকমলে আমার এই গ্রন্থখানি উৎসর্গ করছি।

—এই লেখকের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ—

১। পরম ভাগবত মহাত্মা কবির
২। বিশ্বনাথ শ্রীশ্রীতৈলঙ্গস্বামী
৩। ব্রজবিদেহী সন্তদাস বাবাজী
৪। কামরূপ কামাখ্যা
৫। মহানায়ক মুজিবুর
৬। জানবাজারের রাণীমা
৭। যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ
৮। শ্রীমা সারদামণি
৯। যুগাচার্য বিবেকানন্দ
১০। শত শহীদের রক্তে,
১১। অগ্নিযুগের নায়ক
১২। চাঁদের দেশে সুনীলকুমার
১৩। চাঁদের দেশে গেল যারা
১৪। আমাদের বাপুজী
১৫। যুগপুরুষ বিদ্যাসাগর
১৬। লাল গোলাপ ধূসর আকাশ
১৭। কামনার আগুনে
১৮। পেয়েছি অন্যমনে
১৯। গদীর লড়াই
২০। উড়িষ্যার পথে ইত্যাদি।

ভূমিকা

শরৎসাহিত্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় অভিযোগ ছিল এই যে, যে বস্তুমূল্য নিয়ত পরিবর্তনশীল বাজারদরের মতই ক্রমাগত ওঠানামা করে, যা একান্তভাবে তাৎক্ষনিক ও ব্যবহারিক তাই দিয়ে জগৎ ও জীবনের সব কিছুকে ওজন করে দেখতেন শরৎচন্দ্র। অভিযোগ ছিল এই যে, সমাজ ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে একটু ঢের বেশী মাথা ঘামাতেন তিনি। অর্থাৎ কিনা সংস্কারসর্বস্ব ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত সমাজজীবনের দুঃসহ সমস্যা জালে লাঞ্ছিত ও প্রতিহত মানবাত্মার সমস্ত দুঃখকে শোধন করে নিতে গিয়ে সমবেদনার এক সীমাহীন সমুদ্রের বিশাল স্রোতাবর্তে তাঁর সাহিত্যাদর্শের চিরায়ত ভিত্তিভূমিটিকে নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছিলেন শরৎচন্দ্র। তাঁর সমাজচেতনাজর্জর বাস্তব জীবনবোধের খণ্ডিত প্রেক্ষিত ভূমি ছেড়ে উর্ধ্বে উঠে গিয়ে চিরন্তন মূল্যবোধের আরও উজ্জ্বল এক মহাকাশে উত্তীর্ণ হতে পারেনি তাঁর শিল্পাদর্শ। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না শরৎচন্দ্র ছিলেন ঔপন্যাসিক এবং উপন্যাস মূলতঃ, স্বরূপতঃ ও প্রধানতঃ সমাজচেতনানির্ভর জীবনধর্মী সাহিত্য। 'অন্তর হতে বচন আহরি' কবিরা যে আনন্দলোক বিরচন করেন, ঔপন্যাসিকদের সে আনন্দলোক বিরচন করতে হয় সমাজ পরিবেশ হতে উপাদান সংগ্রহ করে। সুতরাং চলতি কালের চাঞ্চল্যক্লিন্ন যুগানুবর্তিতা হতে মুক্ত হয়ে চিরন্তন মূল্যবোধের আকাশে যদি বিচরণ করতে না পারেন ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র তাহলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। তাছাড়া বিশেষ করে জীবনধর্মী সাহিত্যে যুগানুবর্তিতা এমন কিছু দোষের কথা নয়। এমারসন তাঁর Essay on Art প্রবন্ধে বলেছেন, 'No man can emancipate from the age in which he lives and breathes' সমসাময়িক যুগপ্রভাব হতে কোন মানুষেই বিচ্ছিন্ন করতে পারে না নিজেকে। তবে দেখতে হবে এই যুগানুবর্তিতার আবর্তে তার সমগ্র জীবনচেতনা বা শিল্পবোধ যেন নিঃশেষে তলিয়ে না যায়। পরিবার বা সমাজজীবনকেন্দ্রিক যুগানুবর্তিতা চিরায়ত (Classic) সাহিত্যের ভিত্তি হিসাবে বিবেচিত হলেও শুধু এই যুগানুবর্তিতার আবর্তে শোচনীয়ভাবে ঘুরপাক খেয়ে আর সমাজজীবনের বাস্তব প্রতিচ্ছবি যথাযথভাবে চিত্রিত করেই কোন সাহিত্যই মহৎ সাহিত্যের গৌরব অর্জন করতে পারে না। সমকালীন খণ্ড জীবনবোধের পঙ্কিল জলাশয়ের

মধ্যে জন্মগ্রহণ করেও যে সাহিত্য সূর্য্যাভিমানিনী পদ্মের মত তার সুবাসিত পাপড়িগুলিকে বৃহত্তর ও মহত্তর জীবনাদর্শের এক উজ্জ্বল অভিসারে মেলে ধরতে পারে, একমাত্র সেই সাহিত্যই লাভ করবে মহৎ সাহিত্যের মর্যাদা। এই মহত্তর জীবনাদর্শকেই পাশ্চাত্যের সমালোচকরা বলেছেন 'the illusion of a higher reality বাস্তব জীবনচেতনার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবাতীত বৃহত্তর এক জীবনসত্যের আভাসে সিঞ্চিত বা সমৃদ্ধ না হলে সাহিত্য হয়ে উঠবে নিছক সাংবাদিকতা, শিল্প হয়ে উঠবে ফটোগ্রাফি। পল্লীসমাজ, বামুনের মেয়ে প্রভৃতি সামাজিক উপন্যাসগুলিকে যে বৃহত্তর জীবনসত্যের আভাসে আভাসিত করে তুলতে পারেননি শরৎচন্দ্র সে জীবনসত্যের আভাস এক উজ্জ্বল বোধায়ত রূপ পরিগ্রহ করেছে তাঁর মহেশ শীর্ষক ছোট গল্পটিতে। মহেশের মৃত্যুর পর কন্যা আমিনার হাত ধরে বেরিয়ে যাওয়া সর্বহারা গফুর নক্ষত্রখচিত অন্ধকার আকাশের পানে মুখ তুলে আল্লার কাছে যে আর্জি পেশ করেছে, তার যে বুকফাটা মর্মবেদনাকে সে রাত্রির মৃদুশিহরিত বাতাসের কানে কানে ব্যক্ত করেছে তা প্রতিটি যুগের মানুষের মর্মকে স্পর্শ করবে। শোষিত সর্বহারা মানুষের অন্নকেন্দ্রিক এক মর্মবেদনাকে চিরন্তন শিল্পের মহৎ উপাদানে পরিণত করার এই [illegible] শুধু বাংলাসাহিত্যে নয়, সারা বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। মহেশ গল্পে শরৎচন্দ্র যা পেরেছেন চিত্রা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'দুইবিঘা জমি' কবিতাটিতে সর্বহারা উপেনের মর্মবেদনাকে এক সার্থক কবিতার প্রকাশকলায় চিত্রিত করতে গিয়ে তা পারেননি রবীন্দ্রনাথ। জমিদার উপেনের ভিটেমাটি সব কেড়ে নিয়ে তাকে গ্রামছাড়া করলে পর উপেন যখন বলেছে, ভগবান তাকে মোহগর্তে রাখবে না বলেই দুবিঘার পরিবর্তে বিশ্বনিখিলটাই লিখে দিল তখন বেশ বুঝতে পারি, একথা উপেনের নয়, একথা রবীন্দ্রনাথের। অদ্বৈতবাদী ও বিশ্বাত্মবাদী রবীন্দ্রনাথ অতিসূক্ষ্ম অপার্থিব এক আধ্যাত্মিক তৃপ্তির প্রলেপ দিয়ে উপেনের পার্থিব ক্ষয়ক্ষতির প্রচণ্ড জ্বালাযন্ত্রনাকে শান্ত করতে চেয়েছেন। এখানে উপেনের ব্যক্তিগত অনুভূতিটিকে শৈল্পিক ক্রমবিন্যাসের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে বিশ্বানুভূতির অতীন্দ্রিয় স্তরে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়নি। তার এই অনুভূতির মাঝখানে অকস্মাৎ এক কৃত্রিম বিশ্বানুভূতির প্রকাশ ঘটিয়ে শিল্পরসের হানি করা হয়েছে। একমাত্র অধ্যাত্মসাধনালব্ধ মহাজীবনের এক গূঢ় নিটোল উপলব্ধি হতে বেরিয়ে আসে যে কথা সে কথা উপেনের মত সাধারণ লোকের মুখে একেবারে বেমানান।

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ যে অভিযোগ এনেছিলেন তার আর একটা

কারণ ছিল এই যে রবীন্দ্রনাথ আশঙ্কা করেছিলেন যে প্রকৃতিবাদের (Naturalism) দ্বারা তৎকালীন ইউরোপীয় ঔপন্যাসিকগণ প্রভাবিত হয়ে পড়েছিলেন বিশেষভাবে সেই প্রকৃতিবাদ শরৎচন্দ্রের সহিত্যাদর্শকেও আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। প্রকৃতিবাদের অর্থ হলো জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক বস্তুসাপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ; বস্তুকে তার যথার্থ স্বরূপে ও সেই স্বরূপকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার এক মতবাদ। শরৎচন্দ্র তাঁর শ্রীকান্তের প্রথম পর্বে প্রথম অনুচ্ছেদে নিজেও একথা স্বীকার করেছেন যে তিনি বহির্জগতের প্রতিটি বস্তুকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখেন এবং তাঁর আত্মভাবের দ্বারা সেই স্বরূপকে কোনভাবে প্রভাবিত বা খর্ব করেন না। কিন্তু আমার মনে হয় ইংলণ্ডের ডিকেন্স, গলসওয়ার্দি, জর্জ এলিয়ট ও ফ্রান্সের ব্যালজাক, ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা ও মপার্সাঁ যে অর্থে প্রকৃতিবাদী ছিলেন শরৎচন্দ্র কিন্তু সে অর্থে প্রকৃতিবাদী ছিলেন না। তাঁর প্রকৃতিবাদের সঙ্গে সংমিশ্রিত ছিল ইউরোপীয় উদারনীতিবাদ (Liberalism) ও হিতবাদ (Utilitarianism)। এই সব তত্ত্বগুলিকে শরৎচন্দ্র সচেতনভাবে অনুসরণ না করলেও এগুলি তাঁর সাহিত্যাদর্শের মধ্যে এক একটি সক্রিয় উপাদান হিসাবে কাজ করেছে। শুচিশুভ্র যে উদার ছন্দে পরিপূর্ণ ছিল শরৎচন্দ্রের অন্তর, জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে যে কোন মানুষের প্রতি যে দরদ এক অগাধ প্রাচুর্যে ও স্বতস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে উত্তাল হয়ে উঠত সবসময় তাঁর মনে, সে ছন্দ সে দরদের মূলে ছিল উদারনীতিবাদ আর হিতবাদের অবদান। শচৎচন্দ্র নিজের মুখে স্বীকার করলেও এই দরদের নির্বিচার বিবতরণ আর অমিত উচ্ছ্বাস বস্তুকে তার যথার্থ স্বরূপে দেখতে দেয়নি তাঁকে। কোন চরিত্র সৃষ্টি করতে গিয়ে শরৎচন্দ্র এক আকর্ষণীয় দরদ ও মমতায় এমন অহেতুক বিচলিত হয়ে উঠতেন যে সেই চরিত্র সম্পর্কে কোন নিষ্ঠুর সত্য ফুটিয়ে তুলতে পারতেন না তিনি। এই জন্য একমাত্র দত্তা উপন্যাসের রাসবিহারি ছাড়া প্রকৃত বড় চরিত্র পাওয়াই যায় না শরৎসাহিত্যে। তাঁর কোন পুরুষ বা নারীচরিত্র কোন অন্যায় বা পাপকর্ম করতে না করতেই শরৎচন্দ্র নিজেই তাঁর সেই শুচিশুভ্র দয়ার ছন্দ দিয়ে সে পাপ ধুয়ে মুছে দিতেন।

কেউ যদি বলেন শরৎচন্দ্রের সমাজচেতনা ছিল খণ্ডিত তাহলে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। কারণ তিনি তৎকালীন সমাজজীবনের সমস্যা বলতে বুঝেছিলেন কৌলীন্যপ্রথা আর অস্পৃশ্যতা। সেকালের সাম্রাজ্যবাদী শোষনভিত্তিক সমাজব্যবস্থায় যে দারিদ্র্য ছিল অস্পৃশ্যতা হতেও ভয়াবহ যা এক

শ্রেণীর সমর্থ মানুষকে কেন্দ্রচ্যুত করে হতাশার অতল গর্ভে নিক্ষেপ করেছিল সেই দারিদ্র্য বা অর্থনৈতিক সমস্যার কথা একমাত্র মহেশ গল্পে গফুরের কণ্ঠে ছাড়া আর কোথাও সোচ্চার হয়ে ওঠেনি। অভাগীর স্বর্গ গল্পেও এর কুফল কিছু প্রত্যক্ষ করা যায়। আসলে কৌলীন্যপ্রথা, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি কুফলগুলি দরিদ্র জনগণকেই ভোগ করতে হত কারণ যাঁরা ছিলেন সামাজিক ন্যায় অন্যায়ের বিচারকর্তা তাঁরা ছিলেন সুবিধা ভোগকারী শ্রেণীভুক্ত ধনী জমিদার জোতদার দল। তাছাড়া কেউ যদি বলেন কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ, অস্পৃশ্যতা প্রভৃতি সামাজিক সমস্যাব্যাধিকে বিভিন্ন উপন্যাসে ফুটিয়ে তুললেও শরৎচন্দ্রের নির্জ্জন মনের স্তরে ব্রাহ্মণ্যধর্মশাসিত সমাজব্যবস্থার প্রতি এক প্রচ্ছন্ন দরদ ছিল তাহলে সেকথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না, কারণ তাঁর সৃষ্ট কোন চরিত্রতেই এই সব সমস্যার বিরুদ্ধে কখনো কোন আক্রমণাত্মক উদ্যম উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়তে দেখা যায়নি। ফলে সেই illusion of higher reality বা বৃহত্তর জীবনসত্যের আভাস হতে বঞ্চিত হয়েছে উপন্যাসগুলি।

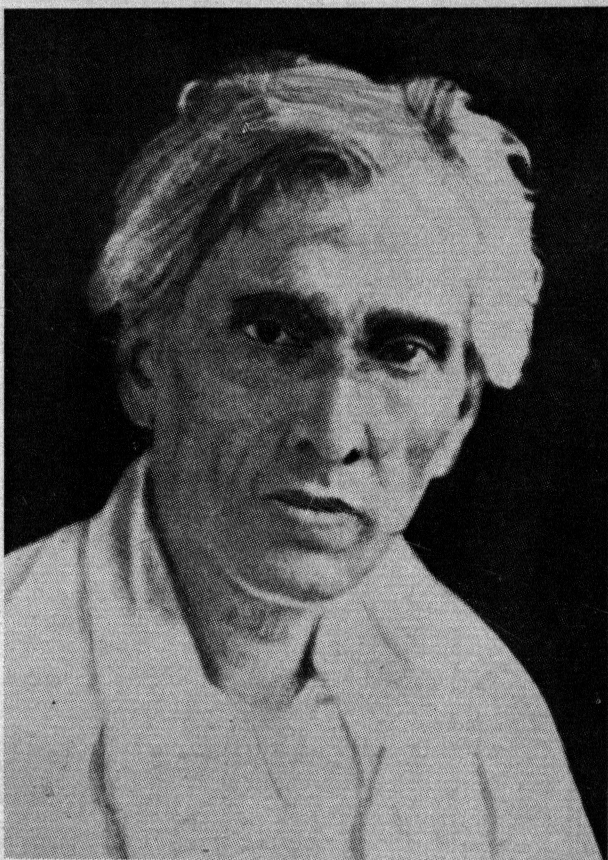
শরৎচন্দ্রের সমস্ত উপন্যাসগুলিকে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে—পারিবারিক, সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক। আমার মনে হয় একমাত্র নিষ্কৃতি, মেজদিদি, বড়দিদি প্রভৃতি পারিবারিক উপন্যাসগুলিতে সর্বাধিক সার্থকর্তা লাভ করেছেন শরৎচন্দ্র। এইসব উপন্যাসে নারীচরিত্রগুলিও সার্থক হয়ে উঠেছে সর্বাংশে। কিন্তু সমাজসমস্যাভিত্তিক বা মানবমনের সমস্যাভিত্তিক যে সব উপন্যাসে নারীরা তাদের পারিবারিক গণ্ডী ছেড়ে সামাজিক ঘূর্ণ্যাবর্তে এসে পড়েছে কোন না কোন কারণে সেখানে লেখকের ধর্মভিত্তিক এক গ্রাম্য নীতিচেতনার দ্বারা বারবার নিয়ন্ত্রিত হয়েছে সে সব নারীচরিত্রগুলি। অভাবের তাড়নায় লম্পট জমিদারের লালসার কাছে নিজেকে বলি দিতে গিয়েও তা পারেনি বিরাজবৌ। মেসের ঝি সাবিত্রী সতীশের সঙ্গে নির্জন আলাপে রত হয়েও অক্ষতযৌবনা। দিবাকর-কিরণময়ী স্বামীস্ত্রীর মত বাস করলেও অক্ষত রয়ে যায় তাদের দেহের শুচিতা। এক গোঁড়া নীতিচেতনার রহস্যময় কলকাঠি অলক্ষ্যে থেকে নিয়ন্ত্রিত করেছে এই সব চরিত্রগুলিকে। শেষপ্রশ্নের কমল এদের মধ্যে এক উজ্জ্বল ব্যতিক্রম হলেও এক তত্ত্বপ্রধান কৃত্রিমতায় কমলের সমস্ত সংলাপ কণ্টকিত হওয়ায় জীবনরসসিক্ত হয়ে উঠতে পারেনি চরিত্রটি। কিন্তু নীতিবাদীদের মনে রাখা উচিত মানুষের অনেক ভাল কর্ম-প্রেরণা (motivation) স্থূল নীতিচেতনার জালে ধরা পড়ে না। প্রসিদ্ধ সমালোচক I. A. Richard তাই

বলেছেন : 'Yet since the fine conduct of life springs only from fine ordering of responses for too subtle to be touched by any general ethical maxims, this neglect of art by the moralist has been tantamount to disqualification,' অর্থাৎ যে শিল্পী নীতির খাতিরে মানবমনের অনেক উৎকৃষ্ট প্রেষণাকে এড়িয়ে যান তিনি শিল্পীর ধর্ম হতেই বিচ্যুত হয়ে পড়েন। দার্শনিক শোপেনহাওয়ায়ের 'will to reprouduce' তত্ত্ব বা প্রজননভিত্তিক কামচেতনার দ্বারা চরিত্রহীনের কিরণময়ী কিছুটা প্রভাবিত হলেও প্রেমচেতনার দিক থেকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মত ভাববাদী প্রেমাদর্শের সাধক। বড় প্রেম শুধু কাছেই থাকে না, মানুষকে দূরেও টানে। দেহলালসাবর্জিত স্বার্থসম্পর্কবিহীন মহৎ প্রেম এক দূরান্বিত প্রত্যয়ের এক সুবাসিত পিপাসায় আর্ত হয়ে দূর হতে দূরে ছুটে চলে। ইংরাজ কবি শেলী যাকে বলেছেন devotion to something afar. বড়দিদি সুরেন, রাজলক্ষ্মী-শ্রীকান্ত ও কিরণময়ী-উপেনের মধ্যে এই প্রেমচেতনা মূর্ত হয়ে উঠলেও এর পূর্ণ পরিণতি দেখা যায় শেষপ্রশ্নে- যেখানে ক্ষণিকত্ববাদী রবার্ট ব্রাউনিং-এর মত শরৎচন্দ্রও মুহূর্তের মর্ত্যপ্রেমের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন অনন্তের স্বর্গীয় সুষমা।

পরিশেষে বলা দরকার কোন স্বল্পপরিসর নিবন্ধের মধ্যে শরৎপ্রতিভার যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয়। তবে এই গ্রন্থটিতে প্রকাশিত সুনির্বাচিত নিবন্ধগুলি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসৃষ্টির বিচিত্র বিশাল ক্ষেত্রটিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোকিত করে তুলবে নিঃসন্দেহে। সেই আলোকোদ্ভাসে শরৎচন্দ্রের জীবন ও কর্মের অনেক কিছুকে যথার্থ স্বরূপে দেখতে পাবেন পাঠকবর্গ এবং তাঁর সম্বন্ধে লাভ করবেন এক পরিপূর্ণ ধারণা। এইখানেই গ্রন্থটির সার্থকতা। এদিক দিয়ে সম্পাদক মহাশয়ের প্রচেষ্টা সত্যিই প্রশংসার্হ।

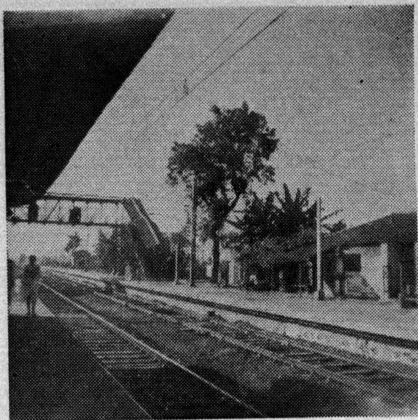
শ্রীসুধাংশু রঞ্জন ঘোষ

সূচীপত্র



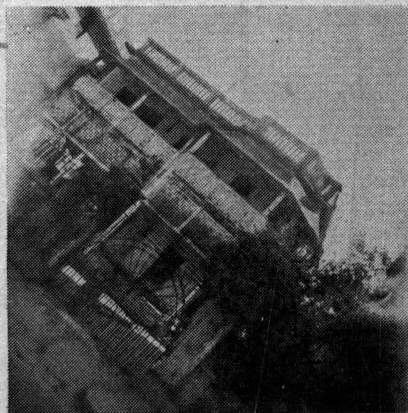
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

জন্ম : ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩। মৃত্যু : ২রা মাঘ, ১৩৪৪।



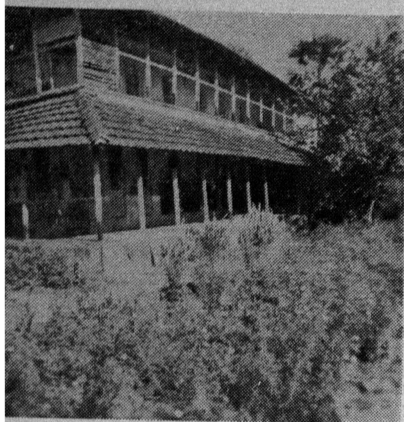
দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের 'দেউলটি' স্টেশন। এখানে নেমে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের পল্লীগৃহে যেতে হয়।

(ফটো লেখক কর্তৃক গৃহীত)



দক্ষিণ কোলকাতার বালীগঞ্জে ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডে শরৎচন্দ্রের বসতবাড়ী।

(ফটো লেখক কর্তৃক গৃহীত)



সামতাবেড়ে শরৎচন্দ্রের বাস্তুভিটা।

(ফটো লেখক কর্তৃক গৃহীত)



সামতাবেড়ের বাড়ীসংলগ্ন প্রান্তরে শরৎচন্দ্র
ও তাঁর মেজ ভাই প্রভাসচন্দ্রের
(স্বামী বেদানন্দ) সমাধি।

(ফটো লেখক কর্তৃক গৃহীত)

আচ্ছা আপনার ন্যাড়াকে একটু শাসন করতে পারেন না। অভিযোগের সুরে কথাটি বললেন দেবানন্দপুর পাঠশালার প্যারী পণ্ডিত কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পিতামহীকে উদ্দেশ্য করে।

পিতামহী পণ্ডিত মশাইকে জিজ্ঞেস করলেন, কেন, কি হয়েছে? ওর বয়েস তো মাত্র পাঁচ বছর। এই বয়সে ও এমন কি অপরাধ করেছে?

এমন কি অপরাধ? রাগে ফুঁসতে লাগলেন প্যারী পণ্ডিত। অপরাধ অনেক করেছে ও, এখনো করে। আপনার নাতিকে ভালভাবে শিক্ষা দেবেন এবার থেকে, এই আমি বলে যাচ্ছি।

আহা, অতো, রাগ করছেন কেন? বলুন না কি অপরাধ করেছে আমার ন্যাড়া। বললেন কথাশিল্পীর পিতামহী।

পণ্ডিতমশাই তখন রাগের সুরে বলতে আরম্ভ করলেন, আপনার নাতি এত দুষ্টু যে লঘুগুরু জ্ঞান নেই। আমি কলকেতে টিকে ধরিয়ে তামাক খেতে যাব, ওমা, দেখি যে হুকোর মুখ দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না।

ব্যাপারটা কি জানবার জন্যে কলকেটা নেড়ে চেড়ে দেখতে গিয়ে দেখতে পেলুম ওর ভেতরে তামাক নেই। তার জায়গায় কে যেন কয়েকটি ইটের টুকরো রেখে দিয়েছে।

আমি তখন পাঁচজন ছেলেকে জিজ্ঞেস করলুম, ব্যাপারটা কি? অনেকে আমার কথার জবাব দিলে না। তবে একটি ছেলে আপনার নাতিকে দেখিয়ে বললে, ও করেছে।

তখন আমি আপনার নাতিকে ধরতে যাব ভাবছি এমন সময় ও একদৌড়ে পাঠশালা ছেড়ে অনেকদূর চলে গেছে। যাবার সময় যে ছেলেটি ওর গুণের কথা আমাকে বলেছিল তাকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েছে। এইতো আপনার নাতির কাণ্ড। আর কি শুনতে চান বলুন।

এই হচ্ছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের দুরন্তপনার এক কাহিনী। তিনি ছেলেবেলায় সত্যি অত্যন্ত দুরন্ত ও ডানপিটে ছিলেন। তাঁর এই স্বভাব তাঁর মহান জীবন ও চরিত্রের সঙ্গে আদৌ অসামঞ্জস্য ছিল না। এইটাই ছিল সত্যিকার এবং স্বাভাবিক স্বভাব। কারণ এই সংসারে যাঁরা জগৎজোড়া নামের অধিকারী হয়ে বহুজনের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ হিসেবে অন্তরের একান্ত ভক্তিশ্রদ্ধা পাচ্ছেন তাঁরা প্রথম জীবনে অতিশয় দুরন্ত ছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা অপর পাঁচজন সাধারণ শিশুদের মত জীবন যাপন করতেন না। তাঁদের

জীবনে অস্বাভাবিক ব্যতিক্রম দেখা গেছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে কয়েকজন মহামানবের নাম করা যেতে পারে। শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, স্বামী বিবেকানন্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রমুখ মনীষী ও মহাপুরুষের বাল্যজীবন ছিল অত্যন্ত চাপল্যময়।

আমাদের মহান প্রতিভাশালী অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবন যে শান্তশিষ্ট থাকবে এটা অনেকেই আশা করতে পারেন না। অন্ততঃ যাঁরা মহাপুরুষ বা অতিমানবদের বাল্যজীবনের ঘটনাবলী প্রসঙ্গে ওয়াকিবহাল আছেন।

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে (বাংলা ১২৮৩ সালের ৩১শে ভাদ্র) হুগলীজেলার দেবানন্দপুর গ্রামের এক সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

শরৎচন্দ্রের পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী।

বাংলার আরও কয়েকজন মহাপুরুষের জন্মস্থানরূপে এই হুগলী জেলা ধন্য। তাঁরা হলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, যুগনায়ক ও যুগপ্রবর্তক রাজা রামমোহন রায় এবং একালের শ্রেষ্ঠ ঋষি শ্রীঅরবিন্দের পিতা কে. ডি. ঘোষ।

মতিলালের পাঁচ পুত্রের মধ্যে শরৎচন্দ্রই ছিলেন জ্যেষ্ঠ। অন্যান্য পুত্রদের মধ্যে দু'জন জন্মের পর মারা যান। তারপর চতুর্থ পুত্র প্রভাসচন্দ্র এবং পঞ্চম পুত্র প্রকাশচন্দ্রের জন্ম হয়। এছাড়া মতিলালের দুই কন্যা সন্তানও ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠা হলেন অনিলাদেবী এবং কনিষ্ঠা সুশীলাদেবী।

দেবানন্দপুরে জন্মগ্রহণ করলেও শরৎচন্দ্রের পৈতৃক বাসভূমি ছিল ২৪-পরগনা জেলার কাঁচড়াপাড়ার কাছে মামুদপুর গ্রামে। দেবানন্দপুরে ছিল শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের মামার বাড়ী।

মতিলালের পিতা ছিলেন খুব নির্ভীক ও স্বাধীন প্রকৃতির মানুষ। তিনি স্থানীয় জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন বলে জমিদারের ষড়যন্ত্রে তাঁকে অকালমৃত্যু বরণ করতে হয়।

ঐসময় মতিলালের বয়স ছিল কম। তাই মতিলালের মা নিরুপায় হয়ে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ীতে চলে আসেন। ছেলেবেলায় মতিলাল মামার বাড়ীতেই মানুষ হন। পরে বড় হয়ে মামুদপুরে আর ফিরে যান নি। দেবানন্দপুরেই বাড়ী করে সেখানে বসবাস করেন।

মতিলালের মামারা তাঁদের বাড়ীসংলগ্ন চার কাঠা আন্দাজ বাগানজমি

মতিলালকে বাস করবার জন্যে দেন। মতিলাল সেখানে একটি ছোট বাড়ী তৈরী করে বসবাস করতে লাগলেন।

অল্প বয়সে মতিলালের সঙ্গে হালিশহরের কেদার নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের মধ্যম কন্যা ভুবনমোহিনীর বিবাহ হয়।

কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তখন তাঁর অপর চার ছোট ভাই দীননাথ, মহেন্দ্র-নাথ, অমরনাথ ও অঘোরনাথকে নিয়ে ভাগলপুরে একসঙ্গে বসবাস করতেন।

কেদারনাথের পিতা রামধন গঙ্গোপাধ্যায়ই প্রথম হালিশহর ত্যাগ করে ভাগলপুরে যান। তিনি সেখানে উচ্চপদে সরকারী চাকরী করতেন। ভাগল-পুরের প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে শিক্ষায় ও অর্থে- এই গঙ্গোপাধ্যায়দের তখন খুব নামডাক ছিল।

কেদারনাথ তাঁর জামাতা মতিলালের পড়াশুনোর জন্যে তাঁকে দেবানন্দপুর থেকে ভাগলপুরে নিজেদের বাড়ীতে নিয়ে যান। তাই মতিলাল শ্বশুরবাড়ীতে থেকেই লেখাপড়া করতে লাগলেন। ভাগলপুর থেকে তিনি এনট্রান্স পাশ করেন।

এনট্রান্স পাশ করার পর পাটনা কলেজে তিনি কিছুদিন লেখাপড়া করেন।

কেদারনাথের ছোটভাই অঘোরনাথ ছিলেন মতিলালের সহপাঠী। তিনিও পাটনা কলেজে পড়াশুনো করতেন। ঐসময় তাঁরা দু'জনে একটি মেসে একই সঙ্গে বসবাস করতেন।

লেখাপড়া শিখলেও মতিলাল কিন্তু চাকরী করতেন না। তবে প্রথম জীবনে বিহারের ডিহিরিতে কিছুকাল চাকরী করতেন।

তাঁর কাছে চাকরীর বন্ধন আদৌ সহ্য হতো না। তিনি ছিলেন কাজকর্মে উদাসীন ও চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ। দিনের বেশীর ভাগ সময়ই বই পড়ে কাটাতেন। আসলে তিনি ছিলেন শিল্পী ও সাহিত্যিক। একদিকে তিনি যেমন গল্প, উপন্যাস, নাটক ও কবিতা লিখতে ভালবাসতেন অন্যদিকে তেমনি ছবি আঁকতেন। তবে তিনি কোন কাজ মনোযোগ দিয়ে করে যেতে পারেন নি। যে কাজ ধরতেন তা অল্পদূর এগিয়েই ছেড়ে দিতেন। তাই তাঁর সবরকম সৃষ্টির কাজই অসমাপ্ত থেকে যায়।

অর্থ উপার্জন করতেন না বলে মতিলালকে প্রথম প্রথম শ্বশুরবাড়ীর লোক-জনদের কাছ থেকে নানারকম কথা শুনতে হতো।

শ্বশুরবাড়ীর লোকদের এই কথা শোনার হাত থেকে দূরে থাকার জন্যেই

মতিলাল কখনো কখনো ভাগলপুর ছেড়ে সস্ত্রীক দেবানন্দপুরে চলে আসতেন।

মতিলাল যেরূপ চঞ্চল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন ভুবনমোহিনী ছিলেন তাঁর ঠিক বিপরীত স্বভাবের মানুষ। স্বামীর রোজগার নেই দেখে তিনি কোনদিন কোনরকম মন্দ কথা শোনাতেন না। ধনীর ঘরের মেয়ে হয়েও নীরবে কাজ করে যেতেন। ভুবনমোহিনী তাঁর পিতার একান্নবর্তী পরিবারে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতেন। তাঁর ছিল যথেষ্ট কর্তব্যজ্ঞান। তিনি নানারকম সদ্‌গুণের অধিকারিণী ছিলেন বলেই তাঁর ঘরে শরৎচন্দ্রের মত সুযোগ্য সন্তান জন্ম গ্রহণ করেন।

শরৎচন্দ্রের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তিনি দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হন।

উক্ত পাঠশালায় তাঁর সঙ্গে পড়তেন পণ্ডিত মশাইয়ের পুত্র কাশীনাথ।

ঐ পাঠশালায় অনেক ছাত্রছাত্রী পড়তে আসতো। শরৎচন্দ্র ছিলেন তাদের মধ্যে সকলের তুলনায় মেধাবী এবং দুরন্ত।

শরৎচন্দ্রের দুরন্তপনায় পাঠশালার ছাত্র-ছাত্রী-শিক্ষক সকলের মন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। কিন্তু তবু পণ্ডিতমশাই শরৎচন্দ্রকে কিছু বলতেন না। কেননা তাঁর ছেলে কাশীনাথ শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন।

তবু তিনি মাঝে মাঝে শরৎচন্দ্রের পিতামহীর কাছে গিয়ে শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে নালিশ জানাতেন।

পিতামহী গুরুমশাইকে বলতেন, ন্যাড়া এখন দুরন্ত আছে বটে কিন্তু বড় হলেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্রের মাথায় একবার কয়েকটি ফোঁড়া ও ঘা হয়। তার ফলে তাঁর মাথার অনেক চুল উঠে যায়। এই কারণেই শরৎচন্দ্রের পিতামহী তাঁকে আদর করে 'ন্যাড়া' বলে ডাকতেন।

কেবল পিতামহী কেন শরৎচন্দ্রের বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই তাঁকে ন্যাড়া বলে ডাকতেন।

পাঠশালায় পড়ার সময় কাশীনাথ বলে একটি ছাত্র যেমন শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন তেমনি একটি ছাত্রীও শরৎচন্দ্রকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁর চেয়ে ছাত্রীটি দু'-এক বছরের ছোট ছিল। সে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রায়ই গ্রামের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। ছিপ সংগ্রহ করা, মাছ ধরা, ঘুড়ির সুতোয় মান্‌জা দেওয়া প্রভৃতি ছিল তার কাজ।

এছাড়া মেয়েটার একটা অদ্ভুত খেয়াল ছিল। যখন বৈঁচি ফল হতো তখন

সে গাছ থেকে ফল তুলে মালা গেঁথে শরৎচন্দ্রকে উপহার দিতো। এই মেয়েটিই সম্ভবত উত্তর জীবনে শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস শ্রীকান্তের রাজলক্ষ্মীর রূপ নিয়েছে।

দেবানন্দপুরের স্থানীয় অধিবাসী সিদ্ধেশ্বর ভট্টাচার্য স্বগ্রামে একটি বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। শরৎচন্দ্রের পিতা শরৎচন্দ্রকে প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালা থেকে এনে সিদ্ধেশ্বর মাষ্টারের স্কুলে ভর্তি করে দেন।

ঐ স্কুলে শরৎচন্দ্র এক বছর যাবৎ পড়াশুনো করেন। এই সময়ে মতিলাল বিহারের ডিহিরিতে একটা চাকরী পান।

চাকরী পেয়েই মতিলাল সপরিবারে ডিহিরিতে চলে যান। ঐ সময় শরৎচন্দ্রের বয়স ছিল সাত-আট বছর।

মাত্র দু'তিন বছরের জন্যে মতিলাল ডিহিরিতে চাকরী করেন। শরৎচন্দ্র ঐ সময় তাঁর পিতামাতার সঙ্গে ডিহিরিতেই থাকেন।

ডিহিরির চাকরী শেষ হলে মতিলাল আবার সপরিবারে ভাগলপুরে শ্বশুরালয়ে ফিরে আসেন।

শরৎচন্দ্র তখন "বোধোদয়" পর্যন্ত পড়েছিলেন।

ভাগলপুরে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্র স্থানীয় দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়েস ছিল দশ বছর।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের পুত্র মনীন্দ্রনাথও ঐ সময় দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ের ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে পড়তেন। তাঁরা দুজনেই অক্ষয় পণ্ডিতের কাছে পড়াশুনো করেন। ফলে ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা ভালভাবে ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন।

আজকাল ছাত্রবৃত্তি বলতে ছাত্রকে প্রদত্ত বৃত্তি বা জলপানি বোঝায়। আগে কিন্তু এমনটি ছিল না। আগে ছাত্রবৃত্তি স্কুলেই ছিল। ছাত্রবৃত্তি স্কুলের শেষ ক্লাস ছিল বর্তমানে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর সমান। ছাত্ররা ছাত্রবৃত্তি পাস করে তার পরেই নর্মাল ত্রৈবার্ষিক পড়ত। এখন সে ছাত্রবৃত্তি বলে আলাদা স্কুল নেই।

ইংরেজী ছাড়া ছাত্রবৃত্তিতে অনেকগুলি বিষয় ভাল করে পড়ানো হতো। ফলে ঐ সকল বিষয়ে ছাত্ররা অতি উত্তম জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারতো।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর শরৎচন্দ্রকে ইংরেজী স্কুলের নীচের ক্লাসে ভর্তি হতে হলো। ঐ সময় ক্লাসের অন্যান্য বিষয় তাঁর কাছে সহজ সরল মনে হতো। তাই

তিনি ওসব পড়ায় অযথা সময় অপচয় না করে অন্য বই পড়তেন। তিনি অবসর সময়ে প্রায়ই লুকিয়ে 'হরিদাসের গুপ্তকথা' পড়তেন।

ইংরেজী স্কুলে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র ইংরেজীতে এত বেশী নম্বর পান যে শিক্ষকমশাইরা তাঁকে সেবার ডবল প্রমোশন দিতে বাধ্য হন।

ভাগলপুরে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় শরৎচন্দ্রের দুরন্তপনার আর অন্ত ছিল না। তিনি স্কুলের ছুটি হওয়ার আগেই বাড়ী ফিরে আসতেন। তাই সহপাঠীদের দিয়ে মাষ্টারমশাইদের অলক্ষ্যে স্কুলের দেওয়াল ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দিতেন।

ছাত্রবৃত্তি পাশ করার পর আরও দু'বছর শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে পড়াশুনো করেন। তারপর তাঁর পিতা আবার সপরিবারে দেবানন্দপুরে চলে আসেন। সেইসঙ্গে শরৎচন্দ্রও চলে আসেন দেবানন্দপুরে।

দেবানন্দপুরে এসে শরৎচন্দ্র হুগলী শহরে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে ভর্তি হন। সেখানে তিনি কয়েক বছর পড়াশুনো করেন।

শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের উপার্জন না থাকার জন্যে দেবানন্দপুরে এসে কিছু দিনের মধ্যেই ঘোর দারিদ্রের মধ্যে পড়েন।

তখন তিনি শরৎচন্দ্রের স্কুলের বেতন যোগাতেও অক্ষম হন।

এই কারণে শরৎচন্দ্রকে কিছুদিন লেখাপড়া বন্ধ রাখতে হয়।

ক্রমে মতিলালের অবস্থা খারাপ হতে তিনি আবার সপরিবারে ভাগলপুরে ফিরে আসেন। শরৎচন্দ্র তখন ১ম শ্রেণীর (বর্তমান দশম শ্রেণী) ছাত্র।

ভাগলপুরে এসে শরৎচন্দ্র এবার ভর্তি হলেন তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে ১ম শ্রেণী অর্থাৎ দশম শ্রেণীর ছাত্ররূপে। ঐ সময় ঐ স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি শরৎচন্দ্রের উক্ত স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহের বন্ধু। তাই শরৎচন্দ্র পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়কে মামা বলে সম্বোধন করতেন।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ১৮ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র এনট্রান্স পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

এনট্রান্স পরীক্ষা দেওয়ার সময় শরৎচন্দ্রের মামাদের অবস্থা খুবই খারাপ হয়। কেননা শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর আগে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ভাটপাড়ায় গুরুবাড়ীতে দেহত্যাগ করেন।

কেদারনাথের দেহত্যাগের পরেই তাঁদের যুগ্ম পরিবার খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যায়।

কেদারনাথের দুই ছেলে ছিল। ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস। ঠাকুরদাস তাঁর পিতার কার্যালয় ভাগলপুরে ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তায় চাকরী পান। ঐ সময় বিপ্রদাসও অল্প বেতনে একটা চাকরীতে ঢোকেন।

কিছুদিন কাজ করার পর ঠাকুরদাস সামান্য কটা টাকার ব্যাপার নিয়ে আদালতে অভিযুক্ত হন।

ভাগলপুরে গঙ্গোপাধ্যায়দের খুব নামডাক ও প্রভাবপ্রতিপত্তি ছিল। ঐ কারণে ঠাকুরদাসের মামলায় বড় বড় উকিল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হলেন।

মামলা অনেকদিন ধরে চললো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠাকুরদাস রেহাই পান নি।

ঠাকুরদাসের কাকারা আগেই আলাদা হয়ে যান। তাই এই মামলা চালাতে গিয়ে ঠাকুরদাস ও বিপ্রদাস শেষ পর্যন্ত নিঃস্ব হয়ে যান।

শরৎচন্দ্রের এনট্রান্স পরীক্ষার শুরুতেই এই মামলা শুরু হয়। তাই শরৎচন্দ্রের এনট্রান্স পরীক্ষার ফি ও কয়েক মাসের মাইনের টাকা সংগ্রহ করতে বিপ্রদাসকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়। তিনি স্থানীয় মহাজন গুলজারিলালের কাছে হ্যাণ্ডনোট লিখে দিয়ে বেশ কিছু টাকা ধার করে শরৎচন্দ্রের পড়ার জন্যে খরচ করেন। তিনি এই কাজ করতে বাধ্য হন কারণ তখন তাঁর মাথার ওপরে ছিল তিনটি সংসারের ভার। একটি তাঁর নিজের, অপরটি তাঁর দাদা ঠাকুরদাসের এবং আর একটি তাঁর ভগ্নীপতি মতিলালের।

খেলাধুলোতেও শরৎচন্দ্রের মন ছিল বেশ। স্কুলে পড়ার সময় তিনি সহপাঠীদের সঙ্গে যেমন খেলাধুলো করতেন তেমনি করতেন পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। তাদের মধ্যে তিনিই দক্ষ খেলোয়াড়। তাই ছেলেরা তাঁকেই দলপতি করে আনন্দ পেত।

সমবয়সীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র নানাপ্রকারের খেলায় মেতে থাকতেন। কখনো তিনি মার্বেল খেলতেন, কখনো লাড্ডু ঘোরাতেন, কখনো বা ঘুড়ি ওড়াতেন।

গুরুজনদের নিষেধ সত্ত্বেও তিনি এসব কাজ লুকিয়ে করতেন।

এসব খেলাধুলো ছাড়াও তিনি বন থেকে ফড়িং ধরে এনে পুষতেন। নানারকমের পোকা ও পাখী পুষতেন। এমন কি তাঁর কুকুর পোষারও সখ

ছিল। মোটকথা ভাগলপুরে থাকার সময় বাড়ীটা একটা ছোটখাট চিড়িয়াখানা বানিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র।

এছাড়াও তাঁর মনে মাঝে মাঝে অন্য খেয়ালও দানা বেঁধে উঠতো। তাঁর মামার বাসায় 'সংসার কোষ' নামে একখানি বই ছিল। উক্ত বই পড়ে শরৎচন্দ্র জানতে পারলেন যে গোখরো সাপের মুখের সামনে বেলের শেকড় ধরলে তার উদ্যত ও হিংস্র ফণা আপনা হতেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে।

এরূপ জেনে শরৎচন্দ্র বাড়ীর আনাচে-কানাচে গলি-গর্তের মধ্যে সাপের সন্ধান করে বেড়াতে লাগলেন।

একদিন হঠাৎ একটা জায়গায় তিনি দেখতে পেলেন একটি সাপ।

অমনি তিনি তার সামনে এসে তুলে ধরলেন বেলের শেকড়।

সাপটি তখন রাগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো। তখন তাঁর পাশে লাঠি হাতে দাঁড়িয়েছিলেন মামা ফনীন্দ্রনাথ। তিনি লাঠির ঘায়ে সাপটিকে মেরে ফেললেন।

এভাবে সেদিন বিষাক্ত সাপের হাত থেকে রক্ষা পান শরৎচন্দ্র।

ছেলেবেলায় শরৎচন্দ্র সাঁতার কাটতে, কুস্তি করতে ও গাছে চড়তে ভালবাসতেন।

দেবানন্দপুরে হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে পড়ার সময় শরৎচন্দ্র সমবয়স্কদের নেতৃত্ব করতেন।

দেবানন্দপুর থেকে হুগলী প্রায় তিন মাইল পথ। এই দীর্ঘ পথ শরৎচন্দ্র হেঁটেই যাতায়াত করতেন। সঙ্গে থাকতেন তাঁর সহপাঠীরা। সেই সময় তিনি তাঁদের অদ্ভুত সব গল্প শোনাতেন। পথের ধারে কারও বাগানে সুস্বাদু ফল দেখলে তাঁরা সকলে পেড়ে খেতেন। সকলের দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে খাবার জন্যে গ্রামের ভেতর মুন্সীদের একটা বড় পুকুরের পাশে গড়ের জঙ্গলে একটা গভীর খাদ ছিল। শরৎচন্দ্র প্রায়ই সঙ্গীদের সঙ্গে সেখানে বসে অন্যের বাগান থেকে অপহৃত ফলমূল উদরস্থ করতেন। ফলের সঙ্গে ধূমপানও চলতো পুর্ণোদ্যমে।

দেবানন্দপুরের পাশেই সরস্বতী নদী। এই নদীর ফেরি ঘাটে পারাপারের জন্যে যে ডোঙা থাকতো, সেই ডোঙা নিয়ে শরৎচন্দ্র নদীর ওপর দিয়ে দু'তিন মাইল পর্যন্ত চলে যেতেন। কখনো একা যেতেন। কখনো বা তাঁর সঙ্গে থাকতেন তাঁর বন্ধুবান্ধব। অনেক সময় জেলেদের নৌকো তাদের অজ্ঞাতসারে খুলে নিয়ে নদীর বুকে ভেসে চলতেন।

এভাবে নৌকো বা ডিঙিতে শরৎচন্দ্র কৃষ্ণপুর গ্রামে রঘুনাথ গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত আখড়াবাড়ী পর্যন্ত অথবা সপ্তগ্রামের স্কুল পর্যন্ত বেরিয়ে আসতেন।

ছোটবেলায় বৈষ্ণবদের আখড়ায় যেতেন বলেই বোধ হয় তিনি উত্তরকালে 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বৈষ্ণবদের আখড়া প্রসঙ্গে অত সুন্দর বর্ণনা লিখতে সক্ষম হয়েছেন আর আমরা পাঠককুলও তাই পাঠ করে আনন্দে অভিভূত হয়ে যাই।

বাল্যকালে শরৎচন্দ্র যেমন ছিলেন দুরন্ত ও সাহসী তেমনি আবার কোমল স্বভাবের অধিকারীও বটে। ঐ বয়সে তিনি লোকের রোগে, শোকে-সেবা করতে বা সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে যেতেন। তাঁর ঐ প্রকার সদ্ কাজের জন্যে তিনি বহু লোকের ভালবাসা অর্জন করেন।

একবার শরৎচন্দ্র এক যাত্রাদলে যোগ দেন। তাদের সঙ্গে তিনি বাইরে ঘুরে বেড়ান।

ছেলেবেলায় তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীর কাউকে না বলে নিরুদ্দেশ যাত্রাও করতেন। প্রায়ই কোলকাতায় চলে আসতেন।

একবার তিনি পায়ে হেঁটে পুরী যান।

ছেলেবেলাকার কথায় শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন,

'ছেলেবেলাকার কথা মনে আছে। পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে। বৈচিত্র্যের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করি, ভাব, আনন্দ ও আরাম যখন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বার হই। ঠিক বিশ্বকবির কাব্যের নিরুদ্দেশ যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে, অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন।'

কেদারনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অঘোরনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনীন্দ্রনাথ তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজিয়েট স্কুলে শরৎচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় শরৎচন্দ্র এবং মনীন্দ্রনাথ দু'জনেই দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন।

পাশ করার পর মনীন্দ্রনাথ ভর্তি হন তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে। কিন্তু টাকার অভাবে বিপ্রদাস শরৎচন্দ্রকে কলেজে ভর্তি করতে পারলেন না। তাই শুনে মণীন্দ্রনাথের মা স্বামীকে বলে নিজের বাড়ীতে শরৎচন্দ্রকে ছেলেদের

শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন। তাতেই শরৎচন্দ্রের কপাল ফিরলো। তিনি টিউশানির টাকায় কলেজের লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যেতে থাকেন। তিনি ছাত্রকে পড়িয়ে যে সময়টা ব্যয় করতেন সেটা সুধিয়ে নেবার জন্যে অধিক রাত পর্যন্ত জেগে পড়াশুনো করতেন। তাঁর স্মৃতিশক্তিও ছিল অসাধারণ।

কলেজে পড়ার সময় ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে শরৎচন্দ্রের মায়ের মৃত্যু হয়।

মতিলাল ছিলেন গাঙ্গুলিবাড়ীর ঘরজামাই। তাই তিনি এবার স্থির করলেন, দেবানন্দপুর ত্যাগ করে ভাগলপুরে যাবেন।

ভাগলপুরে গেলেনও। সেখানে খঞ্জরপুরে একটা সামান্য ঘর ভাড়া নিয়ে বাস করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা অনিলাদেবীর বিয়ে হয়ে যায়।

পিতার সঙ্গে খঞ্জরপুরে গিয়ে লেখাপড়া শুরু করলেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু এফ. এ. পরীক্ষার ফি জমা দিতে না পারায় শেষে আর তাঁর পরীক্ষা দেওয়া হলো না। যথেষ্ট বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী এবং উত্তম ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও অর্থের অভাবে পরীক্ষা না দিতে পারার দুঃখ আজীবন মনে রেখেছিলেন শরৎচন্দ্র। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে শরৎচন্দ্র লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে যে চিঠিখানি লেখেন তার এক জায়গায় তিনি উল্লেখ করেছেন, 'বড় দরিদ্র ছিলাম, ২০টি টাকার জন্যে একজামিন দিতে পাইনি।'

অর্থাভাবে শরৎচন্দ্রের এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হলো না এই প্রসঙ্গে একাধিক মত আছে। কারও মতে এ-কথা সত্য নয়, শরৎচন্দ্র পরীক্ষা যথারীতি দিয়েছিলেন তবে অন্য সহপাঠী বন্ধুকে পরীক্ষার হলে সাহায্য করার সময় তিনি গার্ডের নজরে পড়েন। তাতেই তাঁর ওপর শাস্তির খড়গ নেমে আসে। আবার কারও মতে তিনি সত্যিই অর্থাভাবের জন্যে এফ. এ. পরীক্ষা দিতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগলপুরে বাঙ্গালী টোলায় বাস করতেন। ঐ পল্লীর কাছেই ছিল আদমপুর পল্লী। সেখানে বাস করতেন রাজা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাজা শিবচন্দ্র ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। তিনি আইনের ব্যবসায় প্রচুর বিত্তের অধিকারী হন। ঐ টাকায় তিনি বহু লোকহিতকর কাজ করেন। তিনি বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে 'রাজা' খেতাব পান।

একসময় তাঁর স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে তিনি বিলেত যান। বিলেত থেকে ফিরে

এলে পল্লীয় বাঙালী সমাজ তাঁকে একঘরে করেন। তাতে আদৌ দমলেন না শিবচন্দ্র। তিনি অর্থে ও প্রতিপত্তিতে সংসারে বড় ছিলেন বলে বহু লোক তাঁকে মানতেন। তাই তাঁর দলে বহু লোকের আগমন ঘটলো। শিবচন্দ্র ছিলেন উদারনৈতিক দলের মানুষ। তাঁর পুত্র সতীশচন্দ্র 'আদমপুর ক্লাব' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। সেখানে নিত্য জলসার আয়োজন ছিল। শরৎচন্দ্র সেই জলসায় যোগ দেবার জন্যে যেতেন। তার জন্যে তাঁকে তাঁর আত্মীয়স্বজনের কাছ থেকে কম কথা শুনতে হয় নি। তবু তিনি লুকিয়ে চুরিয়ে সতীশচন্দ্রের দলে মিশতেন। শরৎচন্দ্রের মাতামহ ও মাতামহের অন্যান্য ভাইয়েরা ছিলেন রক্ষণশীল মানুষ। তাই তাঁরা সতীশচন্দ্রকে দুচোখে দেখতে পেতেন না। এমন কি শরৎচন্দ্রকে ওঁর ধারে কাছেও ঘেঁষতে দিতেন না। তবু শরৎচন্দ্রের বিপ্লবী সত্তা সতীশচন্দ্রের সঙ্গে মেশবার চেষ্টা করতো। তার ফল ভালই হয়েছে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মধ্যে এসে পড়েছে তার জীবন্ত প্রভাব।

ভাগলপুরে অবস্থানের সময় ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হয় সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের।

সৌরীন্দ্রমোহন তখন ভাগলপুরে তাঁর মেশোমশাই মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থেকে ওখানকার তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে এফ. এ. পড়তেন।

ঐ সৌরীন্দ্রমোহনের সতীর্থ ছিলেন বিভূতিভূষণ ভট্ট। তাঁর আর এক নাম ছিল পুটু। বিভূতিভূষণই তাঁর বাড়ীতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন সৌরীন্দ্রমোহনের। এর ফলও ফলেছে শরৎসাহিত্যের পাতায়। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শরৎচন্দ্রের জীবনরহস্য'তে লিখেছেন, 'বড়দিদির' সুরেন্দ্রনাথ চরিত্রের সঙ্গে তাঁর চরিত্রের মিল আমি প্রথমেই লক্ষ্য করেছিলুম।'

এফ. এ. পরীক্ষা দিয়ে সৌরীন্দ্রমোহন কলকাতায় ভবানীপুরে তাঁদের বাড়ীতে এসে বসবাস করতে থাকেন। ঐ সময় শরৎচন্দ্রের মামা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতায় সৌরীন্দ্রমোহনের পাড়ায় থাকতেন। সৌরীন্দ্রমোহন উপেন্দ্রনাথকে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের কথা এই সময়েই শোনান।

বিভূতিভূষণের মেজদা ইন্দুভূষণ ছিলেন কলেজের জীবনে শরৎচন্দ্রের সতীর্থ। ইন্দুভূষণ ভাল দাবা খেলতেন। শরৎচন্দ্রও দাবা খেলতে ভালবাসতেন। বিভূতিভূষণের বাড়ীতে এসে তিনি প্রায়ই ইন্দুভূষণের সঙ্গে দাবা খেলতেন। এর ফলে ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের আলাপ-পরিচয় গাঢ় হয়ে ওঠে। তবে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে বিভূতিভূষণের আলাপ পরিচয় হয় নিছক ইন্দুভূষণের দাবা

খেলার মাধ্যমে নয়। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই এঁদের সম্পর্ক নিবিড়তর হয়। একথা আমরা জানতে পারি বিভূতিভূষণের ভগ্নী নিরুপমাদেবীর জবানবন্দী হতে।

মায়ের মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র পিতার সঙ্গে চলে আসেন ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে।

স্ত্রীর মৃত্যুর পর মতিলালের অবস্থা পাগলের মত হয়। তিনি ঘরসংসারের বহু জিনিষ বিলিয়ে দেন। ফলে তাঁর সংসার অচল হয়ে পড়ে।

এর ওপর আবার মতিলালের পাওনাদারদের তাগাদার অন্ত ছিল না। দেনার দায়ে তিনি দেবানন্দপুরের নিজের বসত বাড়ীটি তাঁর কনিষ্ঠ মামা অঘোর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১৩০৩ সালের ২৫শে কার্তিক মাত্র ২৫৫ টাকায় বিক্রী করে দেন। এর ফলে শরৎচন্দ্রের জীবনে নেমে এলো এক নিদারুণ দুর্ভাগ্য। তিনি তখন বনেলী এষ্টেটে সামান্য মাইনের একটি চাকরী জুটিয়ে নেন।

তাও তিনি অল্পদিনের জন্যে চাকরী করেন। পরে তিনি চাকরী ছেড়ে দিয়ে ভাগলপুরে চলে আসেন।

ভাগলপুরে ফিরে এসে তিনি আবার কলেজে পড়বেন বলে স্থির করলেন।

কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর আর পড়াশুনো হলো না। তখন তিনি বাড়ীতেই পুনরায় পড়াশুনো ও সাহিত্যচর্চা করতে লাগলেন। সেই সঙ্গে চললো গান-বাজনা-অভিনয়।

ভাগলপুরে শরৎচন্দ্রের মামার বাড়ীর কাছেই থাকতেন গায়ক ও লেখক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। শরৎচন্দ্র প্রায়ই তাঁর বাড়ীতে যাতায়াত করতেন এবং সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ট পরিচয় হয়। পরে সেখানেই প্রায়ই সাহিত্যিক আলোচনা ও সঙ্গীতের আসর বসতো।

সুরেন্দ্রনাথের ছোট ভাই রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বিশেষ আলাপ ছিল। রাজেন্দ্রনাথের ডাক নাম ছিল রাজু। এই রাজুই শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে বিখ্যাত "ইন্দ্রনাথ"।

রাজু যেমন ছিলেন অভিনয়ে পারদর্শী তেমনি আবার গানবাজনাতেও। তিান বেশ সুন্দর বাঁশী বাজাতে পারতেন। এছাড়া নানাপ্রকার দুঃসাহসিক কাজে তিনি ছিলেন দক্ষ। শরৎচন্দ্র রাজুর সঙ্গীরূপে অনেক প্রকার দুঃসাহসিক কাজে লিপ্ত হন। এই প্রসঙ্গে একটি বেশ সুন্দর কাহিনী লিখেছেন তাঁর জীবনীকার। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি,—

'শরৎচন্দ্র সারাটা পথ নানা ধরণের হাসির গল্প বলতে বলতে গেলেন। এতে তাঁর সঙ্গীরা কেউই পথশ্রম তো অনুভব করলেনই না, এমন কি কখন পথ শেষ হয়ে গেছে, তাও বুঝতে পারলেন না।

'গুহার সামনে এসে সকলে মোমবাতি জেলে নিলেন। শরৎচন্দ্র দলের অগ্রবর্তী হয়ে গুহার মুখ দিয়ে ভেতরে নামবার সময় তাঁর সঙ্গীদের বললেন—সকলেই খুব সাবধানে নামবে। খাড়া সিঁড়ির একটু এদিক-ওদিক হলেই একেবারে ১০।১২ ফুট নীচে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়বে।

'সকলেই খুব সতর্কতার সহিত সিঁড়ি বেয়ে গুহার অভ্যন্তরে সমতল ভূমিতে গিয়ে নামলেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা নেমে মোমবাতির আলোয় দেখলেন—গুহার মধ্যে কিছুই চিনবার উপায় নেই, এবং বেশ হেঁট হয়েই চলতে হয়।

'শরৎচন্দ্রের নির্দেশে সকলেই একটি সুড়ঙ্গ ধরে তার ভিতরে চলতে লাগলেন। সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে তাঁরা একটি অন্ধকার কক্ষে গেলেন। মোমবাতির ক্ষীণ আলোয় দেখলেন, কক্ষটির তিনচার দিক থেকে রথচক্রের পাখীর মত আরও সুড়ঙ্গ এসে মিশেছে। অনেকটা গোলক ধাঁধাঁর মত। কোন্‌টা ধরে গেলে গুহার শেষ প্রান্তে যাওয়া যাবে তা বোঝা কঠিন।

'শরৎচন্দ্র একটি সুড়ঙ্গ ধরে এগিয়ে যেতে লাগলেন এবং সঙ্গীদের তাঁর অনুগমন করতে বললেন। সঙ্গীরা শরৎচন্দ্রকে অনুসরণ করে চলতে শুরু করলেন। তাঁরা যেতে যেতে আরও কয়েকটা চক্রাকার কক্ষ দেখলেন। সুড়ঙ্গের উচ্চতা ক্রমে ক্রমে কমে আসতে লাগলো, শেষে এমন হ'ল যে, বুকে হাঁটা ছাড়া আর উপায় রইল না। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হ'ল। গুহার গা ও তলদেশ বেশ ভিজা ভিজা মনে হতে লাগল। শরৎচন্দ্রের সঙ্গীরা আর যেতে না পেরে এক জায়গায় বসে পড়লেন। এই সময় তাঁরা লক্ষ্য করলেন, শরৎচন্দ্র তাঁদের মধ্যে নেই। একটি সুড়ঙ্গের সুদূর প্রান্ত থেকে শুধু তাঁর ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি শোনা যাচ্ছে। তিনি তাঁর সঙ্গীদের ডাকছেন—চলে এস, কোন ভয় নেই।

'সঙ্গীদের তখন মনের অবস্থা এমন যে; কোন প্রকারে গুহার এই গোলক ধাঁধাঁ থেকে একবার বেরুতে পারলে বাঁচেন। ভয়ে তাঁরা আর এগোতে পারলেন না। সেইখানেই বসে রইলেন এবং শরৎচন্দ্রকে ফিরে আসবার জন্য ডাকতে লাগলেন।

'এদের ডাকাডাকির বেশ কিছুক্ষণ পরে শরৎচন্দ্র গা-ময় কাদা মেখে ফিরে এলেন। শরৎচন্দ্রকে দেখেই তাঁর সঙ্গীরা বুঝলেন, গুহাটি যেখানে গঙ্গায় গিয়ে

মিশেছে, তিনি সেই পর্যন্তই গিয়েছিলেন এবং সেখানে যেতে তাঁকে শুয়ে শুয়েই যেতে—হয়েছিল।

'এবার ফেরার পথে শরৎচন্দ্র সঙ্গীদের বললেন—খুনী আসামীরা অনেক সময়েই এই গুহার মধ্যে এসে লুকিয়ে থাকে এবং দর্শকরা গুহা দেখতে এলে তাদের তাড়া করে। —এই বলে তিনি কয়েকটা ঘটনাও বললেন। তিনি আরও বললেন—সাপ তো থাকেই, একবার একটা বাঘও এই গুহায় এসে আশ্রয় নিয়েছিল।

'শরৎচন্দ্রের মুখে এইসব কথা শুনে তাঁর সঙ্গীরা খুবই ভীত হলেন এবং বলতে লাগলেন যে তাঁরা যদি আগে একথা শুনতেন তো কখনই গুহার ভিতরে আসতেন না।

'শরৎচন্দ্র তাঁর সঙ্গীদের গুহার বাইরে নিয়ে এলে, তাঁরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।'...

পিতার সাহিত্যানুরাগ পুত্র শরৎচন্দ্রের মধ্যে উজ্জীবিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র যখন স্কুলের ছাত্র তখন তিনি পাঠ্য বই ছাড়া অনেক অপাঠ্য বইও পড়তেন। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন,—

'এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙ্গা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্তকথা' আর বেরলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য ত নয়, ওগুলো বদ্‌ছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ীর গোয়াল ঘরে।'

সাহিত্যিক পিতার পুত্র সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের প্রথম গল্প লেখার অনুপ্রেরণা আসে পিতার অসমাপ্ত রচনা পাঠ ও অনুধ্যানের মাধ্যমে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই লিখেছেন,—

'পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘর ছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সে সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভ'রে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে

কেমন করে হারিয়ে গেছে, সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখন স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কতবার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। এগুলি শেষ করে যান নি বলে কত দুঃখই না করেছি। অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয়, সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে সুরু করি।'

ভাগলপুরে গিয়ে এন্‌ট্রান্স ক্লাসে ভর্তি হবার আগে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরে থেকে গল্প লেখার অভ্যাস করেন। ঐ সময় তিনি তাঁর সহপাঠী কাশীনাথের নামানুসারে লেখেন 'কাশীনাথ' গল্পটি। ঐ সময় 'কাকবাসা' গল্পটিও তিনি রচনা করেন।

পরে ভাগলপুরে গিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করলে তাঁকে দেখে তাঁর মামারা অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথ, গিরীন্দ্রনাথ এবং উপেন্দ্রনাথ সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করেন।

প্রায় ঐ সময়ে খঞ্জরপুর পল্লীতে বিভূতিভূষণ ও তাঁর ছোট বিধবা বোন নিরুপমা দেবী কবিতা লিখতেন। ঐ সময় শরৎচন্দ্রের একান্ত চেষ্টা ও উদ্যোগে 'সাহিত্যসভা' প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে উক্ত সভার মুখপত্র 'ছায়া'-র জন্ম হয় ঐসময়ে। এভাবে ধীরে ধীরে শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের চলা শুরু হতে থাকে।

উক্ত সাহিত্যসভা প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ ভট্ট লিখেছেন :—

'সাহিত্য—সভা—হাঁ সত্য সত্যই একটা সাহিত্য-সভা এই তরুণদের মধ্যে গড়িয়া উঠিয়াছিল। মাসিক পত্রখানির নামকরণ হইয়াছিল 'ছায়া'। এই সাহিত্যসভার অধিবেশন যে কোথায় কোন্‌দিন হইত, তাহার ঠিকানাই ছিল না।... ইহার মধ্যে চেঁচামেচিও ছিল, তর্কাতর্কিও ছিল—সবই ছিল।'

সপ্তাহে একদিন করে উক্ত সাহিত্যসভার অধিবেশন গোপনে বসতো। ঐ সভায় অনেকরকম গল্প, প্রবন্ধ ও কবিতা পাঠ করা হতো। সেগুলির মধ্যে যেগুলি প্রকাশযোগ্য সেগুলিই উক্ত 'ছায়া' মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতো।

উক্ত 'ছায়া' পত্রিকায় 'তরুণী' নামে অন্য একটি হাতে লেখা পত্রিকার সমালোচনা থাকতো। এই তরুণী পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো কোলকাতায় ভবানীপুর অঞ্চল হতে।

উক্ত 'ছায়া' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'ক্ষুদ্রের গৌরব' নামে একটি প্রবন্ধ ছাপা

হয়। এছাড়া তিনি ঐ সময়ে বেশ কয়েকটি গল্প এবং উপন্যাসও লেখেন। সেগুলি নিম্নরূপ :

(১) অভিমান (২) বাসা বা কাকবাসা (৩) বাগান—তিন খণ্ডে সমাপ্ত —১ম খণ্ডে—বোঝা, কাশীনাথ ও অনুপমার প্রেম ; ২য় খণ্ডে—কোরেলগ্রাম (পরে পরিবর্তিত আকারে ছবি), শিশু (পরে বড়দিদি), চন্দ্রনাথ, ৩য় খণ্ডে—হরিচরণ, দেবদাস, বাল্যস্মৃতি (৪) পাষাণ (উপন্যাস) (৫) শুভদা (উপন্যাস) (৬) ব্রহ্মদৈত্য (উপন্যাস) (৭) সুকুমারের বাল্যকথা (গল্প)।

'ব্রহ্মদৈত্য' উপন্যাসটি শরৎচন্দ্র সুরু করেন প্রথম জীবনে এবং শেষ করেন পরবর্তীকালে।

এই সময়ে শরৎচন্দ্র তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'চরিত্রহীন' লেখা আরম্ভ করেন।

গল্প-উপন্যাস ছাড়াও শরৎচন্দ্র কয়েকটি কবিতাও লিখেছেন। কবিতাগুলির অধিকাংশ বাংলাভাষায় হলেও তার মধ্যে কিছু কিছু ইংরেজী ভাষাতেও লেখা ছিল। এই প্রসঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়' গ্রন্থে লিখেছেন :

'তাঁর (শরৎচন্দ্রের) প্রিয় কুকুর 'কানা' মারা গেলে, শরৎচন্দ্র একটি ইংরাজীতে কবিতা লিখেছিলেন।'...

শরৎচন্দ্রের বাল্যকালের রচনাগুলির মধ্যে 'অভিমান' 'পাষাণ' ও 'ব্রহ্মদৈত্য' নামক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিগুলি হারিয়ে যায়। সেই সঙ্গে হারায় তাঁর লেখা গল্প 'সুকুমারের বাল্য কথা' এবং 'ফুলবনে লেগেছে আগুন' কবিতাটি।

ঐসময় শরৎচন্দ্র অনেক ইংরেজ ঔপন্যাসিকের উপন্যাসও পাঠ করতেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন মিসেস হেন্‌রি উড্ এবং মারি কোরেলি। তাঁদের সাহিত্যিক প্রভাব পড়েছে শরৎচন্দ্রের রচনায়। শরৎচন্দ্র তাঁর 'অভিমান' গল্পটি লেখেন হেন্‌রি উডের 'ইস্টলিনের' ছায়া অবলম্বনে। আর 'পাষাণ' গল্পটি লেখেন মারি কোরেলির 'মাইটি অ্যাটম' উপন্যাসের ছায়া অবলম্বনে।

এছাড়া শরৎসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব যথেষ্ট দেখা যায়। যেমন দেবদাস উপন্যাসে দেবদাস ও পার্বতীর বাল্যপ্রণয় স্মরণ করিয়ে দেয় বঙ্কিম চন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের শৈবলিনী ও প্রতাপের বাল্যপ্রণয়। এছাড়া শরৎচন্দ্রের 'ক্ষুদ্রের গৌরব' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর'-এর ছাপ রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের চন্দ্রনাথ ও চরিত্রহীনেও রয়েছে রবীন্দ্রনাথের 'ত্যাগ' গল্প ও 'চোখের বালি' উপন্যাসের ছাপ। এমনি আরও কয়েকটি শরৎ-রচনাতে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বর্তমান রয়েছে।

শরৎচন্দ্র একাধিক ছদ্মনামে প্রথম জীবনে সাহিত্যসাধনা শুরু করেন। প্রথমে তিনি ইংরেজী ছদ্মনাম ব্যবহার করেন। লেখেন St. C. Lara অর্থাৎ St মানে শরৎ। C মানে চট্টোপাধ্যায় এবং Lara মানে ন্যাড়া। তাঁর ডাক নাম ছিল 'ন্যাড়া'।

রাধুর সঙ্গে মিলেমিশে শরৎচন্দ্রের দিনগুলি বেশ ভালভাবেই কাটছিল। এই সময় তিনি যুক্ত ছিলেন গান, বাজনা, অভিনয় এবং সাহিত্যচর্চায়।

হঠাৎ তাঁর এই সুন্দর ও আনন্দময় জীবনের ছন্দপতন ঘটালেন তিনি নিজেই। বাড়ীর লোকজনদের কাউকে কোন কথা না বলে তিনি একসময় বাড়ী থেকে নিরুদ্দিষ্ট হলেন।

তার কিছুদিন পরে রাজুও নিরুদ্দেশের পথে যাত্রা করলেন। সেই সময়টা ছিল ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের শেষাশেষি।

শরৎচন্দ্রের বাড়ী থেকে নিরুদ্দেশ হবার একাধিক কারণ আছে। কেউ বলেন যে তিনি তাঁর বাপের ওপর অভিমান করে বাড়ী ছেড়ে চলে যান আবার কারও মতে সামাজিক অশ্রদ্ধার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে তিনি নাকি নিরুদ্দিষ্ট হন।

এর আগে নাকি শরৎচন্দ্র দু'বার বাড়ী ছেড়ে অজানা দেশে চলে যান। অনেকের মতে এটা নাকি সত্য নয়। কিন্তু কবি নরেন্দ্র দেব এই ঘটনা বিশ্বাস করতেন।

যাই হোক শরৎচন্দ্র বাড়ী থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে বিভিন্ন দেশ ঘুরলেন। কিছুদিন যাবৎ তিনি নাগা সন্ন্যাসীদের সঙ্গেও মিশলেন।

পরে তিনি এলেন মজঃফরপুরে। এখানে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের। প্রমথনাথ বাল্যকালে মজঃফরপুরে তাঁর কাকার কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন।

ক্রমে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় গাঢ় হয়। কারও মতে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে প্রমথনাথের পরিচয় নাকি আগে থেকেই ছিল।

মজঃফরপুরে শরৎচন্দ্র সন্ন্যাসীর বেশে ধর্মশালায় থাকতেন। রাত্রিবেলায় তিনি ধর্মশালার ছাদে উঠে আপনমনে গান করতেন। তাঁর কণ্ঠে সুমিষ্ট গান শুনে অনুরূপাদেবীর সম্পর্কিত দেওর নিশানাথ মুগ্ধ হয়ে যান। পরে এই নিশানাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপপরিচয় নিবিড় হয়। আবার এই নিশানাথের মাধ্যমেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হয় অনুরূপাদেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

শরৎচন্দ্র এই শিখেরনাথের বাড়ীতেই থাকতেন যখন তিনি মজঃফরপুরে ছিলেন।

তাঁর গান শুনে স্থানীয় সঙ্গীতঅনুরাগী জমিদার মহাদেব সাহু মুগ্ধ হয়ে যান এবং তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করেন।

পরে মহাদেব সাহুর বাড়ীতেই শরৎচন্দ্র বাস করতে লাগলেন।

ঐসময় গানবাজনা ছাড়াও তিনি সাহিত্যসাধনা করতেন। 'ব্রহ্মদৈত্য' নামে একখানি উপন্যাস তিনি এইসময় অর্থাৎ ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় লেখেন।

ঐসময় একদিন তিনি পিতার মৃত্যুসংবাদ পান। সংবাদ পাওয়া মাত্রই তিনি চলে যান ভাগলপুরে। সেখানে যাওয়ার সময় তিনি 'ব্রহ্মদৈত্য' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিখানি মহাদেব সাহুর কাছে রেখে যান। কিন্তু অল্পকালের ব্যবধানে শরৎচন্দ্র মজঃফরপুরে ফিরে না আসতে পারার দরুন মহাদেব সাহুর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিখানি খোয়া যায়।

পিতার মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র কোনরকমে পিতার শ্রাদ্ধ করলেন। কারন তখন তাঁর আর্থিক অবস্থা আদৌ ভাল ছিল না। এর ওপর ছিল নাবালক তিন ভাইবোনের দেখাশোনার ভার। বড় বোন অনিলাদেবীর আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। এখন বাকি রইলেন দুটি ছোট ভাই ও একটি ছোট বোন।

শরৎচন্দ্র খঞ্জরপুরে যে ভাড়াবাড়ীতে থাকতেন তার মালিকের স্ত্রী তাঁর ছোট বোন সুশীলাদেবীকে খুব ভাল বাসতেন। তাই তিনি সেচ্ছায় মা-বাপহারা নাবালক মেয়েটির ভরণপোষণের ভার নেন। শরৎচন্দ্রও তাঁর হাতে ছোট বোনের দেখাশোনার ভার দিয়ে একরকম স্বস্তি পেলেন।

এরপর অন্য দুই ভাইয়ের ব্যবস্থাও করে দিলেন শরৎচন্দ্র। তখন তাঁর মেজভাই প্রভাসচন্দ্রের বয়েস ছিল পনের বছর আর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রের বয়েস আট বছর।

প্রভাসচন্দ্রকে তিনি রেখে এলেন আসানসোলে তাঁর জনৈক রেলকর্মচারী আত্মীয়ের কাছে আর ছোটভাই প্রকাশচন্দ্রকে রাখলেন সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের পিতার কাছে জলপাইগুড়িতে।

এভাবে শরৎচন্দ্র ভাইবোনদের জন্যে একটা সাময়িক ব্যবস্থা করে ফিরে এলেন কোলকাতায়। তাঁর ইচ্ছে এবার তিনি মন দিয়ে চাকরী করবেন। কারণ তাঁর হাতে অনেক দায়িত্ব।

তখন কোলকাতার 'ভবানীপুর অঞ্চলে থাকতেন লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন শরৎচন্দ্রের মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের তৃতীয় ভ্রাতা মহেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠপুত্র। তিনি কোলকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করতেন। শরৎচন্দ্র তাঁর বাড়ীতে থাকতেন এবং তাঁর অফিসে একটি চাকরী নেন।

ঐ ভবানীপুর অঞ্চলেই তখন বাস করতেন সুসাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়।

এখন শরৎচন্দ্রের খুব সুবিধে হয়ে গেল পূর্ব-পরিচিত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতে। তাই অফিসের কাজ শেষ হলে তিনি সৌরীন্দ্রমোহনের সঙ্গে সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনায় বসতেন।

ক্রমে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিচয় হলো সৌরীন্দ্রমোহনের বন্ধু-বান্ধবদের। তাঁরা শরৎচন্দ্রকে সঙ্গে নিয়ে প্রায় প্রতিদিন অফিস ছুটির পর বেড়াতে যেতেন গড়ের মাঠে। সেখানে মুক্ত-অঙ্গনে বসে সকলে সাহিত্যচর্চা করতেন। কেবল সাহিত্যচর্চা নয়, তার সঙ্গে চলতো অভিনয় ও সঙ্গীতাদির আলোচনাও।

ঐ সময়ে লালমোহনের ভগ্নীপতি অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাপ হয় শরৎচন্দ্রের। তাঁর মুখে রেঙ্গুন ও বর্মা প্রসঙ্গে অনেকরকম সুন্দর সুন্দর কাহিনী শোনেন শরৎচন্দ্র।

ঐ সকল কাহিনী শোনার পর শরৎচন্দ্রের বড় ইচ্ছে জাগলো বর্মায় যাবার।

অঘোরনাথ রেঙ্গুনে ফিরে যাবার মাসখানেকের মধ্যেই তিনি বর্মায় চলে যান।

বর্মায় যাবার ছু'দিন আগে তাঁর মাতুল গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথামত শরৎচন্দ্র একটি ছোট গল্প লিখে প্রতিযোগিতার জন্যে পাঠিয়ে দেন। পরে তাঁর গল্পটি সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হলে তিনি 'কুন্তলিন' পুরস্কার পান। পুরস্কারের অর্থ মোট পঁচিশ টাকা। গল্পটির নাম 'মন্দির'। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থাকার সময় তিনি এই গল্পটি লেখেন। তাও নিজের নামে নয়। তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম দিয়ে। যখন পুরস্কার ঘোষণা করা হলো তখন তিনি বর্মার রাজধানী রেঙ্গুনে।

পরে সুরেন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের কথামত ঐ পুরস্কারের টাকা দিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী কিনে পাঠিয়ে দেন রেঙ্গুনে।

১৩১০ সালে প্রকাশিত হয় 'কুন্তলিন পুরস্কার ১৩০৯ সন' নামে একটি পুস্তক।

তাতে ছাপা হয় শরৎচন্দ্রের লেখা 'মন্দির' গল্পটি। এটিই নাকি শরৎচন্দ্রের লেখা প্রথম মুদ্রিত রচনা।

পাছে বাধা পান এই আশঙ্কায় আত্মীয়স্বজনদের না জানিয়েই শরৎচন্দ্র ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে ব্রহ্মদেশ যাত্রা করেন। আবার কারও মতে তাঁর মাতুল উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই ব্যাপারটি সম্পূর্ণ জানতেন। তিনি শরৎ-চন্দ্রকে রেঙ্গুন যাবার জাহাজে তুলে দেন। সেই সঙ্গে তাঁর হাতে তুলে দেন গোটা চল্লিশ টাকা।

যাই হোক শরৎচন্দ্র ভারতের মেল নেওয়া জাহাজে চড়ে মাত্র চারদিন পরে গিয়ে পৌছান রেঙ্গুন শহরের উপকণ্ঠে। ওখান থেকে শহরের ভেতর যেতে আরও কিছুদিন চলে যায়। তার কারণ প্লেগরোগের প্রভাব।

রেঙ্গুনে এসে কোন বাঙালী হোটেল খুঁজে পেলেন না শরৎচন্দ্র। তাই তিনি 'দাদাঠাকুরের হোটেল' নামে এক ওড়িয়া ব্রাহ্মণের হোটেলে এসে উঠলেন। ওখান থেকে তিনি অনুসন্ধান করতে লাগলেন তাঁর মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের।

নামজাদা উকিল অঘোরনাথের বাড়ীর ঠিকানা জানতে বেশী বেগ পেতে হলো না শরৎচন্দ্রের।

ঠিকানা জানার সঙ্গে সঙ্গে শরৎচন্দ্র চলে এলেন অঘোরনাথের বাসায়।

অঘোরনাথ এবং তাঁর স্ত্রী অন্নপুর্ণা শরৎচন্দ্রকে খুব আদর যত্ন করতে লাগলেন।

এইসময় অঘোরনাথের কথামত শরৎচন্দ্র আইনের গ্রন্থ পড়তে লাগলেন। সেই সঙ্গে চলতে লাগলো বর্মিভাষা শিক্ষা।

অঘোরনাথের বড় ইচ্ছে শরৎচন্দ্র আইনশাস্ত্র জেনে নিয়ে বর্মায় থেকে ওকালতি ব্যবসা করবেন। আর ওখানে ওকালতি করতে হলে বর্মিভাষা শেখা একান্ত দরকার। তাই শরৎচন্দ্র একসঙ্গে দুই কাজই করতে লাগলেন।

শুধু তাই নয়, মেশোমশাইয়ের চেষ্টায় শরৎচন্দ্র বর্মা রেলওয়ে অফিসের একাউন্টেন্ট কৃষ্ণকুমার বসুর অধীনে একটি চাকরী পান।

চাকরী পাবার পর শরৎচন্দ্র একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

কিন্তু বেশীদিন পর্যন্ত তাঁর কপালে ঐ সুখ ছিল না। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী তারিখে নিউমনিয়ায় ভুগে শরৎচন্দ্রের মেশোমশাই অঘোরনাথ

মারা যান। সুতরাং অঘোরনাথের রেঙ্গুনের বাসা বেশীদিন রইলো না। তাঁর স্ত্রী অন্নপূর্ণা অল্পকালের মধ্যেই রেঙ্গুন থেকে কোলকাতায় চলে এলেন।

রেঙ্গুনে মাসীমার বাসা উঠে গেলে শরৎচন্দ্র হতাশ হলেন না। তাঁর বিশেষ পরিচিত রেঙ্গুন গভর্ণমেণ্ট হাউসের ওভারসীয়ার অন্নদাপ্রসাদ ভট্টাচার্যের বাড়ীতে গিয়ে তিনি উঠলেন।

শরৎচন্দ্র বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে মাত্র দেড় বছর চাকরী করেন। ঐ সময় তিনি আইনব্যবসায়ী হবার জন্যে একবার পরীক্ষা দেন। কিন্তু বর্মিভাষায় ফেল করার জন্যে তাঁকে সেই আশা ত্যাগ করতে হলো।

রেল অফিসের চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে শরৎচন্দ্র চলে আসেন নাঙ্গলেবিনে। ওখানে ধানের ব্যবসায়ী পি. কে. মিত্রের সহকারী হিসেবে কিছুদিন কাজ করেন। ঐ সময় তিনি অসুস্থও হন।

ও কাজেও তাঁর মন টিকলো না। তাই ও কাজ ত্যাগ করে তিনি চলে এলেন পেগুতে। ওখানকার অ্যাডভোকেট এন, কে, মিত্রের সঙ্গে তাঁর আলাপ আগে থাকতেই ছিল। পেগুতে এসে এন, কে, মিত্রের বাড়ীতেই থাকেন শরৎচন্দ্র। ওখানে নিত্য জলসা হতো। ঐ জলসায় এন, কে মিত্রের খুড়তুতো ভাই এম, কে, মিত্রের অর্থাৎ মণীন্দ্রকুমার মিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ হয়। তিনি ছিলেন বর্মার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস্ অফিসের ডেপুটি একজামিনার। তাঁর চেষ্টায় শরৎচন্দ্র উক্ত অফিসে মাসিক ৩০ টাকা বেতনের কেরানীর চাকরী পান।

ঐ চাকরী পাবার পর শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে চলে আসেন। ওখানে টম্‌সন্ স্ট্রীটের এক বাড়ীতে এম, কে, মিত্রের সঙ্গে বাস করতে থাকেন।

চাকরী পাবার পর শরৎচন্দ্র 'ফোর্থ গ্রেড পাবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্ট একাউণ্টসিপ' পরীক্ষা দেন। কিন্তু পাশ করতে পারেন নি।

মাসখানেক পরে শরৎচন্দ্র তাঁর অফিসের একজামিনারের সাহায্যে পেগুতে পেগু-ডিভিসানের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে মাসিক ৫০ টাকা মাইনের একটি অস্থায়ী চাকরী পান।

ঐ চাকরী পাবার পর শরৎচন্দ্র একজামিনার অফিসের চাকরী ছেড়ে পেগুতে চলে যান।

কিন্তু এই চাকরীও তিনি আড়াই মাসের বেশী করতে পারলেন না। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস পর্যন্ত তিনি বেকার হয়েই রইলেন।

পরে এপ্রিল মাসে এম, কে, মিত্রের চেষ্টায় তিনি পুরোনো জায়গায় আবার একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউন্টস্ অফিসে মাসিক পঞ্চাশ টাকা বেতনে অস্থায়ী কেরানীর চাকরী পান।

এবার তিনি মন দিয়ে কাজ করতে লাগলেন। তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁর মাইনে বাড়িয়ে দেন একাধিকবার। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি চাকরী করেন। ঐসময় তাঁর মাইনে ছিল মোট নব্বুই টাকা।

ব্রহ্মদেশে থাকার সময় শরৎচন্দ্র ওখানকার সর্বত্র ঘুরে বেড়িয়েছেন।

* বিদেশে বসবাস করবার সময় শরৎচন্দ্র অনেকরকম নেশা করতেন। মদের নেশা তো ছিলই, তার সঙ্গে আরও অনেক কিছুই খেতেন। তার মধ্যে ছিল আফিং এবং তামাক।

মজঃফরপুরে শিখরনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়ীতে থাকার সময় শরৎচন্দ্র মদ খেতেন। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন-রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন:

'শরৎচন্দ্রকে শিখরবাবু কাছে রেখেছিলেন কিছুকাল। কিন্তু তিনি তখন নেশায় বেশ পোক্ত হয়েছেন—সুযোগ এবং তেমন দল পেলে নেশা চলতো—যাকে বলে 'রমরম্'। এবং নেশায় বিভোর হয়ে অনেক রাত্রে বাড়ী ফিরতেন। একদিন গভীর রাত্রে নেশা করে এসে একটু বেএক্তিয়ার হন—শিখরবাবুর অভিভাবক পিসিমার মুখে সে-কথা শুনে পিতা অনুযোগ তোলেন—তখন শিখর-বাবু সতর্ক করে দেন শরৎচন্দ্রকে। ব্যস্—পরের দিন তাঁকে আর দেখা গেল না। লজ্জায় তিনি উধাও।'

রেঙ্গুনেও মদ খেতেন শরৎচন্দ্র। আচার্য নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন, 'রেঙ্গুনে কিছুদিন তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেন। এই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের প্রধান সঙ্গী ছিলেন, তাঁর বন্ধু বঙ্গচন্দ্র দে নামে একজন পূর্ববঙ্গ নিবাসী উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক।...বঙ্গচন্দ্র নিজে ছিলেন পানাসক্ত এবং শরৎচন্দ্র-কেও নিয়েছিলেন তাঁর দলভুক্ত করে।'

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুনে থাকার সময় যে মদ খেতেন তা জানা যায় তাঁর একটা পত্রে। ইং ২২।২।০৮ তারিখে রেঙ্গুন থেকে তিনি তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু বিভূতিভূষণ ভট্টকে লিখেছেন: 'মাস দুয়েক মদ খাই নাই—শরীরটা যেন একটু সুস্থবোধ করি—আর যদি না খাই তো বোধ হয় বেশ সারিয়া যাইব।'

এছাড়া রেঙ্গুনে মদ খাওয়ার কাহিনী শরৎচন্দ্র বলেন বাজে শিবপুরে অবস্থানের সময় তাঁর এক স্নেহভাজন বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রীর কাছে।

আগেই লিখেছি যে উচ্ছৃঙ্খল জীবনে শরৎচন্দ্র ছিলেন একাধিক নেশায় আসক্ত। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবন রহস্য' গ্রন্থে লিখেছেন :

'একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন—মানুষ যেটাকে ভয় করে, ভয়ে যা করতে যায় না, অনেক সময় গোঁয়ার্তুমি করে আমি তা করেছি। এটা পারলুম না, এমন গ্লানি না মনে লাগে এবং নেশা মানুষ যত রকম করে থাকে, তার কোনটা বাদ দিইনি।'

একসময় শরৎচন্দ্র মদ ছেড়ে আফিং খেতে থাকেন। তারপর তিনি আফিং খাওয়া ছেড়ে দেন। তাতে করে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

তখন আবার আফিং খাওয়া সুরু করেন। তার জের সমানে চলেছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

এতো গেল দ্রব্যগুণের নেশা। নারীর প্রতিও শরৎচন্দ্রের কম আসক্তি ছিল না। তিনি একাধিক নারীর সঙ্গে প্রণয়পাশে আবদ্ধ হন। তাঁর জীবনের এই দিককার কাহিনী আমরা প্রমাণিত ভাবে জানতে পারি তাঁর লেখা একটি পত্র মারফৎ। এই পত্রটি তিনি লেখেন ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখে রেঙ্গুন থেকে বিভূতিভূষণ ভট্টকে। তিনি লিখেছেন :

'পরম কল্যানীয় পুঁটুভায়া,

...আমার ইতিহাস একটু শুনিবে? মধ্যে এই রেঙ্গুনে দাম্পত্য প্রেম চর্চা করিতে গিয়া হঠাৎ দেখিলাম, পুরা গৃহী হইয়া পড়িয়াছি। দেড় বৎসরের মধ্যে সেই অসীম অগাধ প্রণয়ের তলা দেখি নাই। একদিন মধুর কলহ (!) বাধিয়া গেল এবং মান ভঞ্জনের পূর্বেই দেখিলাম, গৃহিনী আমার অভিমান ভরে আর একজন সুপাত্রে বরমাল্য প্রদান করিয়াছেন। কাজেই আমি আমার পোঁটলা পুঁটলি ঘাড়ে করিয়া এই ৩৬ নম্বর গলির চার তলার একটি ঘর ভাড়া লইয়া বিছানা পাতিয়া চিৎ হইয়া চুরুট টানিতে লাগিলাম।

এটা যে কি হইয়া গেল, আজো তাহার মীমাংসা করিতে পারি নাই। বধূ আমার ব্রহ্মদেশীনী ছিলেন না, খাঁটি স্বদেশী। যখন শুনিলাম, তিনি রজক কন্যা, তখন কান মলিয়া, এক হাত নাকখত্ দিয়া ঐরাবতীতে স্নান করিয়া আসিলাম ও পরদিনই মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়া প্যাসেজ বুক করিয়া বিরহ জ্বালা শান্ত

করিতে হংকং চলিয়া গেলাম। ফিরতি পথে কলিকাতায় গিয়াছিলাম মাত্র। শুনিয়াছি চণ্ডীদাস নাকি ঐ রকম কি একটা করিয়া মাথুর লিখিয়াছিলেন, আমিও স্থির করিয়াছি, বহুপূর্বে 'চরিত্রহীন' বলিয়া যেটা সুরু করিয়াছিলাম, এইবার সেটা শেষ করিব।

দেশে গিয়াও সুখ পাই নাই। একবার ওলাউঠা হইল, কতদিন হাসপাতালে অপারেশন হইয়া পড়িয়া রহিলাম। আর সবচেয়ে জ্বালাতন করিয়াছিল কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দল। গায়ের চামড়া খাইয়া ফেলিতে চাহিয়াছিল। আমার দুঃখের দিনে তাঁহারা যে কোথায় ছিলেন জানি না। কিন্তু আজ নিশ্চিন্ত হইয়া বাকি দিন ক'টা কাটাইয়া দিবার যেই সময় আসিয়াছে, অমনি দয়া করিয়া ঝাঁকে ঝাঁকে তাঁহারা কোন্ অজ্ঞাত স্থান হইতে যে বাহির হইতেছেন, নির্ণয় করিবার ক্ষমতা আমার তো নাই।

আমি গৃহ, গৃহিনী, প্রণয় ও বিরহ এই আঠার মাসের মধ্যে এমনি পুরাদমে ভোগ করিয়া লইয়াছি যে, তাহা হজম করিতে অন্ততঃ আঠার বৎসর লাগিবে। ইহার পরেও যদি বাঁচিয়া থাকি, ওদিকে চাহিব—এখন নয়।'

অনেকে কিন্তু শরৎচন্দ্রের এই পত্রবর্ণিত প্রেম কাহিনী সত্য বলে বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, এ হচ্ছে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের কাল্পনিক জীবনেতিহাস। তিনি বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে হাসিতামাসার মত এরকম বানানো গল্প লিখে থাকবেন। কেননা তিনি একাধারে ছিলেন গল্পলেখক এবং গল্পকথক। বৈঠকী গল্পে তিনি ছিলেন এক নম্বরের ওস্তাদ। ঐরকম একটি প্রণয়কাহিনী তিনি পত্রের মারফৎ লিখেছেন আর কি। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপাল চন্দ্র রায় লিখেছেন :

'শরৎচন্দ্রের এই চিঠির কাহিনীটি আবার সত্য নাও হতে পারে। এটি সম্পূর্ণ বিশ্বাস্য করে বানিয়ে বলা একটি মিথ্যা কাহিনীও হতে পারে। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে যাঁরা মিশেছেন, তাঁরাই জানেন যে, মিথ্যা করে বানিয়ে গল্প রচনা করতে তিনি কিরূপ ওস্তাদ ছিলেন, আর এমনিভাবে তিনি বলতেন যে, কারও সাধ্য ছিল না, তাকে অবিশ্বাস করে।'

আমরা হচ্ছি ক্ষুদ্র মনের অধিকারী। আমাদের মনের কল্পনারাশি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তার ওপর আছে আমাদের নানাপ্রকার দুর্বলতা এবং নীচতা। আমরা ভালর তুলনায় মন্দটাকে মনে বা হৃদয়ে স্থান দিই। মন্দটাকেই সত্য বলে ধারণা করি। এটা যে কত বড় মিথ্যা এবং দুর্বলতা তা একবার ভেবেও দেখি

না। বিশেষ করে লেখকের লেখা প্রেমকাহিনী পড়লে আমরা সঙ্গে সঙ্গে ধরে নিই যে এটা বোধহয় লেখকের নিজের জীবনে ঘটে যাওয়া কোন এক বাস্তব প্রেমকাহিনী। উক্ত লেখার সত্যাসত্য বিচার করবার মানসিকতা পর্যন্ত আমরা হারিয়ে ফেলি। এই বাস্তব সত্যটুকু—উপন্যাসপাঠক বা পাঠিকার মনের এই দুর্বল চিন্তা ও কল্পনার খবর রাখতেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তাই তো তিনি জীবন্ত সাহিত্য সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে দিলীপ কুমার রায়কে একবার পত্র মারফৎ জানান:

'সবচেয়ে জ্যান্ত লেখা সেই, যা পড়লে মনে হবে গ্রন্থকার নিজের অন্তর থেকে সবকিছু ফুলের মত বাইরে ফুটিয়ে তুলেছে। দেখোনি বাঙ্গলা দেশে আমার সব বইগুলোর নায়ক-নায়িকাকেই ভাবে, এইবুঝি গ্রন্থকারের জীবন, নিজের কথা। তাই সজ্জন সমাজে আমি অপাংক্তেয়। কতই না জনশ্রুতি লোকের মুখে মুখে প্রচারিত।'...

অবশ্য এটাও ঠিক কথা যে সাহিত্যিক জীবনে নানারকম পানদোষের সমাহার হয়। কেউ প্রবল সংযমের প্রভাবে সেগুলি উপেক্ষা করেন আবার কেউ বা সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে প্রবৃত্তির শ্রীচরণে আত্মসমর্পণ করেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের চরিত্রবল কেমন ছিল তা অনেকেই জোর দিয়ে বলতে পারবেন না। কারণ কোন মানুষের চরিত্র জানা খুব সহজ কথা নয়। বাইরের প্রকৃতি দিয়ে তাকে ঠিক বোঝা যায় না। তাকে বুঝতে হলে অন্তর-প্রকৃতি চাই। এই অন্তর-প্রকৃতির তলদেশ প্রশান্ত মহাসাগরের তুলনায় আরও বেশী গভীর। তার রহস্য অন্তর্যামী ভগবান ছাড়া সাধারণ বুদ্ধির মানুষের পক্ষে জানা সত্যিই কঠিন। তাই কারও কথা বা টুকরো লেখা পড়ে তার সামগ্রিক জীবন বিচার করা যুক্তিযুক্ত বলে মনে করি না। আর আমরা স্থূলবুদ্ধির দৌরাত্ম্যে তেমন ভুলই করে থাকি।

কোন লোক তিনি সাহিত্যিক হোন, কবি হোন, দার্শনিক হোন, শিক্ষক হোন বা সাধারণ লোকই হোন তাঁর সম্বন্ধে অন্য লোকে যতটুকু বলতে পারবেন তার চেয়ে বেশী এবং সম্পূর্ণভাবে বলতে পারবেন একমাত্র তিনিই। তাই তাঁর লেখা আত্মজীবনী গ্রন্থ যতটা প্রামান্য চরিত্র হবে অন্য কোন লেখা তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারবে না, এই আমার বিশ্বাস।

তবে এখানে আর একটা কথা না লিখে থাকতে পারছি না। আমাদের দেশে যে কটি আত্মজীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে সেগুলি কতটা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কারণ নিজের মানসিক

ক্রটি-বিচ্যুতি বা দুর্বলতার কথা বেশী কেউ বলতে চায় না সমাজ-সংসারে নিজের মানমর্য্যাদা খোয়া যাবে এই আশঙ্কায়, বিশেষ করে আমাদের দেশের মত গোঁড়া কুসংস্কারে ভরা রক্ষণশীল সমাজে। ইউরোপ বা আমেরিকা হচ্ছে স্বতন্ত্র দেশ। সে দেশে বহু আত্মজীবনীতে জীবনীকার একাধিকবার একাধিক জায়গায় নিজের চারিত্রিক দুর্বলতা স্বীকার করে বহু কাহিনী লিখে গেছেন।

এই কারণে আমাদের দেশের লেখককুল ঠিকমত আত্মজীবনী লিখতে গেলে দ্বিধায় পড়েন, ভয় পান। এই কারণে বোধহয় শরৎচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনী লেখেন নি। তবে তিনি সামান্য কয়েক পৃষ্ঠায় 'আত্মকথা' লিখে রেখে গেছেন। তিনি যদি প্রাণমনের সবকটি দরজা-জানলা খুলে রেখে আত্মজীবনী লিখে যেতে পারতেন তাহলে তাঁর আসল চারিত্রিক রূপটি সকলের কাছে অল্পবিস্তর সত্য হয়ে ধরা পড়তো। কেউ তাঁর চরিত্র প্রসঙ্গে ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হতো না। ভিন্ন টিকাটিপ্পনিও কেউ লিখতে যেত না।

কিন্তু আমাদের কথাশিল্পী তো সে কাজ করে যান নি। তাই তাঁর অমর রচনা 'দেবদাস', 'শ্রীকান্ত' 'শেষপ্রশ্ন', 'চরিত্রহীন' ও 'গৃহদাহ' পাঠ করে বহু লোকের আহার-নিদ্রা-মৈথুনে রত মন তীব্রভাবে সন্দেহপরায়ণ না হয়ে পারে না।

পতিতা নারীদের ইতিহাস লেখবার আশায় শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে পতিতালয়ে ঘুরে বেড়াতেন এবং এই প্রসঙ্গে তাঁর কিছু বক্তব্যও লিপিবদ্ধ করেন। অনেক সময় গল্পচ্ছলে বন্ধুবান্ধবদের কাছেও এই প্রসঙ্গে কিছু বলেছেন। এর জন্যে অনেক সন্দেহপরায়ণ মানুষ এবং দোষদর্শী মানুষ তাঁর চরিত্র প্রসঙ্গে ভ্রান্ত ধারণা করেছে। তাতে তিনি মনঃক্ষুন্ন যে হন নি তা নয় তবে তিনি তা ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের জীবনীকার গোপাল চন্দ্র রায় লিখেছেন: 'কেউ দিনের পর দিন পতিতাদের মধ্যে থাকলে, সাংসারিক লোকে বা সামাজিক লোকে তাকে কখনই ভাল চোখে দেখে না। তাকে উচ্ছৃঙ্খল দুঃশ্চরিত্র বলেই লোকে সাধারণতঃ তার দুর্নাম করে থাকে। তাই শরৎচন্দ্র পতিতাদের জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করতে গেলে, তখন লোকে তাঁর চরিত্র সম্বন্ধেও দুর্নাম রটনা করেছিল।'

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র ইং ১৪.৮.১৯ তারিখে তাঁর সাহিত্য-শিষ্যা লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে পত্র মারফৎ যা জানিয়েছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করছি:

"একবার ছেলেবেলায় ছয় সাত শত বাঙ্গালী কুলত্যাগিনীর ইতিহাস সংগ্রহ করেছিলাম। অনেক দিন, অনেক মেহন্নত; অনেক টাকা তাতে নষ্ট হয়, কিন্তু একটা আশ্চর্য শিক্ষাও আমার হয়েছিল। দুর্নামে দেশ ভরে গেল সত্যি, কিন্তু এই কথাটা নিঃসংশয়ে জানতে পারলাম, যারা কুলত্যাগ করে আসে, তাদের শতকরা প্রায় আশি জন সধবা। বিধবা খুব কম। স্বামী বেঁচে থাকলেই বা কি, আর কড়া পাহারা দিয়ে রাখলেই বা কি! আর বিধবা হলেই বা কি! দিদি, অনেক দুঃখেই মেয়েমানুষে নিজের ধর্ম নষ্ট করতে রাজী হয়, আর যে-জন্যে হয়, সেটা পরপুরুষের রূপও নয়, একটা বিভৎস প্রবৃত্তির লোভেও নয়। তারা এতবড় জিনিসটা যখন নিজের নষ্ট করে, তখন বাইরে গিয়ে কিছু একটা আশ্চর্য বস্তু পাবার লোভে নয়, কেবল কিছু একটা থেকে আপনাকে রেহাই দেবার জন্যেই এ দুঃখ মাথায় তুলে নেয়।'

অনেকের ধারণা, শরৎচন্দ্র বেশ্যাসক্ত ছিলেন। তিনি যখন বেশ্যাপাড়ায় মাঝে মাঝে থাকতেন বা ঘোরাঘুরি করতেন তখন তিনি নিশ্চয়ই তাদের সঙ্গসুখ উপভোগ করতেন ঢালাওভাবে।

কিন্তু তাঁরা জানেন না আসল শরৎচরিত্র কি জিনিষ। পতিতাদের মাঝে ঘোরাঘুরি করেও তিনি ছিলেন পতিতাসঙ্গবিমুখ। তাঁকে পাঁকাল মাছও বলা যেতে পারে। পাঁকে থাকবে কিন্তু গায়ে পাঁক লাগতে দেবে না। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র তাঁর স্নেহভাজন বন্ধু হরিদাস শাস্ত্রীকে একদিন বলেছেন: 'নারীজাতি সম্বন্ধে আমার চরিত্র কোনকালেই উচ্ছৃঙ্খল ছিল না, এখনও নয়। নেশার চূড়ান্ত করেছি, অনেক অস্থানে কুস্থানে গিয়েছি, কিন্তু তুমি সে সব জায়গার খবর নিয়ে জানতে পার, তারা সকলেই আমায় শ্রদ্ধা করতো। কেউ দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর বলতো। কারণ অত্যন্ত মাতাল অবস্থায়ও তাদের দেহের উপর আমার কখনো লালসা হয় নি। তার কারণ এ নয় যে আমি অত্যন্ত সংযমী, সাধু, নীতিবাগীশ—কারণ এই যে, ওটা চিরদিনই আমার রুচিতে ঠেকেছে।'

ব্রহ্মদেশে যখন বসবাস করতেন শরৎচন্দ্র তখন তিনি রেঙ্গুন শহর থেকে মাইল দুয়েক দূরে এক মিস্ত্রীপল্লীতে স্বল্প টাকায় ভাড়া নিয়ে একটি ঘরে থাকতেন। ওখানে কলকারখানার বহু শ্রমিক থাকতো। তাদের পল্লীতে শরৎচন্দ্র গিয়ে বাস করতেন বলে তাদের খুব উপকার হয়েছিল। কেননা, শরৎচন্দ্র তাদের বহু ব্যাপারে নানারকমভাবে সাহায্য করতেন। আপদেবিপদে তিনিই ছিলেন মিস্ত্রীদের বন্ধু—প্রাণের সাথী।

অসুস্থ হয়ে পড়লে গরীব মিস্ত্রীরা রোগের চিকিৎসা করতে পারতো না। এই কারণে দরদী শরৎচন্দ্র তাদের চিকিৎসার দায়িত্ব নিজের হাতে নেন। তিনি একটা হোমিওপ্যাথির বই কিনে সেটির আদ্যোপান্ত পাঠ করে মিস্ত্রীদের সুচি-কিৎসা করতে লাগলেন। তাদের ওষুধের পয়সা নিতেন না।

ঝগড়া-বিবাদ হলে শরৎচন্দ্র মিস্ত্রীপল্লীর লোকজনদের মধ্যে বসে সেই বিবাদ মিটিয়ে ফেলতে পারতেন।

তিনি সকল প্রকারে ছিলেন মিস্ত্রীদের দরদী বন্ধু। এই কারণে মিস্ত্রীরা তাঁকে বামুনদাদা বলে ডাকতো।

ঐ মিস্ত্রীদের একটা নিজস্ব কীর্ত্তনের দল ছিল। সন্ধ্যে হলে তারা খোলকর-তাল সহযোগে কীর্তন করতো। ঐ কীর্তনদলের পরিচালনা করতেন কথাশিল্পী নিজে। ঐ কীর্তনদলের দোহার ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ মান্না। তিনি ছিলেন হাওড়া জেলার আমতার মানুষ। তিনি একবার শরৎচন্দ্রের দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন। শরৎচন্দ্র তাঁর দুঃসময়ে অর্থ ও উপদেশ দিয়ে সাহায্য করেন।

বিপথগামী অনেক মিস্ত্রীকে বিপথ হতে উদ্ধার করেন শরৎচন্দ্র। মিস্ত্রীদের মধ্যে অনেকের মদের নেশা ছিল। এক একজন শনিবার হলে এত মদ খেয়ে আনন্দ করতো যে তার জের চলতো পরবর্তী সোমবার মঙ্গলবার পর্যন্ত। তখন তাদের কারখানার কাজে কামাই হতো। তারা দরখাস্ত লেখাবার জন্যে শরণাপন্ন হতো শরৎচন্দ্রের। ঐ সময় শরৎচন্দ্র তাদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে তাদের মদের নেশা হতে দূরে সরিয়ে দিতেন। এমনকি অনেক সময় তারা মদ খাওয়া ছেড়েও দিতো।

কেবল মদের নেশা নয়, নারীর প্রতি আসক্ত অনেক বিবাহিত-অবিবাহিত পুরুষদের চরিত্রও সংশোধন করে দেন শরৎচন্দ্র।

রেঙ্গুনে থাকার সময় তিনি যে কেবল বাঙালীদের উপকার করতেন এমন কথা বলা উচিত নয়। অনেক সময় দুঃস্থ কর্মীদেরও উপকার করতেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরিচিত লোকেদের কাছে বলতেন 'এ দেশটা এদের। আমরা এসে এখান থেকে পয়সা নিয়ে যাচ্ছি। শুধু তাই নয়, এদের ভাতও আমরা নিয়ে যাচ্ছি। তাই এদের অভাবে আমাদের দেখা উচিত।'

রেঙ্গুনে অবস্থানকালে শরৎচন্দ্র স্বজাতীয় এক ব্রাহ্মণ কন্যাকে সমাজের অবিচার হতে রক্ষা করতে গিয়ে বিয়ে করেন। উক্ত অসহায়া কন্যাটির পিতা ছিলেন মদ্যপ এবং দুশ্চরিত্র। একবার তিনি তাঁর বৃদ্ধ মাতাল বন্ধুর সঙ্গে তাঁর কন্যার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।

পরে বিদ্রোহিনী কন্যাটি শরৎচন্দ্রের বাসায় এসে আশ্রয় নেন।

শরৎচন্দ্র তাঁর দুরবস্থা লক্ষ্য করে তাঁকেই তাঁর স্ত্রী বলে গ্রহণ করেন।

পরে তাঁর একটি পুত্রও জন্মগ্রহণ করে।

কিন্তু তাঁর ভাগ্যে স্ত্রী ও পুত্রের সুখ বেশীদিন টিকলো না।

মাত্র দু'বছরের মাথায় প্লেগরোগে আক্রান্ত হয়ে স্ত্রী ও পুত্র মরণের পারে পাড়ি দেন।

শরৎচন্দ্র স্ত্রীও পুত্রকে খুব ভালবাসতেন। তাঁদের মৃত্যু হওয়াতে তিনি এতখানি ভেঙ্গে পড়েন যে তা বলবার কথা নয়। এই প্রসঙ্গে কবি নরেন্দ্র দেব তাঁর 'শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে লিখেছেন: 'রেঙ্গুনে আবার একবার প্লেগের দারুণ মহামারী দেখা দিল—শরৎচন্দ্রের পত্নী, পুত্র সেই প্লেগের আক্রমণে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে যেন স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেল। কোমল-হৃদয় শরৎচন্দ্র সেদিন বালকের ন্যায় অধীরভাবে কেঁদেছিলেন। তাঁর সেই সকাতর অশ্রু বিসর্জন দেখে রেঙ্গুনের তাঁর পরিচিত বন্ধু-বান্ধবরা চোখের জল রোধ করতে পারেন নি।'......

প্রথম স্ত্রী শান্তিদেবীর মৃত্যুর পর শরৎচন্দ্র মেদিনীপুরের দরিদ্র ব্রাহ্মণ কৃষ্ণদাস অধিকারী বা চক্রবর্তীর কন্যা হিরন্ময়ীদেবীকে বিয়ে করেন। তাঁর এই দ্বিতীয়বার বিয়ে রেঙ্গুনেই অনাড়ম্বরভাবে হয়েছিল। তাই অনেকে হিরন্ময়ীদেবীকে শরৎচন্দ্রের ধর্মপত্নী না বলে সঙ্গিনী বলে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন অচার্য নরেন্দ্র দেব। আর একজন হচ্ছেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বিদেশবিভুঁয়ে নিতান্ত অনাড়ম্বরভাবে শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিয়ে হয়েছিল বলেই অনেকের কাছে এই বিয়ে সামাজিক রীতিনীতি নির্ভর নয় বলে স্বীকৃতি পায় নি। অথচ শরৎচন্দ্র নিজে বলেছেন যে তিনি হিরন্ময়ীদেবীকে বিয়ে করেছেন। আবার হিরন্ময়ীদেবীও বলেছেন যে তিনি শরৎচন্দ্রের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়েছেন। মৃত্যুর আগে শরৎচন্দ্র যে উইল করে যান তাতে তিনি হিরন্ময়ী-দেবীকে স্ত্রীরূপে উল্লেখ করেছেন।

শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয়বার বিয়ে প্রসঙ্গে জীবনীকার গোপালচন্দ্র রায় লিখেছেন:

'শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে ফিরে এসে বাজে শিবপুরে বাসা করলে অনিলাদেবী ভাই-এর বাড়ীতে যান। সেখানে গিয়ে একদিন তিনি কথায় কথায় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে হিরন্ময়ীদেবীর বিয়েটা কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে তিনি হিরন্ময়ীদেবীকে প্রশ্ন

করেন। উত্তরে তিনি অনিলাদেবীকে বলেছিলেন যে, হিরন্ময়ীদেবী যখন রেঙ্গুনে তাঁর বাবার কাছে থাকতেন, সেই সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর বাবার বিশেষ পরিচয় ছিল। এই বিশেষ পরিচয়ের জোরেই হিরন্ময়ীদেবীর বাবা একদিন সকালে কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করে বলেন—আমার মেয়েটির এখন বিয়ের বয়স হয়েছে। একে সঙ্গে নিয়ে একা বিদেশ বিভুঁইয়ে কোথায় থাকি। আপনি যদি অনুগ্রহপূর্বক আমার এই কন্যাটিকে গ্রহণ করে আমায় দায়মুক্ত করেন তো গরীব ব্রাহ্মণের বড় উপকার হয়। আর একান্তই যদি না নিতে চান তো, আমায় কিছু টাকা দিন। আমি মেয়েকে নিয়ে দেশে ফিরে যাই। দেশে গিয়ে মেয়ের বিয়ে দিই।

'কৃষ্ণদাসবাবু শেষে শরৎচন্দ্রের কাছে টাকার কথা বললেও তিনি বিশেষ করে শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ করেন, যেন তিনিই তাঁর কন্যাটিকে গ্রহণ করেন।

'শরৎচন্দ্র প্রথমে অরাজী হলেও, কৃষ্ণদাসবাবুর অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁর কন্যাকে বিয়ে করেন।'

পরবর্তীকালে শরৎচন্দ্র বাজে শিবপুর ত্যাগ করে হাওড়া জেলার সামতাবেড়ের তাঁর দিদির বাড়ীর কাছে গিয়ে বাড়ি করেন।

শরৎচন্দ্রের দিদি নিঃসন্তান ছিলেন। তাই তাঁর দিদির দেওরপোরাই হিরন্ময়ীদেবীকে দেখাশোনা করতেন যখন তিনি সামতাবেড়ে থাকতেন।

রেঙ্গুনে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ হয় 'ব্রহ্ম-প্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থের লেখক যোগেন্দ্রনাথ সরকারের সঙ্গে।

যোগেন্দ্রনাথ সেই সময় শরৎচন্দ্রের মতই একজামিনার পাবলিক ওয়ার্কস একাউণ্টস অফিসে কেরানীর কাজ করতেন।

ঐ সময় শরৎচন্দ্র ব্রহ্মে প্রবাসী বাঙালীদের নিয়ে একটি ক্লাব গঠন করেন। তার নাম দেন 'বেঙ্গল সোশ্যাল ক্লাব।' উক্ত ক্লাবের সদস্যরা প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যের সময় গান-বাজনা-থিয়েটার ইত্যাদি করতেন। শরৎচন্দ্র ঐ ক্লাবের সদস্য হন এবং প্রতিদিন গান গাইতেন। ক্রমে তিনি উক্ত ক্লাবের প্রধান গায়কের পদ অলঙ্কৃত করেন।

শরৎচন্দ্র ঐ ক্লাবে রবীন্দ্রসংগীত, কীর্তন, ভজন, নীলকণ্ঠ, নিধুবাবু, দাশরথি রায় প্রভৃতির গান গাইতেন। তবে তাঁর কাছে সবচেয়ের প্রিয় ছিল রবীন্দ্র-সংগীত।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ। শরৎচন্দ্র তখন রেঙ্গুনে রয়েছেন। ঐ সময় কবি নবীনচন্দ্র সেন রেঙ্গুনে যান। সোশ্যাল ক্লাব কবিকে সম্বর্দ্ধনা জানান।

সেদিনকার সেই সম্বর্দ্ধনাসভায় উদ্বোধন সংগীত গান কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তাঁর গানে মুগ্ধ হয়ে কবি তাঁকে 'রেঙ্গুনরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন।

গান গাইতে শুরু করলে শরৎচন্দ্র একসঙ্গে একাধিক গান গাইতে পারতেন। তবে বেশীদিন পর্যন্ত তাঁর ঐ অভ্যাস ছিল না। তাঁর স্বাস্থ্য ভাল না থাকার দরুন তিনি উক্ত ক্লাবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

গানবাজনা ছাড়া রেঙ্গুনে থাকার সময় ছবি আঁকতেন শরৎচন্দ্র। তিনি কয়েকটি তৈলচিত্রও আঁকেন। তাদের মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে দু'টি। একটির নাম 'রাবণ-মন্দোদরী' অন্যটির নাম 'মহাশ্বেতা'।

এছাড়া তিনি আরও অনেকগুলি ছবি আঁকেন। সেগুলির মধ্যে বিখ্যাত হচ্ছে 'নারদ মুনি'। এই ছবিটি তিনি আঁকেন একজন জীবিত বৃদ্ধকে ঘরে ডেকে এনে। লোকটি ছিল অতিবৃদ্ধ। তাকে দেখে পাড়ার ছেলেরা নাম দিয়েছিল 'নারদ মুনি'। মাথায় ও মুখে চুলদাড়ি সব সাদা হয়ে গেছলো। তার ছবি আঁকার সময় সে শরৎচন্দ্রের বাড়ীতে বেড়াতে এলে শরৎচন্দ্র তাকে প্রতিদিন মধ্যাহ্নভোজে আপ্যায়িত করতেন।

ছবি আঁকার বিদ্যা আপনি আসে নি শরৎচন্দ্রের জীবনে। তিনি অন্য একজন চিত্রশিল্পীর কাছ থেকে এই অমূল্য বস্তুটি আয়ত্ত করেন। শিল্পীটির নাম বাখিন। তিনি বর্মার মানুষ।

এছাড়া শরৎচন্দ্র দেশী বিদেশী অনেক চিত্র-শিল্পীদের প্রসঙ্গে লেখা বহু বই পাঠ করেন। অনেক বিদেশী চিত্রশিল্পীদের আঁকা ছবি নিয়ে বন্ধুদের মাঝে আলাপ করতেন। তিনি বলতেন, 'র‍্যাফেলের চেয়ে মাইকেল এঞ্জেলো বড়। তবে বড় বড় আর্ট ক্রিটিকদের মতে তিসিয়ান সবচেয়ে বড় পেণ্টার।...একালের চিত্রকরদের মধ্যে মিলের টার্ণারের খুব নাম। দুজনই বিলাতী চিত্রকর। স্যার জোশুয়া রেনল্ডস্ ও গেইনস্‌বরোর পর এঁরাই বিলাতে বিখ্যাত চিত্রশিল্পী।... ল্যাণ্ডস্কেপ পেইণ্টিংয়ের চেয়ে হিউম্যান পেইণ্টিং ফোটানো ঢের শক্ত। রীতিমত অ্যানাটমির জ্ঞান না থাকলে হিউম্যান পেইণ্টিং ভাল আঁকা যায় না। ছবিখানি হওয়া চাই হুবহু জীবন্ত, তবে তো ছবি। নইলে ন্যাকড়ার ওপর যা তা রং দিয়ে আঁচড় পাড়লেই ছবি হ'ল না।'

শরৎচন্দ্র যে বাড়ীতে থাকতেন সেই বাড়ীতে হঠাৎ একদিন আগুন লাগার

ফলে তাঁর বইপত্রসহ তাঁর আঁকা ছবিগুলি পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায়। তাই পরবর্তী কালের মানুষ জানতে পারলেন না যে শরৎচন্দ্র যেমন ছিলেন কথাশিল্পী তেমনি ছিলেন চিত্রশিল্পী।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, সাধনা করতে হয় তিনটি ক্ষেত্রে—মনে, কোণে আর বনে। লোকালয়ের মাঝখানে, হৈচৈ-এর মধ্যে সাধনা হয় না। সে যে কোন বিষয়ের সাধনা হোক না কেন। সাহিত্যচর্চাও এক প্রকারের সাধনা। যারা সত্যিকারের সাহিত্যিক হতে চান তাঁদের অতি গোপনে সাহিত্যপাঠ, সাহিত্য-লেখা ইত্যাদি করতে হয়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন প্রকৃত সাহিত্য-সেবী। তিনি লোকালয়ের মাঝে থেকে হৈ চৈ করে সাহিত্যচর্চা করতে ভালবাসতেন না। একান্ত গোপনে থেকেই তিনি এই মহৎ কর্ম করতেন। তাঁর এই কাজের কথা জানতেন খুব অল্প লোকই। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন তাঁর মাতুল বা মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। শরৎচন্দ্র ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে রেঙ্গুন থেকে কোলকাতায় আসতেন। সেই সময় তিনি মামা সুরেন্দ্রনাথের কাছে কিছু লেখা জমা রেখে দিতেন। সেই সঙ্গে বলতেন, এগুলি 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপাবার ব্যবস্থা কোরো।

একদিন শরৎচন্দ্র ডাকে একটি পত্রিকা পেলেন। তার নাম 'ভারতী'

পত্রিকাটি মোড়ক থেকে খুলে দু'চার পাতা উল্টে দেখলেন, তাঁর লেখা 'বড়দিদি' নামে বড় গল্পটির প্রথম কিস্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু তাঁর নাম লেখা নেই।

এই ব্যাপার দেখে অবাক হলেন শরৎচন্দ্র। ভাবলেন, আমি মামাকে লেখাটি দিয়ে এসেছিলুম 'প্রবাসী' পত্রিকায় ছাপাবার জন্যে। সেখানে এই লেখাটি বেরুলো না। ভারতীতে বেরিয়েছে, তাও আবার নামবিহীন হয়ে।

এ নিশ্চয়ই মামার ভুলের মাশুল। তাঁর কাছে এই লেখাটি অনেক আগে রেখে এসেছিলুম। তিনি প্রবাসীতে লেখাটি না পাঠিয়ে ভারতীতে ছাপতে দিয়েছেন।

যাইহোক এই সমস্যার সমাধানের জন্যে মামার কাছে পত্র লিখলেন শরৎচন্দ্র।

মামা সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গে এক জবাবী পত্রে জানালেন সমস্ত ঘটনাটি। তিনি খোলাখুলিভাবে জানালেন, তোমার লেখাটি 'প্রবাসী' পত্রিকায় দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা ছাপলেন না। লেখাটি সরলা দেবীর খুব পছন্দ হয়। তিনি সৌরীন্দ্র-নাথ মুখোপাধ্যায়কে দিয়ে ওটিকে 'ভারতী' পত্রিকায় ছাপবার ব্যবস্থা করেন।

পর পর দুটি সংখ্যায় লেখাটি ভারতীতে অনামায় প্রকাশিত হলো। পাঠক-সমাজে পড়ে গেল অভাবিত আলোড়ন। তাঁদের ধারণা, এ লেখাটি নিশ্চয়ই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের হবে। তাঁরা আগ্রহ নিয়ে লেখাটি পড়বার জন্যে ভারতী পত্রিকার পরের সংখ্যার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইলেন।

তৃতীয় সংখ্যায় লেখাটির অংশবিশেষ প্রকাশিত হলো। সঙ্গে লেখকের নামও ছাপা হলো—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পাঠক এবার একজন অপরিচিত নতুন লেখকের নাম জানলেন। কিন্তু অপরিচিত হয়েও লেখার গুণে সেদিন শরৎচন্দ্র অতি অল্প সময়ের মধ্যে পাঠক-সমাজে পরিপূর্ণভাবে সমাদৃত হয়েছিলেন।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ 'বড়দিদি' গল্পটি পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং লেখকের অনুসন্ধান করতে থাকেন। তাই শুনে সৌরীন্দ্রমোহন একদিন অবনীন্দ্রনাথ ও মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা করেন।

কবিগুরু সৌরীন্দ্রমোহনকে বললেন, এমন প্রতিশ্রুতিপরায়ণ লেখককে সুদূর বর্মায় কেন থাকতে হচ্ছে। যেমন করে পারো তাকে বাংলায় আনাও এবং ধরে লেখাও। বাংলাদেশে এঁর জোড়া লেখক পাবে না।

'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতিও এই অজ্ঞাতকুলশীল সাহিত্যিকের সন্ধান পাবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

রেঙ্গুনে যখন 'ভারতী' পত্রিকাটি যায় তখন শরৎচন্দ্রের বন্ধুরা 'বড়দিদি' পড়ে অবাক হন।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র একবার কোলকাতায় আসেন। তখন সৌরীন্দ্র-মোহনের বাড়ীতে বসে তাঁর মুখ থেকে 'বড়দিদি' গল্পটি শুনে অভিভূত হয়ে যান। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন :

'গল্প পড়ছি, শরৎচন্দ্র মাঝে মাঝে অভিভূতের মতো উঠে বসেন, বলেন—থামো, থামো। তাঁর দু'চোখে সজল আবেশ ভাব। শরৎচন্দ্র বলেন—আমার লেখা? নেহাৎ মন্দ লিখিনি তো। লেখা শুনে বুক দুলে ওঠে। এ-গল্প আমি এই আমার হাতে লিখেছি। আশ্চর্য!'

আবার পরবর্তীকালে এই 'বড়দিদি' প্রসঙ্গে বিরূপ মন্তব্য শোনা গেছে শরৎচন্দ্রের মুখে যখন উক্ত গল্পটি গ্রন্থাকারে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তিনি রেঙ্গুন থেকে বড়দিদি-র প্রকাশক ফণীন্দ্র নাথ পালকে লেখেন, 'তোমার প্রেরিত বড়দিদি পাইয়াছিলাম, মন্দ হয় নাই।

তবে ওটা বাল্যকালের রচনা। ছাপানো না হইলেই বোধ করি ভাল হইত।'

শরৎচন্দ্র অল্প বয়সে 'বড়দিদি' লেখেন বলে তা স্বয়ংসম্পূর্ণ ও সার্থক গল্প হয়ে উঠতে পারে নি। তার মধ্যে অপরিণত বয়সের ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে।

এই বড়দিদি প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত গবেষক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন : 'বড়দিদি' অপরিণত বয়সে রচিত হইয়াছিল, সেজন্য অপরিণত বয়সের রচনার ধর্ম ইহার মধ্যে অনেক দিক দিয়া পরিস্ফুট।

'বড়দিদি' বইখানা ঠিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না, কারণ উপন্যাসের দীর্ঘতা, বিশালতা, বৈচিত্র্য ও জটিলতা ইহাতে নাই।

'শরৎচন্দ্র 'বড়দিদি'র কাহিনীর মধ্যে অনেক স্থানেই অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা ও আতিশয্য আনিয়া ফেলিয়াছেন।...'

'বড়দিদি' গল্পে যত ত্রুটি থাক না কেন ওটি শরৎচন্দ্রকে লেখকরূপে আত্ম-প্রকাশিত হবার চাবিকাঠি এনে দিয়েছে। ওর খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে অনেক পত্রিকার সম্পাদক শরৎচন্দ্রের মত লেখকের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন 'সাহিত্য' ও 'যমুনার' সম্পাদকদ্বয়।

'যমুনা' পত্রিকা প্রকাশিত হবার পর তাতে শরৎচন্দ্রের 'বোঝা' নামে একটি পুরোনো লেখা মুদ্রিত হয় (১৩১৬—কার্তিক-পৌষ)।

কিন্তু ঐ লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার পর শরৎচন্দ্র খুশী হতে পারেন নি। বরং দুঃখ প্রকাশ করে সৌরীন্দ্রমোহন ও ফণীন্দ্র পালকে চিঠি লেখেন। সেই সঙ্গে তিনি সতর্ক করে দেন যেন তাঁর পুরোনো লেখা তাঁরা আর না ছাপেন।

তাঁর এই নিষেধাজ্ঞা প্রকাশের কারণও ছিল যথেষ্ট। 'বোঝা' গল্পে শরৎ-প্রতিভার প্রকাশ আদৌ ছিল না। বরং তাতে বঙ্কিমপ্রতিভার প্রভাবই প্রকাশ পেয়েছে।

যাইহোক 'বোঝা' আয়তনে ছোট হলেও ওর মধ্যে বর্তমান রয়েছে উপন্যাসের গুণ। অল্প জায়গার মধ্যে একাধিক ঘটনা-বৈচিত্র্য ও চরিত্রের জটিলতাপূর্ণ রূপান্তর ঘটেছে।

শরৎচন্দ্রের অপর দুটি প্রাথমিক রচনা 'বাল্যস্মৃতি' ও 'কাশীনাথ' সুরেশচন্দ্র সমাজপতি সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। প্রথমটি প্রকাশিত হয় উক্ত পত্রিকার ১৩১৯ সালের মাঘ সংখ্যায় এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ঐ সালের ফাল্গুন-চৈত্র সংখ্যায়। এই প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় লিখেছেন :

'এর মধ্যে তাঁর লেখা বাল্যস্মৃতি এবং কাশীনাথ গল্প সাহিত্যে ছাপানো নিয়ে এক বিশ্রী ব্যাপার ঘটলো। সাহিত্য-সম্পাদকের কৃপালাভের বাসনায় অর্থাৎ নিজের লেখা গল্প-সাহিত্যে ছাপাবার সুবিধা হবে ভেবে আমাদের এক বন্ধু শরৎচন্দ্রের লেখা ঐ দুটি গল্প কোনোরকমে হস্তগত করেন; ক'রে শরৎচন্দ্র এবং আমাদের সকলের অজ্ঞাতে ও দুটি লেখা চুপি চুপি সাহিত্য-সম্পাদকের হাতে তুলে দেন এবং সাহিত্যেও দুটি গল্প ছাপা হয়।'

'বাল্যস্মৃতি' তে যদিও সুকুমার-কথিত অন্যের নাম আছে তবু এটি অনেকে মনে করেন শরৎচন্দ্রের নিজের জীবনের বাল্যস্মৃতি।

শরৎচন্দ্রের 'কাশীনাথ' ছোটগল্প নয়, উপন্যাসও নয়। এটি 'বড়দিদি'-র মত একটি বড় গল্প বিশেষ।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র কোলকাতায় এলে সৌরীন্দ্রমোহন শরৎচন্দ্রকে 'যমুনা' পত্রিকার জন্যে গল্প-উপন্যাস লিখতে অনুরোধ জানান। তার উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন, 'আমি লিখবো, তোমরা যদি লেখো—মানে, বুড়ী (নিরুপমাদেবী), সুরেন, গিরীন, পুঁটু, তুমি। তোমার ছোটদিদি, উপেন—তাহ'লে আমি লিখবো নিশ্চয়।'

এর আগে শরৎচন্দ্র 'নারীর ইতিহাস' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ এবং 'চরিত্র-হীন' উপন্যাসের কিছু অংশ লেখেন।

'নারীর ইতিহাস' লিখতে বসে শরৎচন্দ্র প্রাণপাত্ত পরিশ্রম করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সৌরীন্দ্রমোহনকে বললেন, 'একটা চমৎকার জিনিস লিখেছিলুম—নারীর ইতিহাস। প্রায় পাঁচশো পাতা ফুলস্কাপ সাইজের কাগজ। ঘর পুড়ে সে-লেখা ছাই হয়ে গিয়েছে। গল্প নয়, কিন্তু সে-লেখাটি গল্প-উপন্যাসের চেয়ে ঢের বেশী interesting, অনেক ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ঘেঁটে, অনেক জীবন অনুশীলন ক'রে লেখা। সেটা পুড়ে যাওয়ায় মনে ভারী আঘাত লেগেছে।'

তাঁর স্বনামধন্য এবং সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত উপন্যাস 'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে বললেন, 'আর একটা লেখা আছে গল্প। সেটা প্রকাণ্ড উপন্যাস হবে। সিকি ভাগ লেখা প'ড়ে আছে—সে লেখাটাও তোমাদের পড়াবো। সে-গল্পটির নাম দিয়েছি চরিত্রহীন। যদি লিখে শেষ করতে পারি দেখবে সে এক নতুন জিনিস হবে।'

'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানি সে যুগে অনেক পত্রিকার সম্পাদক অশ্লীল বলে তাঁদের কাগজে ছাপতে গররাজী হন। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন 'ভারতবর্ষ'

পত্রিকার সম্পাদক। শরৎচন্দ্রের বড় আশা ছিল যে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানি ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হোক।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর আশা সফল হলো না। ভারতবর্ষ-সম্পাদক 'চরিত্রহীন' উপন্যাস অশ্লীল বলে প্রত্যাখান করলেন।

পরে উক্ত উপন্যাসখানি ১৩২০ সালের কার্তিক-চৈত্র ও ১৩২১ সালের 'যমুনায়' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়।

পত্রিকায় উক্ত উপন্যাসখানি প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ওর পক্ষে ও বিপক্ষে নানা প্রকার মন্তব্য শোনা গেল। তাই শুনে শরৎচন্দ্র ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে প্রমথনাথকে লিখলেন, 'আমার চরিত্রহীন তোমাদের বদনামের গুণে সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে বসিয়াছে। অর্থাৎ কাল ফণী telegraph করিয়াছে 'Charitrahin Creating alarming sensation.' আমি জিজ্ঞাসা করি কি আছে ওতে? একজন ভদ্র ঘরের মেয়ে যে কোন কারণেই হোক, বাসায় ঝিবৃত্তি করিতেছে (Character unquestionable নয়), আর একজন ভদ্র যুবা তারই প্রেমে পড়িতেছে—অথচ শেষ পর্যন্ত এমন কোথাও প্রশ্রয় পাইতেছে না।'

'চরিত্রহীন' প্রসঙ্গে সৌরীন্দ্রমোহন লিখেছেন, 'কিন্তু চরিত্রহীন ছাপা হ'লে নানা রকমের এত মতের সৃষ্টি হ'ল যে কোন্‌টা পাব্লিকের অভিমত তা' বোঝা সহজ ছিল না। এতখানি sensation আমাদের বয়সে অন্য কোনো রচনার সম্বন্ধে ঘটতে দেখিনি।'

এর মূলে যথেষ্ট কারণও আছে। বাংলাসাহিত্যে এ সম্পূর্ণ নতুন জিনিস বলে এত হৈ-চৈ সুরু হয়েছিল। বর্তমানকালে যেমন সমরেশ বসুর 'বিবর' এবং 'প্রজাপতি' বাংলা সাহিত্যের গগনে ঝড় তুলেছে।

'চরিত্রহীন' উপন্যাসখানি অনেক আগে লেখা হলেও নানা আপত্তির অজুহাতে ওটি পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেরী হয়।

'চরিত্রহীনের' আগে শরৎচন্দ্রের কয়েকটি লেখা 'যমুনায়' প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশিত হয় বিখ্যাত কিশোরকাহিনী 'রামের সুমতি'। কোলকাতা হতে রেঙ্গুনে ফিরে গিয়ে শরৎচন্দ্র এই রচনায় হাত দেন।

'রামের সুমতির' প্রথম অংশ ১৩১৯ সালের 'যমুনা'র ফাল্গুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় অংশ প্রকাশিত হয় উক্ত পত্রিকার চৈত্র সংখ্যায়।

'রামের সুমতি' পাঠ করে রেঙ্গুনের সাহিত্যমোদী সমাজ শরৎচন্দ্রের প্রতি আনুকূল্য প্রকাশ করতে লাগলেন। এতদিন পর্যন্ত তাঁরা শরৎপ্রতিভা প্রসঙ্গে

অন্য ধারণা পোষণ করতেন। এখন থেকে তাঁদের সে-মনোভাব বদলে গেল।

উক্ত গ্রন্থদ্বয় প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'চরিত্রহীন' ও 'রামের সুমতি' প্রায় একই সময়ে রচিত হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝা যায় যে, শরৎচন্দ্র আদিরস ও বাৎসল্যরস উভয় প্রকার রস-সৃষ্টিতেই সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন।'

কেনই বা তিনি সিদ্ধহস্ত হবেন না। প্রতিভাধর কথাসাহিত্যিকের কলমে যে কোন প্রকার সাহিত্যসৃষ্টিই সার্থক ও রসোত্তীর্ণ হয়ে ওঠে।

'রামের সুমতি' লেখা শেষ হলে শরৎচন্দ্র লিখলেন 'নারীর লেখা'। ওটিও যমুনায় প্রকাশের জন্যে পাঠালেন। যমুনায় ওটি ছাপা হলো ১৩১৯ সালের 'চৈত্র' মাসে। তবে শরৎচন্দ্রের নামে নয়, অনিলাদেবীর নামে।

শরৎচন্দ্র কেবল যে গল্প ও উপন্যাস লিখতেন এমন নয়, তিনি মাঝে মাঝে প্রবন্ধও লিখতেন। সেই সকল প্রবন্ধে প্রকাশ পেত তাঁর বুদ্ধি, মাধুর্য এবং জ্ঞানের দীপ্তি। এই প্রসঙ্গে তাঁর অন্যতম জীবনীকার ও সাহিত্যবিচারক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন: 'শরৎচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস ও প্রবন্ধ-সমালোচনার রচনারীতি সম্পূর্ণ বিভিন্ন। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে অনুভূতির কোমলতা এবং স্নিগ্ধ হাস্যের সঙ্গে করুণ রসের গভীরতা প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু প্রবন্ধ ও সমালোচনার মধ্যে বৈদগ্ধ্যের প্রখরতা এবং বুদ্ধিমার্জিত টীকাটিপ্পনীর শাণিত দীপ্তি দেখা গিয়াছে। গল্প-উপন্যাসের মধ্যে তাঁহার এক প্রীতিসিক্ত, ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু প্রবন্ধ-সমালোচনায় তাঁহার দৃষ্টি বক্র ও তীক্ষ্ণ, শ্লেষতিক্ত ও বিদ্রূপকষায়িত।'

এরপর শরৎচন্দ্র তাঁর সবচেয়ে প্রিয় গল্প 'পথনির্দেশ' লেখেন। ওটি প্রকাশিত হয় যমুনায় ১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যায়। এই গল্পটি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন: 'পথনির্দেশ' গল্পটি শরৎচন্দ্র অত্যন্ত যত্ন ও দরদের সঙ্গে লিখিয়াছিলেন, সেজন্য এই গল্পটির প্রতি তাঁহার মমত্ব ও পক্ষপাতিত্বও একটু বেশি ছিল। সমসাময়িক কালে লিখিত গল্পগুলির মধ্যে এই গল্পটিকেই তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন এবং লোকে যে এই গল্পটি অপেক্ষা 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'-কে অধিক প্রশংসা করিত ইহাতে তিনি সুখী হইতেন না। বোধ হয় এই গল্পটির মধ্যে তাঁহার অতিপ্রিয় সমস্যাটি, অর্থাৎ বিধবা নারীর ভালোবাসা লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন বলিয়াই ইহার প্রতি তাঁহার একটু বিশেষ দুর্বলতা ছিল।'

১৩২০ সালের চৈত্রসংখ্যা 'সাহিত্য' পত্রে প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের অন্যতম বিখ্যাত গল্প 'অনুপমার প্রেম'। এটি তিনি লেখেন ১৮৯৬-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। এতে রয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'কৃষ্ণকান্তের উইলের' প্রভাব। সুতরাং এই গল্পটি শরৎচন্দ্রের পূর্ণ মৌলিক সৃষ্টি নয়। শুধু তাই নয় এই গল্পের মধ্যে লেখকের নিজের জীবনের ছাপও অনেকখানি রয়েছে। এটি শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবনের রচনা বলে এর কোথাও কোথাও ত্রুটি রয়ে গেছে। এটি আকৃতিতে ছোটগল্প হলেও প্রকৃতিতে উপন্যাস।

" শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিন্দুব ছেলে' প্রকাশিত হয় ১৩২০ সালের শ্রাবণ মাসের যমুনায়।

উক্ত গ্রন্থবিষয়ে যোগেন্দ্র চন্দ্র সরকার লিখেছেন 'রামের সুমতি' ও 'পথনির্দেশ' যমুনায় প্রকাশিত হইলে, শরৎবাবু নূতন গল্প 'বিন্দুর ছেলে' ও সেই সঙ্গে 'নারীর মূল্য' প্রবন্ধ লেখা আরম্ভ করিলেন। 'বিন্দুর ছেলে' যে সময় লেখা হইতেছিল, ঠিক ঐ সময় রবীন্দ্রনাথের 'রাসমনির ছেলেও' ভারতীতে বাহির হইয়াছিল। গল্পটির বিষয় শরৎবাবুকে আমি প্রসঙ্গচ্ছলে একদিন মাত্র বলিয়াছিলাম। তাহাতে শরৎ-বাবু আমাকে বলিয়াছিলেন, থাখত দেখি আমার এ-গল্পটা কেমন হচ্ছে। আমার ত আর দু'দুটো গল্প লেখার পরে এতটুকুও লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে না—তুমি কি বল? যদি ভাল লাগে ত লিখি। আমার নিজের কাছে কিন্তু বড়ই 'ভাল মনে হচ্ছে।'

'বিন্দুর ছেলে' প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মনে নিরাশার ভাব জাগলেও ওটি গ্রন্থা-কারে প্রকাশিত হলে বহু জনসমাদর লাভ করে। এই প্রসঙ্গে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই তারিখে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে লিখলেন, 'বিন্দুর ছেলে তোমার ভাল লাগিয়াছে শুনিয়া খুব খুশী হইলাম। বোধ হয় ওটি মন্দ হয়নি, কেন না, অনেকেই ভাল বলিতেছেন। অনেকে রামের সুমতির চেয়েও ভাল বলেন শুনিতেছি।'

'রামের সুমতি'র চেয়ে 'বিন্দুর ছেলে'র মধ্যে শরৎচন্দ্রের প্রতিভা আরও সুন্দর ও ব্যাপ্তাকারে পরিস্ফুট হয়েছে। 'রামের সুমতি'তে নারায়ণীর সুগভীর স্নেহের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে ঠিক কিন্তু ওতে একান্নবর্তী পরিবারের পরিপূর্ণ রূপ প্রকট হতে পারে নি। অথচ বিন্দুর ছেলেতে সেটি রয়েছে।

১৩২০ সালের বৈশাখ সংখ্যা হতে 'যমুনা'-য় নারীর মূল্য ছাপা হতে থাকে। এই রচনাটি প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের রেঙ্গুনের সাহিত্যসঙ্গী যোগেন্দ্রনাথ সরকার তাঁর 'ব্রহ্মপ্রবাসে শরৎচন্দ্র' গ্রন্থে লিখেছেন:

'এই নারীর মূল্য সম্বন্ধে একটুখানি ইতিহাস আছে। সেইটি হইতেছে এই- শরৎবাবু যে নারীর ইতিহাস প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যাহার উল্লেখ ইতিপূর্বে করা গিয়াছে সেই প্রবন্ধ হঠাৎ গৃহদাহে নষ্ট হইয়া যায়, তৎসঙ্গে তাঁহার মহাশ্বেতার ছবিখানিও যায়। এই নষ্ট প্রবন্ধটিকে পুনরুদ্ধার মানসে লেখক নূতন প্রবন্ধ ধারাবাহিকভাবে লিখিতে শুরু করিলেন।'

'নারীর মূল্য' রচনার মধ্যে আদর্শবাদী ও নির্ভীক শরৎচন্দ্রের রূপ যে প্রকাশ পেয়েছে তা জানা যায় ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল তারিখে লেখা প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে একটি পত্রের মারফৎ। উক্ত পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন: 'দিদির নারীর লেখাটা সম্বন্ধে বোধকরি তোমার কিছু কুরুচি ভাব উদ্রেক করবে, কিন্তু Truth চাই-ই। আজকালকার দিনে এইটারই সবচেয়ে প্রয়োজন। আমি নির্ভীক লোক—খাতির করে কথা বলতে জানি না—তাই আমি নিজের ওপর এই ভারটা নিয়েছি। ঠিক এই ধরণের বারটা প্রবন্ধ লিখব।'

'নারীর মূল্য' গ্রন্থটি প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই জনগণের কাছ থেকে অভি- নন্দন আসতে লাগলো। বহু লোক তার প্রশংসা করতে লাগলেন। এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ১৪.৯.১৩ তারিখে ফণীন্দ্র পালকে লিখেছেন: 'নারীর মূল্য আগামী বারে শেষ করিয়া আর একটা সুরু করিব। নারীর মূল্যের বহু সুখ্যাতি হইয়াছে। দ্বিজেন্দ্রলাল বলিয়াছিলেন, 'নারীর মূল্য অমূল্য। তোমরা এ-লেখককে হাত করবার চেষ্টা কর।'

আবার অনেকে সমালোচনাও করেছেন। যেমন বিভূতিভূষণ ভট্ট। তিনি সৌরীন্দ্রমোহনকে এক পত্রে লেখেন, 'শরৎদার নারীর মূল্য জ্বালাতন করিয়াছে। নিজেই নারীর লেখায় মেয়েমানুষের পাণ্ডিত্যের চেষ্টাকে খুবই গালাগালি করিয়াছেন, এদিকে নিজেত মেয়েমানুষের বেনামীতে বেশ right and left সকলকে অক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন।'......

এরকম সমালোচনা নারীদরদী শরৎচন্দ্রের মনে বিন্দুমাত্র হতাশার ভাব জাগাতে পারে নি। বরং তিনি ছিলেন নিজব্যক্তিত্বে কঠোর ও দৃঢ়মন। এক- বার তিনি নিজের বক্তব্যও প্রকাশ করেন। তিনি লেখেন: 'যাহা সত্য তাহাই বলিব এবং বলিয়াছিও, অবশ্য ফলাফলের বিচার-ভার পাঠকের উপর।'

শরৎচন্দ্র ছিলেন পুরুষশাসিত নির্য্যাতিত নারীসমাজের প্রতি সদা সদয়। তিনি এদেশের নারীসমাজের দুঃখে অধৈর্য হয়ে পড়তেন এবং সাধ্যমত সহানুভূতি

জানাতেন। তাঁর সেই অকৃত্রিম সহানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের পাতায় পাতায়। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত নিজ মত ধারাল যুক্তি ও অকাট্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

১৩২০ সালের 'যমুনায়' বৈশাখ হতে আশ্বিন সংখ্যা পর্যন্ত 'চন্দ্রনাথ' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। ভাগলপুরে থাকার সময় শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লেখেন। পরে রেঙ্গুনে গিয়ে তিনি এই গল্পটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করে উপন্যাসের রূপ দেন এবং কোলকাতায় পাঠান 'যমুনা'-য় প্রকাশের জন্যে।

'চন্দ্রনাথ' উপন্যাসে শরৎচন্দ্র পুরুষশাসিত সমাজের বঞ্চিতা ও লাঞ্ছিতা নারীর অশ্রুসজল আলেখ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। এই উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের অল্পবয়সের রচনা বলে এতে কিছু কিছু দোষক্রটি রয়ে গেছে।

১৩২০ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যার 'যমুনা'-য় 'আলো ও ছায়া' প্রকাশিত হয়। এর আগে অবশ্য উক্ত গল্পটি সর্বসাধারণের মাঝে না হলেও অনেকের কাছে ঘরোয়াভাবে হাতে লেখা 'ছায়া' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত হাতে লেখা পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ভাগলপুর থেকে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, নিরুপমা দেবী প্রমুখের উৎসাহে। রচনার গুণে গল্পটি গীতিধর্মিতা লাভ করেছে।

শরৎচন্দ্রের লেখা 'বিরাজ-বউ' উপন্যাসটি ১৩২০ সালের পৌষ-মাঘ সংখ্যার ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়। উক্ত উপন্যাসটি ভারতবর্ষ পত্রিকায় প্রকাশের মূলে ছিল বন্ধু প্রথমনাথ ভট্টাচার্যের মূল সহযোগিতা।

'বিরাজ-বৌ' উপন্যাসটি পত্রিকায় প্রকাশিত হলে নিন্দা ও প্রশংসা উভয়েই আসতে লাগলো শরৎচন্দ্রের ভাগ্যাকাশে।

উক্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র আমাদের চিরপ্রচলিত পারিবারিক নীতি ও আদর্শের জয়গান গেয়েছেন। উক্ত গ্রন্থে বিরাজের পাতিব্রত্য লেখক খুব উঁচু করে তুলে ধরেছেন বটে কিন্তু তাতে করে তার চরিত্রের সর্বাঙ্গীন মহত্ত্ব প্রকাশ পায় নি যা নাকি আমরা লক্ষ্য করেছি উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত মোহিনী নামক আর এক নারীচরিত্রে।

শরৎচন্দ্রের লেখা 'ক্ষুদ্রের গৌরব' নামক একটি রম্যরচনামূলক প্রবন্ধ ১৩২০ সালের মাঘ সংখ্যার যমুনায় প্রকাশিত হয়। তাতে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের' প্রভাব বর্তমান। ওটা প্রথম প্রকাশিত হয় ভাগলপুর সাহিত্য সভার হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'ছায়া'-য়। 'যমুনা'-য় কিন্তু শরৎচন্দ্রের নামে

প্রকাশিত হয় নি। তাঁর নামের পরিবর্তে কেবল 'শ্রীচট্টোপাধ্যায়' কথাটি ব্যবহার করা হয়।

১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসে 'যমুনায়' 'পরিণীতা' নামে শরৎচন্দ্রের লেখা উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। এটি একটি সার্থক রোমান্টিক উপন্যাস। এতে লেখকের শিল্পসুষমার সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। লেখকের পরিণত চিন্তার প্রতিচ্ছবি এর প্রতিটি পাতায় রয়েছে। কিবা কাহিনীবিন্যাসে, কিবা বর্ণনাভঙ্গিতে, কিবা চরিত্রসৃষ্টিতে এর জুড়ি মেলা ভার। শরৎচন্দ্রের লেখা সুখপাঠ্য ও প্রণয়মূলক উপন্যাসগুলির মধ্যে পরিণীতা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ।

১৩২১ সালের বৈশাখ ও শ্রাবণ-সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের 'পণ্ডিতমশাই' প্রথম প্রকাশিত হয়। উপন্যাসের নায়ক বৃন্দাবন গ্রামের মধ্যে পণ্ডিতমশাইরূপে পরিচিত ছিলেন। ঐ পণ্ডিতমশাইয়ের নামানুসারে উপন্যাসটির নামকরণ হয়েছে 'পণ্ডিতমশাই'।

এই উপন্যাসে কথাশিল্পী ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন শরৎচন্দ্র মূঢ়, নির্মম ও আত্মঘাতি সমাজের এক ভয়াবহ চিত্র প্রকাশ করেছেন।

১৩২১ সালের 'সাহিত্য' পত্রে শরৎচন্দ্রের 'হরিচরণ' গল্পটি প্রকাশিত হয়। এটি তাঁর প্রথম জীবনের (সম্ভবত ১৯০০-১৯০১ খ্রীঃ) রচনা বলে কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। বাল্যস্মৃতি'তে যেমন তিনি একটি মেসের ঠাকুরের কথা লিখেছেন তেমনি এই গল্পে লিখেছেন একটি বাড়ীর চাকরের মর্মস্পর্শী ইতিকথা।

শরৎচন্দ্র যখন ব্রহ্মদেশে ছিলেন তখন তাঁর গল্প ও উপন্যাস 'যমুনা' পত্রিকায় প্রকাশ হতে লাগলো। তারপর 'ভারতবর্ষে'-ও তাঁর লেখা নিয়মিত বেরুতে লাগলো। পরবর্তীকালে 'যমুনা' ও 'ভারতবর্ষ' উভয় পত্রিকাতে তাঁর রচনা সমানভাবে প্রকাশিত হতে লাগলো। তবে যমুনার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। উক্ত পত্রিকার উন্নতির জন্যে তিনি সবরকম চেষ্টা করেন। পরে অবশ্য নানা কারণে তিনি যমুনার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রাখলেন না। ভারতবর্ষেই নিয়মিতভাবে তাঁর লেখা গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ হতে লাগলো। তবে তিনি 'যমুনা'র প্রতি চিরদিন সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং ওর উন্নতিবিধানের জন্যে ওর কর্ণধার ফণীন্দ্র পালের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন।

তবে একবার একটা কারণে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ফণীন্দ্র পালের মনোমালিন্য ঘটে। সেই ঘটনাটি অতি সামান্য। ফণীন্দ্র পাল শরৎচন্দ্রের প্রথম গ্রন্থ 'বড়দিদি' প্রকাশ করেন। তবে অর্থকড়ির ব্যাপারে তাঁর কার্পণ্য থাকার দরুন হোক বা অন্যের

প্ররোচনায় হোক শরৎচন্দ্র একবার 'যমুনা' অফিসে গিয়ে ফণীন্দ্র পালের আলমারীর দরজা ভেঙে কিছু বড়দিদির কপি নিয়ে আসেন এবং সেগুলি গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের দোকানে তুলে দেন।

শরৎচন্দ্রের ঐ প্রকার কাজের জন্যে সৌরীন্দ্রমোহন তাঁকে তীব্রভাবে তিরস্কার করেন।

শরৎচন্দ্রও অনুতপ্ত চিত্তে নিজের দোষ স্বীকার করে বললেন, 'একটা কথা সৌরীন…শাস্ত্রে আছে দারিদ্র্য-দোষো গুণরাশিনাশী। যেসব লেখক অন্য কাজ করে না…লেখা থেকেই যার জীবিকার সংস্থান তার মতো দুর্ভাগা জীব সত্যিই নেই।'

এই ঘটনাটি কেন্দ্র করে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ফণীন্দ্র পালের প্রীতির বন্ধন ছিন্ন হয়। ফণীন্দ্র পাল আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে শরৎচন্দ্র তাঁর 'যমুনা' পত্রিকায় নিয়মিত লেখা প্রকাশ করবার অধিকার দেন। এর জন্যে তাঁকে একসময় পত্রিকার সম্পাদকও করেন। কিন্তু তাঁর সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হলো। শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত তাঁর পূর্ণ প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে 'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক কাটিয়ে ভারতবর্ষে নিয়মিত গল্প ও উপন্যাস প্রকাশ করতে দিলেন।

শরৎচন্দ্রের প্রথম বই 'বড়দিদি' প্রকাশ করেন ফণীন্দ্রনাথ পাল। তারপর 'বিরাজ বৌ' উপন্যাসটি প্রকাশ করেন গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। আর্থিক অসচ্ছলতার দরুণ মাত্র দেড়শ টাকার জন্যে তিনি 'বিরাজ বৌ' এর কপিরাইট গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সকে বিক্রী করে দেন। তারপর শরৎচন্দ্রের প্রায় সব বই প্রকাশ করেন উক্ত সংস্থা। কেবল মাঝখানে টাকাকড়ির খুব প্রয়োজন হওয়াতে শরৎচন্দ্র 'চরিত্রহীন' 'নারীর মূল্য', 'কাশীনাথ', 'পরিণীতা' প্রভৃতি উপন্যাসের প্রথম সংস্করণের স্বত্ব পঁচিশ টাকা রয়্যালটির ভিত্তিতে এম সি সরকার কোম্পানীর সত্বাধিকারী সুধীরচন্দ্র সরকারকে দেন। বর্তমানে শরৎচন্দ্রের পুস্তকগুলি ছেপেছেন একাধিক প্রকাসক। তাঁরা হলেন এম সি সরকার কোম্পানী, বাক্‌সাহিত্য এবং ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোম্পানী।

১৩২১ সালের ভাদ্র সংখ্যায় ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের :'আঁধারে আলো' নামে গল্পটি প্রকাশিত হয়। একটি পতিতা নারীকে কেন্দ্র করে এই গল্পটি রচিত হয়েছে।

বাংলাসাহিত্যে শরৎচন্দ্রই সর্বপ্রথম পতিতাদের প্রতি হৃদয়ের আন্তরিক সহানুভূতি জানান। তাঁর আগে অনেক লেখকই পতিতাদের সম্বন্ধে কলম ধরেছেন

বটে তবে তাতে সহানুভূতির বদলে ছিল ঘৃণা। একমাত্র শরৎচন্দ্রই তাদের নারীত্বের মাধুর্য ও মহিমায় মণ্ডিত করেন।

১৩২১ সালের কার্তিক মাসে ভারতবর্ষে 'মেজদিদি' প্রকাশিত হয়। 'মেজদিদি' 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে-'র মতই বাৎসল্যরসের মাধুর্য ও বেদনায় মণ্ডিত।

১৩২১ সালের ভারতবর্ষে মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রে'র 'দর্পচূর্ণ' গল্পটি। এই গল্পের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আগেকার লেখা গল্প 'কাশীনাথের ভাব-সাদৃশ্য রয়েছে।

১৩২২ সালের আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ 'পৌষ সংখ্যা' ভারতবর্ষে শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের যতগুলি উপন্যাস জনপ্রিয় ও বিতর্কিত তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে ওল্লীসমাজ।

এই উপন্যাসের জনপ্রিয়তার কারণ অপূর্বভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন শরৎসাহিত্যের অন্যতম নিষ্ঠাবান সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ। তিনি লিখেছেন 'ইহার জনপ্রিয়তার কারণ সমাজচিত্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ ও একান্ত সত্য, বাস্তবতা, কৌতুক ও কারুণ্যের বিচিত্র উপাদানের কুশলী মিশ্রণ এবং রমা ও রমেশের আকর্ষণ-বিকর্ষণ জড়িত রহস্য জটিল গভীর ও ট্রাজিক ভালোবাসার বর্ণনা এবং ইহা লইয়া বিতর্কের কারণ, অন্ধ, অনুদার ও কলুষিত সমাজের প্রতি শরৎচন্দ্রের সুস্পষ্ট ও প্রবল বিরূপতা এবং সমাজনিষিদ্ধ প্রেমের প্রতি তাঁহার অকুণ্ঠ সমর্থনজ্ঞাপন'।

১৩২৩ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় 'বৈকুণ্ঠের উইল' নামক গল্পটি। উক্ত গল্পে স্নেহ-মমতার অপূর্ব লীলার প্রকাশ ঘটেছে। ভায়ে ভায়ে এবং মাতা-পুত্রের মধ্যে অপূর্ব ভালবাসার কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন দরদী শরৎচন্দ্র।

১৩২৩ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' উপন্যাসটি। এতে নারীর প্রতি সমাজের ভয়াবহ নৃশংসতার কথা লেখা হয়েছে।

১৩২২ সালের মাঘ-চৈত্র ও ১৩২৩ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে 'শ্রীকান্ত' (১ম পর্ব) প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র 'শ্রীশ্রীকান্ত শর্মা' এই ছদ্মনামে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস 'শ্রীকান্ত' রচনা করেন। প্রথমে তিনি একে

উপন্যাস বলেন নি, বলেছেন 'শ্রীকান্তের ভ্রমণকাহিনী'। এতে মাঝে মাঝে ভ্রমণের সৌরভ আছে বটে কিন্তু তার পরিপূর্ণ প্রকাশ নেই।

'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের জীবনের অনেকগুলি খণ্ডরূপ প্রকাশ পেয়েছে। যদিও শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও মিথ্যে তবু অনেকে তা বিশ্বাস করেন না। বহু বাঙালী পাঠক শ্রীকান্তের বর্ণিত বিভিন্ন প্রকার চরিত্রের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের বিভিন্ন ঘটনার ছায়া খুঁজে পেয়েছেন। হতে পারে উপন্যাস হিসেবে তার মধ্যে কিছু কাল্পনিক চরিত্র ও ঘটনা স্থান পেয়েছে তথাপি সামগ্রিক বিচারে শ্রীকান্ত শরৎচন্দ্রের আত্মজীবনী বা অটোবায়োগ্রাফী ছাড়া আর কিছু নয়।

যাই হোক 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস হচ্ছে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। শরৎসাহিত্যের অন্যতম বিচারক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ 'শ্রীকান্ত' উপন্যাস প্রসঙ্গে লিখেছেন :

...'শ্রীকান্ত' উপন্যাসকে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলা যাইতে পারে। শুধু যে এই উপন্যাসে তাঁহার ব্যক্তি-সত্তার নিবিড়তম প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা নহে, ইহাতে তাঁহার শিল্পী-সত্তারও প্রকৃষ্টতম পরিচয় ব্যক্ত হইয়াছে। অবশ্য মাঝে মাঝে ইহাতে তাত্ত্বিকতার আতিশয্য যে একটু অনাবশ্যক ও অপ্রাসঙ্গিক হইয়াছে তাহা সত্য। আলোচ্য প্রসঙ্গ হইতে প্রসঙ্গান্তরে যাওয়ার যে প্রবণতা এই উপন্যাসে দেখা যায় তাহাতে মূল সূত্র অনেক সময় হারাইয়া ফেলিতে হয় তাহাও সত্য। তবুও অস্বীকার করা চলে না, ভাষার ইন্দ্রজাল, বর্ণাঢ্য চিত্র-সমারোহ এবং বিচিত্র রসসৃষ্টির ফলে আলোচ্য উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ শিল্প-নৈপুণ্য প্রকাশ পাইয়াছে।'

ভাষাযাদুকর শরৎচন্দ্র তাঁর অপূর্ব সৃষ্টি 'শ্রীকান্ত' যেরূপ অননুকরণীয় ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন তা সত্যিই প্রশংসার বস্তু। এই প্রসঙ্গে বিখ্যাত সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার লিখেছেন :

'ওস্তাদ সুরশিল্পী প্রথমে যেমন যন্ত্রটি নির্বাচন করিয়া পরে তাহার তারগুলিকে আপনার প্রয়োজনে সুতন্ত্রিত করিয়া লয় শরৎচন্দ্রের শিল্পীমন তেমনই তাঁহার প্রাণের সুরটি বাজাইবার জন্য ভাষার তারগুলি তাহার উপযোগী করিতে পারিয়াছিলেন—এইখানে সাহিত্য-শিল্পীর প্রথম ও শেষ কৃতিত্ব।'

'শরৎসাহিত্য' গ্রন্থে কবিশেখর কালিদাস রায়, 'শ্রীকান্ত'কে একখানি চিত্রকাব্য বলে বর্ণনা করেছেন।

বিশ্ববিখ্যাত কথাশিল্পী এবং নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রোমাঁ রোলাঁ এই শ্রীকান্ত উপন্যাস পাঠ করার পর শরৎচন্দ্রকে পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক বলে অভিহিত করেছেন।

পত্র-পত্রিকায় রচনা প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের নাম দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। অনেকে তাঁর সঙ্গেঁ আলাপ করবার জন্যে ব্যস্ত হলেন। অনেকে তাঁকে সভা-সমিতিতে নিয়ে গিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। কিন্তু স্বভাবলাজুক মুখচোরা শরৎচন্দ্র সে সকল আয়োজন সুকৌশলে এড়িয়ে চলতেন।

১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে মাহাত্মা গান্ধী দক্ষিণ আফ্রিকার আন্দোলনের পর সবেমাত্র রেঙ্গুনে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

তখন রেঙ্গুনের ডাঃ পি. জে মেটার বাড়ীতে তাঁকে এক বিরাট সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র উক্ত সম্বর্দ্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

রেঙ্গুনে ভিক্টোরিয়া হলে মহাত্মা গান্ধীকে যে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয় তার সংবাদ লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র নিজে। পরে ওটি বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়।

ডাঃ মেটার বাড়ীতে মহাত্মাজীর প্রার্থনাসভা হয়েছিল। সেখানে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে একখানি ভজন গাইতে অনুরোধ করা হয়।

শরৎচন্দ্র মহাত্মাজীর সামনে ভজন গাইতে রাজী হলেন না।

রেঙ্গুনে অবস্থানের সময় শরৎচন্দ্র অনেকসময় অনেক দায়িত্ব পালন করেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সর্বানন্দ একবার এলেন রেঙ্গুন শহরে। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রেঙ্গুনে শ্রীরামকৃষ্ণের নামে একটি মঠ স্থাপন করবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রেঙ্গুনে একটি সঙ্গীত ও অভিনয়ের সাহায্যরজনীর আয়োজন করেন। তার প্রধান দায়িত্ব পালন করেন জনদরদী ও মানবপ্রেমিক কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে গিরীন্দ্রনাথ সরকার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'ব্রহ্মদেশে শরৎচন্দ্র'-তে লিখেছেন 'শরৎচন্দ্র আমার বিশেষ অনুরোধে তাহার দৃশ্যপট পরিকল্পনা, সাজসজ্জা নির্বাচন ও সঙ্গীত পরিচালনার ভার নিয়াছিলেন এবং প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ষ্টেজের ভিতর উপস্থিত ছিলেন। এই ধরণের উচ্চাঙ্গের নির্বাচিত অভিনয় রেঙ্গুন সহরে প্রথম হওয়ায় ইহা বিশেষ চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল এবং অর্থসাফল্যে এক রাত্রে চৌদ্দশত টাকার টিকিট বিক্রয় হইয়াছিল।

রেঙ্গুনের বোটাটং ল্যান্সডাউন ষ্ট্রীটে সপরিবারে বাস করতেন শরৎচন্দ্র। লেখাপড়া, সাহিত্যচর্চা, চাকরী ইত্যাদি নিয়ে তাঁর জীবনদিন বেশ নির্বিঘ্নে কাটতে লাগলো।

কিন্তু কোন মানুষের জীবনই একঘেঁয়ে হয়ে ওঠে না। মাঝে মাঝে আসে পরিবর্ত্তন। এমনি এক পরিবর্ত্তনের মুখে পড়লো কথাসাহিত্যিক এবং জীবনশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন। হঠাৎ তাঁর কানে এলো একটি সংবাদ। সংবাদটি এই যে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান হয়ে আমেরিকায় যাবার পথে রেঙ্গুনে আসবেন।

রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন। সুতরাং এ হেন বিশ্ববিখ্যাত মানুষটিকে দেখবার জন্যে বাঙালী থেকে শুরু করে রেঙ্গুন প্রবাসী অবাঙালী ভারতীয়গণ আনন্দে মেতে উঠলেন। তাঁরা অধীর আগ্রহ নিয়ে কবিগুরুর শুভাগমনের প্রতীক্ষায় দিন গুণতে লাগলেন।

স্থির হলো, রবীন্দ্রনাথ বর্মায় এসে ওখানকার বিখ্যাত বাঙালী ব্যারিস্টার পি. সি. সেনের বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

শ্রীসেন হলেন রবীন্দ্র-অভ্যর্থনা সমিতির মূল উদ্যোক্তা। তিনি গিরীন্দ্রনাথকে বললেন অভিনন্দন-পত্র লেখাবার আয়োজন করতে।

গিরীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে অনুরোধ জানালেন অভিনন্দন-পত্র লিখতে।

রাজী হয়ে গেলেন শরৎচন্দ্র। তিনি কবিগুরুর জন্যে যথাসময়ে অভিনন্দন-পত্র লিখে দিলেন।

সেই পত্র পড়ে খুশী হলেন শ্রীসেন।

ওদিকে নির্দিষ্ট সময়ে কবিগুরু এসে পৌছলেন রেঙ্গুনে। জাহাজঘাটায় তাঁকে দেখবার জন্যে সারা রেঙ্গুন শহরের মানুষ ভেঙ্গে পড়লো।

পরদিন স্থানীয় জুবিলী হলে কবিগুরুকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হলো। হলে এত ভীড় হলো যে তিল ধারণের জায়গা রইলো না।

ঐ ভীড় দেখে শরৎচন্দ্র যেতে রাজী হলেন না সম্বর্দ্ধনা-সভায় যেতে। তাঁকে উদ্বোধন-সঙ্গীত গাইবার ভার দেওয়া হয়েছিল। তিনি এলেন না দেখে ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের পুত্র ডাঃ পি দাস 'বন্দেমাতরম' সঙ্গীত গেয়ে সভার কাজ শুরু করলেন।

পরে কবি নবীন চন্দ্র সেনের পুত্র ব্যারিস্টার নির্মল চন্দ্র সেন শরৎচন্দ্রের লেখা অভিনন্দন-পত্রটি পাঠ করলেন,—

জগৎবরেণ্য—

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নাইট, ডি-লিট্

মহোদয় শ্রীচরণকমলেষু—

কবিবর,

এই সুদূর সমুদ্রপারে বঙ্গমাতার ক্রোড়বিচ্যুত সন্তান আমরা আজ হৃদয়ের গভীরতম শ্রদ্ধা ও আনন্দের অর্ঘ্য লইয়া, আমাদের স্বদেশের প্রিয়তম কবি, জগতের ভাব ও জ্ঞানরাজ্যের সম্রাট—আপনাকে অভিবাদন করিতেছি।

আপনি অপূর্ব কবি-প্রতিভাবলে নব নব সৌন্দর্য ও নব নব আনন্দ আহরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছেন, এবং নব সুর নব রাগিনীতে বঙ্গহৃদয়কে এক নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

আপনার কাব্য-কলার সৌন্দর্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য হৃদয়ের এক অভিনব পরিচয় অধুনা প্রতীচ্যের নিকট সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে এবং সেই পরিচয়ের আনন্দে প্রতীচ্য আজ প্রাচ্যের কবিশিরে সাহিত্যের যে সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে, তাহার আলোকে জননী বঙ্গবাণীর মুখশ্রী মধুর স্মিতোজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

আপনার কাব্যবীণায় সহস্র অনির্বচনীয় সুরে ভারতের চিরন্তন বাণী, সত্য শিব সুন্দরের অনাদি গাথা ধ্বনিত হইয়া এক বিশ্বব্যাপী আনন্দ, অপরিসীম আশা ও অসীম আশ্বাসে মানব হৃদয়কে আকুল ও উদ্বেল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিশাল সৃষ্টির অণু-পরমাণু যে এক আনন্দে নিত্য পরিস্পন্দিত হইতেছে এবং এক অপরিচ্ছন্ন প্রেমসূত্রে যে এই নিখিল জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, আপনার কাব্যে এই পরম সত্যের সন্ধান পাইয়াছি এবং আপনাকে—কোন দেশ বা যুগ-বিশেষের নয়—সমগ্র বিশ্বের কবি বলিয়া চিনিতে পারিয়াছি। আপনার কথায়, কাব্যে, নাট্যে ও সংগীতে যে মহান্ আদর্শ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে বুঝিয়াছি, এক লোকাতীত রাজ্যের আলোকে আপনার নয়ন উদ্ভাসিত, এ অমৃত সত্তার আনন্দ-রসে আপনার হৃদয় অভিষিক্ত।

আপনার অকৃত্রিম একনিষ্ঠ আজন্ম বাণী-সাধনা আজ যে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের স্বর্ণ-উপকূলে আপনাকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তথাকার আনন্দগীতি নিখিল মানবহৃদয়কে নব নব আশা ও আশ্বাসে পরিপূর্ণ করিয়া আপনার সুমোহন কাব্য-বীণায় নিত্যকাল ঝঙ্কৃত হইতে থাকুক, ইহাই বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রার্থনা।

রেঙ্গুন,
২৫শে বৈশাখ ১৩২৯ বঙ্গাব্দ

ভবদীয় গুণমুগ্ধ
রেঙ্গুন-প্রবাসী বঙ্গসন্তানগণ।

অভিনন্দন-পত্র পাঠ হয়ে গেলে কবিগুরু তার প্রত্যুত্তরে সুদীর্ঘ বক্তৃতা দেন। পরিশেষে বললেন, আমার কবিখ্যাতি সমগ্র বাংলাদেশে পরিব্যাপ্ত হওয়া সত্বেও যে পর্যন্ত না ইউরোপ আমার কাব্যপ্রতিভার প্রতি সম্মান না দেখালো সেই পর্যন্ত আমার দেশবাসী আমাকে উপযুক্ত সম্মান দেখানো যুক্তিযুক্ত মনে করে নি।

পরদিন শরৎচন্দ্র চুপি চুপি গিরীন্দ্রনাথের বাড়ীতে গেলেন। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ-আলোচনাও হলো।

গিরীন্দ্রনাথের বড় ইচ্ছে ছিল যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের একটি গ্রুপ্ ফটো তুলে রাখবেন। ফটোগ্রাফারও প্রস্তুত ছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রনাথকে দেখবার জন্যে গিরীন্দ্রনাথের বাড়ীতে বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এসেছিলেন। তাঁদের-ও ঐ গ্রুফ ফটোতে নেবার একান্ত ইচ্ছে ছিল গিরীন্দ্রনাথের। কিন্তু মুখচোরা শরৎচন্দ্রের কোন বিখ্যাত লোকের সঙ্গে ফটো না তোলার অনমনীয় মনোভাবের দরুন তাঁর সে আশা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে গেল। শরৎচন্দ্র নিতান্ত সংকোচবশে কবিগুরুর সঙ্গে দেখা না করেই গিরীন্দ্রনাথের বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন।

রেঙ্গুনে আর মন টিকলো না শরৎচন্দ্রের। বিশেষ করে তাঁর ডান পাটি বাতে পঙ্গু হয়ে পড়াতে তাঁর মনমেজাজ গেল বিগ্‌ড়ে। লেখায় মন দিতে পারলেন না। তাই রেঙ্গুন ত্যাগ করে কোলকাতায় গিয়ে চিকিৎসা করবেন এই ছিল তাঁর মনে একান্ত বাসনা।

এর ওপর তাঁর অফিসে নানারকম ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটের সৃষ্টি হলো। অফিস-কর্তার সঙ্গে একদিন সাধারণ ব্যাপার নিয়ে তুমুল বচসা শুরু হলো। তার থেকে লেগে গেল হাতাহাতি।

এর পরিণামস্বরূপ শরৎচন্দ্র চাকরীতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চাকরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে এলেন কোলকাতায়।

শরৎচন্দ্র তাঁর ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রকে আগে থেকে লিখেছিলেন বাড়ী ঠিক করে রাখতে।

প্রকাশচন্দ্র দিদি অনিলাদেবীর সঙ্গে দেখা করেন।

অনিলাদেবীর মেজ দেওয়ের এক মেয়ে রাণুবালার বিয়ে হয়েছিল হাওড়া শহরের বাজে শিবপুরে।

অনিলাদেবী প্রকাশচন্দ্রকে রাণুবালার কাছে যেতে বলেন।

রাণুবালার ভাসুরপো ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন শরৎচন্দ্রের জন্যে ৬নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাইলেনের তিনখানা ঘর ঠিক করে দেন।

শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন থেকে এই বাড়ীতেই এসে ওঠেন। এখানে তিনি ন'দশ মাস থাকেন।

তারপর পাশের ৪নং বাজে শিবপুর ফার্স্ট বাইলেনে উঠে যান।

বাজে শিবপুরে আসার পর শরৎচন্দ্র তাঁর নিকটতম আত্মীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে চেষ্টা করলেন। অনিলাদেবী তাঁর স্বামী পঞ্চানন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে এসে শরৎচন্দ্রকে দেখে যান। একদিন ছোট বোন সুশীলাও এলেন আসানসোল থেকে। তিনি বেশ কিছুদিন রইলেন শরৎচন্দ্রের কাছে।

ঐসময় শরৎচন্দ্র তাঁর ছোট ভাই প্রকাশচন্দ্রের বিয়ে দেন মুঙ্গেরের এক মেয়ের সঙ্গে।

মেজভাই প্রভাসচন্দ্র বা স্বামী বেদানন্দ এসে দাদার সঙ্গে দেখা করে গেলেন।

শরৎচন্দ্রের ওপর অনেক দায়দায়িত্ব এসে পড়লো। তাঁর বোন অনিলাদেবীর এক মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব এসে পড়লো তাঁর ঘাড়ে।

অথচ কি আশ্চর্য তখনো পর্যন্ত শরৎচন্দ্র ছিলেন আত্মীয়স্বজনের কাছে অবহেলিত এবং অপাংক্তেয়। কারণ তিনি রেঙ্গুনে ছিলেন এবং হিরণ্ময়ীকে বিয়ে করেছিলেন বিনা লৌকিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

বাজে শিবপুরে আসার পর থেকে শরৎচন্দ্র পাড়াপড়শীদের সঙ্গে পরিচিত হতে লাগলেন। তাঁর বাসার একখানা বাসার পরেই ছিল ভূতনাথ মিত্রের বৈঠকখানা। শরৎচন্দ্র সেই বৈঠকখানায় বসে পাড়াপড়শীদের সঙ্গে নানারকম গল্পগুজব করতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হলো সরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্গে। এঁরা সকলেই শরৎচন্দ্রের পাড়ার বিশিষ্ট লোক ছিলেন। সরোজরঞ্জন শরৎচন্দ্রের 'অরক্ষণীয়া' গল্পটির ভূমিকা লিখে দেন।

শরৎচন্দ্রের অন্যতম অমর উপন্যাস 'শেষপ্রশ্নের' অক্ষয় চরিত্রে এই অক্ষয়চন্দ্রের চারিত্রিক গুণের প্রভাব পড়েছে।

ক্রমে বিভিন্ন সাহিত্যিকদের সঙ্গে পরিচয়লাভ ঘটলো অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের। তাঁদের মধ্যে প্রধান প্রধান হলেন দিলীপ কুমার রায়, প্রথম চৌধুরী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

এছাড়া বিভিন্ন সাহিত্যপত্র এবং সাহিত্যিক গোষ্ঠীর সঙ্গেও কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বন্ধুত্ব ও যোগাযোগ গড়ে ওঠে। তিনি প্রায়ই 'ভারতবর্ষ' ও 'যমুনা' পত্রিকার কার্য্যালয়ে আসতেন। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে তিনি সুকিয়া ষ্ট্রীটের 'ভারতী' পত্রিকার অফিসেও যেতেন।

বাজে শিবপুরের ৬নং ফার্স্ট বাইলেনের যে বাসায় শরৎচন্দ্র এসে ওঠেন সেখানে স্থানাভাব হওয়াতে তিনি কিছুদিন পর বাসা বদলালেন। চলে এলেন ঐ রাস্তার ওপরেই ৪নং বাসায়।

আনুমানিক ১৯১৬ কিংবা ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় জোড়াসাঁকোর সাহিত্যবাসর 'বিচিত্রার' মাধ্যমে।

এই বিচিত্রার আসরেই শরৎচন্দ্রকে লক্ষ্য করে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বেশ একটু কৌতুক করেন। বিচিত্রার আসর বসতো মেঝেয় বিছানো ফরাসের ওপর। সাহিত্যিকরা বাইরে জুতো খুলে ফরাসের ওপর বসতেন। কিছুদিন ধরে তাঁদের মধ্যে অনেকের জুতো চুরি যেতে থাকে। তাই শুনে শরৎচন্দ্র নিজের জুতোজোড়াটি কাগজে মুড়ে বগলদাবায় করে বিচিত্রার আসরে প্রবেশ করলেন।

তাঁর ঐ কাণ্ডটি লক্ষ্য করেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি কবিগুরুকে ঐ ব্যাপারটি জানালে তিনি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হে শরৎ, তোমার হাতে ওটা কি? পাদুকাপুরাণ নাকি?

১৩২৩ সালের চৈত্র এবং ১৩২৪ সালের বৈশাখ আষাঢ় সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' নামে বিখ্যাত উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। ওটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন তারিখে। (বাং ১৩২৪ সালের আষাঢ় মাসে)।

সম্ভবত ১৯০০-১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ভাগলপুরে থাকতে শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাসটি লেখেন। ওতে তাঁর দেবানন্দপুরের বাল্য ও ভাগলপুরের উচ্ছৃঙ্খল যুবজীবনের কাহিনী নায়ক দেবদাসের মধ্যে দিয়ে রূপায়িত করেছেন।

যৌবনে শরৎচন্দ্র প্রচুর মদ্যপান করতেন। তারই প্রকাশ ঘটেছে তাঁর সৃষ্টি সাহিত্য 'দেবদাসের' চরিত্রে। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন, 'বইখানি আমার মাতাল অবস্থায় লিখেছিলুম।'

'দেবদাস' উপন্যাস প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিজের খুব একটা ভাল ধারণা ছিল না। এই গ্রন্থখানি প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রিয়বন্ধু ও সাহিত্যসঙ্গী প্রমথনাথকে একাধিকবার চিঠি লিখে জানান নিজের মনের কথা। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে এক পত্রে জানালেন, 'দেবদাস ভাল নয় প্রমথ, ভাল নয়'।

আর একবার লেখেন, 'দেবদাস নিয়ো না, নেবার চেষ্টা করো না। ওটার জন্যে আমি লজ্জিত।'

শরৎচন্দ্র ওসব মন্তব্য করলে কি হবে দেশের মানুষরা তাঁর ঐ গ্রন্থখানিকে সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে মাথায় তুলে নেন। প্রখ্যাত সাহিত্যসমালোচক ডঃ সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন, 'শরৎচন্দ্রের প্রথম বয়সের রচনার মধ্যে এই উপন্যাস-খানি সর্বশ্রেষ্ঠ।'

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ দেবদাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, 'শরৎচন্দ্রের লেখনীর সংযম অসাধারণ। 'দেবদাসে' নিষিদ্ধ প্রেম, মদ্যাশক্তি, পতিতাসংসর্গ সব আছে, কিন্তু লেখকের সংযমের বাঁধ কোথাও একটু টলে নাই, কোথাও বিন্দুমাত্র ইন্দ্রিয়-স্পর্শ নাই, কোথাও অশ্লীলতা সামান্য পরিমাণেও প্রশ্রয় পায় নাই। নিশীথ রাত্রে নিভৃতকক্ষে প্রণয়মত্ত দুইটি তরুণ-তরুণী পরস্পরের নিবিড় সান্নিধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাইয়াছে, নায়িকার উদ্বেলিত অশ্রুধারায় নায়কের পদযুগল প্লাবিত হইয়াছে, তথাপি উভয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ব্যবধানটি রহিয়া গিয়াছে, ইহা বিস্ময়কর মনে হয়। বেশ্যাগৃহে দেবদাস পাত্রের পর পাত্র উজার করিয়া দিতেছে, চন্দ্রমুখী তাহার অতি সন্নিকটে বসিয়া সেবা করিতেছে। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। শরৎচন্দ্র নিষিদ্ধ প্রেমের জগতে বিচরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই প্রেম দেহকামনার তীরে আসিয়া স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।'

এ যেন সাধক কবি চণ্ডীদাস বর্ণিত রজকিনী প্রেমের মত সত্য, শাশ্বত ও সুন্দর। এতে কোনরকম কামনার গন্ধ নেই। আছে কেবল অন্তরের পবিত্র ও নির্মল অনুরাগ।

অবশ্য একালের সর্বাধুনিক অনেক বুদ্ধিজীবিদের কাছে 'দেবদাস' উপন্যাসটি অপাংক্তেয় হয়ে উঠেছে। তাঁদের মতে এটি হচ্ছে সামান্য ও নগণ্য কাহিনী। তাহলেও উক্ত গ্রন্থখানিতে শরৎপ্রতিভার অসাধারণ মুন্সীয়ানার পরিচয় মেলে।

শরৎচন্দ্রের লেখা 'নিষ্কৃতি' গল্পটি 'ঘর-ভাঙা' নামে ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যা 'যমুনায়' আংশিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে ওর বাকি অংশটি প্রকাশিত হয় ১৩২৩ সালের ভাদ্র, কার্তিক ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে।'

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই এটি গ্রন্থাকারে জনসাধারণের মাঝে প্রকাশিত হয়।

'নিষ্কৃতি' গল্পটির সঙ্গে শরৎচন্দ্রের লেখা 'রামের সুমতি,' 'বিন্দুর ছেলে' এবং 'মেজদিদি' গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর শরৎচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'চরিত্রহীন' প্রকাশিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাসের ৪০০।৫০০ পাতা

লেখেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ঘরে আগুন লাগার জন্যে সেসব আগুনে পুড়ে যায়।

১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় ওটি লিখতে শুরু করেন। তিনি একবারে উপন্যাসটি লেখা শেষ করেন নি। বিভিন্ন সময়ে ওটা লিখেছেন এবং সংস্করণে কিছু রদবদলও করেছেন। ১৩৪৪ সালে 'চরিত্রহীন' উপন্যাসটির পঞ্চম সংস্করণ যখন প্রকাশিত হয় তখন লেখক ভূমিকায় লেখেন, '…চরিত্রহীনে'র গোড়ার অর্ধেকটা লিখেছিলাম অল্প বয়সে। তারপরে ওটা ছিল পড়ে। শেষ করার কথা মনেও ছিল না, প্রয়োজনও হয় নি। প্রয়োজন হল বহুকাল পরে। শেষ করতে গিয়ে দেখতে পেলাম বাল্যরচনার অতিশয্য ঢুকেছে ওর নানা স্থানে, নানা আকারে। অথচ, সংস্কারের সময় ছিল না—ঐ ভাবেই ওটা রয়ে গেল। বর্তমান সংস্করণে গল্পের পরিবর্তন না ক'রে সেইগুলিই যথাসাধ্য সংশোধন করে দিলাম।'

কোন্ পত্রিকায় চরিত্রহীন উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় সেকথা আগেই লিখেছি।

এই উপন্যাসের নামকরণ প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন: 'শরৎচন্দ্র এ উপন্যাসের নাম 'চরিত্রহীন' দিলেন কেন, সে-প্রশ্ন বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এ-উপন্যাসে কোন চরিত্রহীন চরিত্র আছে কি? উপেন্দ্র নিষ্কলঙ্ক দেবোপম চরিত্র, তাহার কথা তো উঠিতেই পারে না। দিবাকর চরিত্রবান অথবা চরিত্রহীন কোন কিছু হইবার যোগ্যতা রাখে না। বাকি থাকিল কেবল সতীশ। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে হয়তো সতীশকে চরিত্রহীন বলা চলে। সে মেসের তথাকথিত পতিতা ঝি-এর প্রতি আসক্ত। মদ খাওয়ার অভ্যাসও তাহার রহিয়াছে। বিপিনের সঙ্গে পতিতালয়েও সে গিয়াছে। সুতরাং সাধারণ লোকে তাহাকে চরিত্রহীন বলিবে। কিন্তু প্রকৃতই কি তাহাকে চরিত্রহীন বলা যায়? মেসের ঝিকে সে ভালোবাসিয়াছে বটে, কিন্তু সেই ভালোবাসায় শুধু কেবল যাতনা ও হতাশাই ভোগ করিয়াছে, তাহাতে কলুষের বিন্দুমাত্র স্পর্শ নাই। পতিতালয়েও সে গিয়াছে ইচ্ছার বিরুদ্ধে এবং মদ খাইয়াও কখনও অশোভন ও অসঙ্গত আচরণ করে নাই। কিন্তু এই তথাকথিত চরিত্রহীন লোকটি যে অন্যদিক দিয়া কতখানি চরিত্রবান লেখক তাহা দেখাইয়াছেন। সে উদার, পরোপকারী, স্নেহশীল ও ক্ষমাবান। শরৎচন্দ্র চরিত্রবান উপেন্দ্র ও চরিত্রহীন সতীশকে পাশাপাশি রাখিয়া দেখাইয়াছেন যে, সংসারে চরিত্রবান লোকেরাও ভুল করে, অন্যায় করে, আবার চরিত্রহীন লোকেরাও অনেক মহৎ কাজ করিতে পারে।'

শরৎচন্দ্রের লেখা 'স্বামী' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। উক্ত গল্পটি শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে লেখেন এবং দেশবন্ধু-সম্পাদিত 'নারায়ণ' পত্রিকায় ১৩২৪ সালের শ্রাবণ-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। ঐ গল্পটি ফরমায়েসী বলে ওতে শরৎপ্রতিভার সম্যক বিকাশ লাভ করে নি।

শরৎচন্দ্রের 'একাদশী বৈরাগী' গল্পটি ১৩২৪ সালের কার্তিক সংখ্যা 'ভারত-বর্ষে' প্রথম প্রকাশিত হয়। পরে ওটি 'স্বামী' গল্পটির সঙ্গে একত্রে প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসটি ১৩২৪ সালের পৌষ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-ভাদ্র সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হয়।

উক্ত উপন্যাসের ঘটনাবিন্যাসে শরৎচন্দ্রের নিপুণ মুন্সীয়ানার পরিচয় মেলে।

শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' (২য় পর্ব) ১৩২৪ সালের আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-চৈত্র ও ১৩২৫ সালের বৈশাখ-আষাঢ় ও ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে।

শ্রীকান্তের ২য় পর্ব প্রসঙ্গে সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, ,......শ্রীকান্তে'র দ্বিতীব পর্বে রসসৃষ্টি অপেক্ষা তত্ত্ব প্রচারের দিকেই শরৎচন্দ্রের যেন অধিকতর প্রবণতা দেখা যায়। যেসব চরিত্র তিনি চিত্রিত করিষাছেন তাহাদের মধ্য দিয়া বিশেষ বিশেষ সামাজিক মত প্রচারের উদ্দেশ্যেই যেন পরিস্ফুট হইয়াছে'।...

বাজে শিবপুরে থাকবার সময় দিনের পর দিন শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বেড়ে যেতে লাগলো। বহু বন্ধুবান্ধব আসতে লাগলেন তাঁর বাসায়। বাসায় বসে শরৎচন্দ্র সাহিত্যিক বন্ধুদের সঙ্গে নানাপ্রকার গল্পগুজব করতেন। তিনি জন-সভায় গিয়ে বক্তৃতা দেওয়া বেশী পছন্দ করতেন না। তার চেয়ে ঘরে বসে বৈঠকী গল্পে অধিকতর আনন্দ ও তৃপ্তি পেতেন।

শরৎচন্দ্রের সেই সময়কার থাকার জায়গা ও আসবাবপত্র কিরূপ ছিল সেই প্রসঙ্গে শৈলেশ বিশী লিখেছেন :

'বাজে শিবপুরের একতলা একখানি ছোট কোটা বাড়ি। হয়তো ওপরে আর দু'খানি ঘর ছিল, তবে তার বাইরে থেকে একতলাই দেখায়। ছোট একটু আঙিনা, তাতে একটা পেয়ারা গাছ, উঠানে গোটা দুই ফুলের গাছ—টগর, শেফালী জাতীয়। বাড়িতে কোন শ্রী নেই, কোন শৃঙ্খলা নেই—। উঠানে

ঢুকেই দেখতে পাওয়া যায়, বারান্দায় দাদার সাবেক-কালের লম্বা হাতা ইজি-চেয়ার। তার একপাশে একটি টিপয়। অন্যপাশে ছোট টুলের উপর তাঁর লম্বা নল গড়গড়া, তার পাশে একটি পেতলের পিকদানী। ইজিচেয়ারের সামনে বাঁপাশে চেয়ার বা বেঞ্চি ছিল কিনা তা আমার মনে নেই, ঘরে ঢুকতেই দোর গোড়ায় দড়ির ময়লা একটা পাপোছ।

ঘরে ঢুকেই দেখতে পাওয়া যায় ঢালা ফরাস, চাদর সব সময় পরিষ্কার থাকতো না। গোটা দুই তাকিয়া। পাশে একটা খোলা বুক শেলফ। তাতে তকতকে ঝকঝকে বাঁধান বই সাজান তিন থাক। তাতে সাহিত্য ছাড়া আর সবই ছিল, কঠিন গণিতের বই, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র। তবে ভুতুড়ে বা পরলোকতত্ত্ব দেখিনি। আর ছিল কাঠের পাল্লা মার্বেল টপ নয়, একটি বন্ধ চেস্ট অব ড্রয়ার্স, তার মাথার উপর না ছিল এমন জিনিস নেই। ঘরে গোটা চারেক কুলুঙ্গি ছিল। তার একটাতে ছিল—কৃষ্ণনগরের মাটির পুতুলের নমুনা হিসাবে গৌর-নিতাইয়ের যুগল মূর্তি। তার নীচে যা থাকতো তা না বলাই ভালো। একটি কাচের পাত্রে বোধ হয় আফিং ভেজান থাকতো। লেখবার সময় মাঝে মাঝে দাদা তা দিয়ে গলা ভেজাতেন।

'ফরাসের উপর ছিল হাত দেড়েক লম্বা অনুপাতে চওড়া বর্ডারে দামী মেহগনী কাঠ এমবস করা একখানি ঠাকুর বাড়ি মার্কা হাত টেবিল। তার উপর ছিল দাদার লেখবার প্যাড। মরক্কো দিয়ে বাঁধান। হাত টেবিলের উপর ব্লটিং প্যাড সেটারও চারপাশে মরক্কো দিয়ে বাঁধান। দাদার লিখবার জিনিষগুলি এতই দামী ছিল। সেই হাত টেবিলের উপর একটি সুদৃশ্য কাঠের পাত্রে থাকতো ডজন খানেক, নানা আকারের ও নানা ছাঁদের ফাউন্টেন পেন, পার্কার হতে ওয়াটারম্যান সব রকম এবং যখন যে ভাল ফাউন্টেন পেন বেরুতো তা। প্যাডের পাশে দুটো এন্টিএয়্যারক্র্যাফট গানের মত মাথা উঁচু করে থাকতো ফাউনটেনপেন হোলডার। এই গেল দাদার পটভূমি।'

মানুষদের প্রতি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের যে রকম গভীর দরদ ছিল তেমনি ছিল পশুপাখীদের প্রতি। তাঁর বাড়ীতে ভেলু বা ভেলি নামে একটি কুকুর ছিল। সে জাতে নেড়ী কুত্তা বৈ বিলিতী নয়। তবু সে শরৎচন্দ্রের বাড়ী চোর-ডাকাতদের হাত থেকে আগলে রাখতো। তার চেহারা ছিল যেমন তেমনি ছিল গলার স্বর।

শরৎচন্দ্রের অতি প্রিয় ছিল ভেলি। ঠিক যেন নিজের ছেলের মত। সেই ভেলি একদিন সকলকে কাঁদিয়ে চলে গেল পরলোকে।

ভেলির জন্যে শরৎচন্দ্র এত অধীর হয়ে কান্নাকাটি করেছিলেন যে তেমনটি তাঁর আত্মীয়বিয়োগেও বোধহয় করেন নি।

শরৎচন্দ্র নিজের বাগানে এক কোমর পর্যন্ত মাটি খুঁড়ে ভেলিকে কবর দেন। পরে স্ত্রী হীরন্ময়ীদেবীর কথামত তিনি স্থির করলেন, শ্বেতপাথরের পাদপীঠের ওপর একটা মার্বেলের তুলসীমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করবেন।

কেবল ভেলি কেন অন্য কুকুরদের প্রতিও শরৎচন্দ্রের ছিল সমান স্নেহ। কাশীতে থাকার সময় তিনি অনেকগুলি কুকুর একত্র করে লুচি ও বোঁদে খাওয়ান।

ঠিক ভেলির মত শরৎচন্দ্রের একটি প্রিয় টিয়াপাখী ছিল। তার নাম বেটু। শোনা যায় বেটু একবার নাকি একটা চোর ধরেছিল। তাকে খুব ভাল ভাল ফল খাওয়ানো হতো।

একবার গাছে পেয়ারা হলে শৈলেশ বিশী তা গাছ থেকে পেড়ে খান। তাই দেখে বিরক্তি প্রকাশ করলেন বেটুদরদী শরৎচন্দ্র। তিনি বললেন, একি, তুমি আগেই পেয়ারা খেয়ে ফেললে! আমার যে কড়া নিয়ম আছে, বেটু না খাওয়া পর্যন্ত কেউ একটি পেয়ারাও স্পর্শ করবে না।

কেবল পশুপাখীদের যত্ন করে বা খাইয়ে তৃপ্তি পেতেন না শরৎচন্দ্র। তিনি ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরকেও খাওয়াতে ভালবাসতেন। তাঁর বাড়ীতে কোন ছোট ছেলে বা মেয়ে গেলে তিনি খাওয়াতেন পেট ভরে।

কেবল সাহিত্যসাধনায় তন্ময় থাকতেন না শরৎচন্দ্র। পরাধীন ভারতের দুঃখদুর্দশা দেখে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হতেন। ইংরেজ শাসক কর্তৃক জালিয়ান-ওয়ালা বাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাইটহুড ত্যাগ করেন। সেই সংবাদ শুনে খুশী হন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। ঐ সময় তিনি অমল হোমকে একখানি পত্র লিখে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেন: 'অমল ভারতীর আড্ডায় সেদিন শুনলাম তোমারও নাকি খুব ফাঁড়া গিয়াছে। ইংরেজের মার-মূর্তি খুব কাছে থেকেই দেখে নিলে ভাল করে। এ-একটা কম লাভ নয়। আমাদের মোহ কাটাবার কাজে এরও প্রয়োজন ছিল। দরকার মনে করলেই ওরা যে কত নিষ্ঠুর কতটা পশু হতে পারে তা ইতিহাসের পাতাতেই জানা ছিল এতদিন—এবার প্রত্যক্ষ জ্ঞান হল।

আর এক লাভ দেশের বেদনার মধ্যে আমরা যেন নতুন করে পেলাম রবিবাবুকে। এবার একা তিনিই আমাদের মুখ রেখেছেন।

নারায়ণের সময় সি. আর. দাশ একদিন আমাকে বলেছিলেন যে, রবিবাবু যখন নাইটহুড নেন, তখন নাকি দাশ সাহেব কেঁদে ছিলেন। এখন একবার তাঁর দেখা পেলে জিজ্ঞাসা করতাম, আজ আমাদের বুক দশ হাত কিনা বলুন।'

বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের স্বত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এক বছর ধরে হাঁটাহাঁটি করে শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে অনুমতি পেলেন না তাঁর পুস্তকগুলি গ্রন্থাবলী আকারে প্রকাশ করবার জন্যে। কারণ ওরূপ করলে শরৎচন্দ্রের মূল ও আদি প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায় বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু নিজের অর্থ কষ্টের কথা ভেবে শেষ পর্যন্ত সতীশচন্দ্রের প্রস্তাবে রাজী হয়ে তাঁর কতকগুলি উপন্যাস একত্র করে গ্রন্থাবলী আকারে চীপ এডিশন ছাপার অনুমতি দেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে 'ছবি' প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লেখেন সুরেশ সমাজপতির সম্পাদিত পুজাবার্ষিকী—'আগমনী'র জন্যে। উক্ত পুজাসংখ্যাটি প্রকাশ করেন বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের সত্বাধিকারী সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ব্রহ্মদেশীয় সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি পড়েছে শরৎচন্দ্রের লেখা 'ছবি' গল্পে।

শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ' উপন্যাসটি ১৩২৩ সালের মাঘ-চৈত্র, ১৩২৪ সালের বৈশাখ-আশ্বিন, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩২৫ সালের পৌষ-চৈত্র এবং ১৩২৬ সালের আষাঢ়-অগ্রহায়ণ ও পৌষ-মাঘ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয়।

উক্ত উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ তারিখে।

এই উপন্যাসটি লেখকের কাছে যেমন সর্বশ্রেষ্ঠ বোধ হয়েছে তেমনি হয়েছে সমালোচকের কাছে।

শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একবার এই 'গৃহদাহ' উপন্যাস প্রসঙ্গে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে বললেন, আমার মনে হয় গৃহদাহ বইখানি তোমার সর্বশ্রেষ্ঠ বই। ওটার মধ্যে তোমার চিন্তাশীলতার একটি গভীর পরিচয় আছে।

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন, বোধহয় তোমার কথা অনেকটা সত্যি। আমারও বিশ্বাস ওটাই আমার বেষ্ট বই। ওটা লিখতে আমার সবচেয়ে বড় শক্তি ব্যয় হয়েছিল বলে আমার বিশ্বাস।'

'গৃহদাহ'-প্রসঙ্গে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, 'মোটের উপর গৃহদাহ শরৎচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির মধ্যে অন্যতম।'

ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত লিখেছেন, 'গৃহদাহ' শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। ইহাতে নারীহৃদয়ের গভীরতম রহস্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ দেওয়া হইয়াছে। গঠন-কৌশলের দিক দিয়াও এই উপন্যাস অদ্বিতীয়।'

ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, '...'চরিত্রহীন' ও 'শ্রীকান্তে' যে সামান্য দোষক্রটি রহিয়াছে 'গৃহদাহে' তাহাও নাই। ইহাকে একখানি নিখুঁত সর্বাঙ্গ-সুন্দর উপন্যাস বলিলে অতিরঞ্জিত উক্তি হয় না। 'গৃহদাহ' উপন্যাসের একটি ঘটনা এবং একটি চরিত্রও অপ্রয়োজনীয় অপরিস্ফুট ও অতিশয়িত নহে। প্রধান চরিত্রগুলির কথা ছাড়িয়া দিলেও রাক্ষুসী, রামবাবু, সুরেশের পিসিমা প্রভৃতি ছোট ছোট চরিত্রও সুবিকশিত।'

শরৎচন্দ্রের 'বামুনের মেয়ে' ১৩২৭ সালের আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়।

সেকালে এদেশীয় সমাজে কৌলীন্য প্রথার অশুভ দিক ঠিকভাবে প্রকাশ করার জন্যে শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাসখানি লেখেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে সারা ভারতে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। বাংলার সর্বত্র তার প্রকাশ ঘটলো বিভিন্ন কংগ্রেসকর্মী ও কমিটির মারফৎ।

শরৎচন্দ্র অসহযোগ অন্দোলনকে সমর্থন জানিয়ে কংগ্রেসে যোগ দেন। পরে তিনি তদানীন্তন জনপ্রিয় নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুরোধে হাওড়া জেলার কংগ্রেস সংগঠন ও অসহযোগ আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। আরও পরে তিনি হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন ও বঙ্গীয় প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যপদেও নির্বাচিত হন।

প্রদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে তাঁর একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। তাঁর মতামত অনেক নেতাই বিনা দ্বিধায় গ্রহণ করতেন। তিনি শিবপুর থেকে প্রায়ই কোলকাতায় আসতেন এবং কংগ্রেসকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন সভায় যোগ দিতেন।

কংগ্রেসের সকল নীতির প্রতিই তাঁর পূর্ণ সমর্থন ছিল না। সুতো কেটে দেশের স্বাধীনতা লাভ করাটা তিনি আদৌ বিশ্বাস করতেন না।

তিনি কংগ্রেসের নিয়মানুবর্তিতা রক্ষা করার জন্যে কেবলমাত্র খদ্দর পরতেন। বিলাতী দ্রব্য বা বিলাতী খেতাব বর্জনে তাঁর প্রচুর উৎসাহ ছিল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন নাইটহুড ত্যাগ করেন তখন তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন।

আবার আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় স্যার টাইটেলটা ত্যাগ না করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গ তুলে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'চাঁদেও কলঙ্ক রয়ে গেল। ওঁর উচিত ছিল টাইটেলটা ত্যাগ করা। ওঁর মত অত বড় পেট্রিয়ট যে টাইটেলটা ছাড়লেন না ওর ব্যথা আমার মন থেকে কিছুতেই যায় না।'

ইংরেজ সরকারের দেওয়া উপাধি যেমন তিনি পছন্দ করতেন না তেমনি দেশের প্রিয়জনদের দেওয়া দেশীয় উপাধির প্রতি ছিল তাঁর পূর্ণ শ্রদ্ধা। গান্ধীজীর 'মহাত্মা', বালগঙ্গাধর তিলকের 'লোকমান্য' এবং চিত্তরঞ্জন দাশের 'দেশবন্ধু' উপাধি তাঁকে মুগ্ধ করেছিল।

চিত্তরঞ্জন দাশ প্রসঙ্গে তাঁকে বলতে শোনা গেছলো, 'না, আমার মুখে তাঁর আর কোন নামই আসে না।' ঐত ওঁর সত্য পরিচয়। কে জানে কে সর্বপ্রথম ঐ একটি নামের মধ্যেই ওঁর ভেতরকার যথার্থ রূপ আমাদের চিনিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। দেশবন্ধু সত্যই দেশবন্ধু।'...

ক্রমে শরৎচন্দ্র হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ঐ সময় তিনি জেলার বিভিন্ন জায়গায় কংগ্রেস কমিটি গঠন, তাঁতচরখা স্থাপন, বিলাতী পণ্য বর্জন প্রভৃতি কাজে উৎসাহ দিতে থাকেন। তিনি জনসভাতে বক্তৃতা দিতে ভালবাসতেন না তবে কেউ সভায় জোরালো বক্তৃতা দিলে তিনি আন্তরিকভাবে তা সমর্থন করতেন।

অসহযোগ আন্দোলনের অন্যতম কর্ম ছিল স্কুলকলেজ বর্জন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের আহ্বানে ছাত্ররা দলে দলে স্কুল-কলেজ বয়কট বা বর্জন করতে লাগলো।

দেশবন্ধুর এই কাজের বিরোধিতা করলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কিন্তু শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর আদর্শে অবিচল রইলেন। এই প্রসঙ্গ নিয়ে কবিগুরুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের বেশ কিছুটা বাদ-প্রতিবাদ হয়। রবীন্দ্রনাথের প্রতি শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধার সীমা ছিল না। তাবলে এই ব্যাপারে তিনি গুরুদেবতুল্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পেছপা হলেন না।

শরৎচন্দ্র সর্বতোভাবে দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে জড়িত হয়ে পড়লেন। ঐ সময় তিনি অনেক অভ্যেস ও সখ বর্জন করেন। দাবাখেলা, মাছধরা, মজলিসী আড্ডা ইত্যাদি বর্জন করলেন। প্রিয় কুকুর 'ভেলি' এবং পোষাপাখী 'বেটু'র প্রতিও বেশী আকর্ষণ রইলো না।

ছেলেদের মত ঘরের মেয়েরাও এগিয়ে এলেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করতে। তাঁরা দেশবন্ধুর কাছে প্রার্থনা জানালেন, আপনি আমাদের আপনার স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার অনুমতি দিন।

দেশবন্ধু শুনলেন তাঁদের কথা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের ওপর ভার দিলেন মেয়েদের নিয়ে একটি স্বাধীনতা-সংগ্রামী দল গঠন করতে।

দেশবন্ধুর কথামত শরৎচন্দ্র একটি পরিকল্পনা তৈরী করেন।

শরৎচন্দ্রের পরিকল্পনামত দেশবন্ধু ভবানীপুরে নারীকর্মমন্দির স্থাপন করেন। তাতে যোগ দেন উর্মিলা দেবী, নেলী সেনগুপ্তা প্রভৃতি বিশিষ্ট মহিলা। সংখ্যায় অল্প হলেও তাঁরা শুরু থেকেই আন্দোলনে নিষ্ঠাপূর্ণ কাজের পরিচয় দেন। বিলেতী কাপড়ের দোকানের সামনে তাঁরা পিকেটিং করেন।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে প্রিন্স অফ ওয়েলস্ এলেন কোলকাতায়। তাঁর আগমন উপলক্ষে কংগ্রেস কমিটি কোলকাতা মহানগরীতে পূর্ণ হরতালের ডাক দেন। হরতাল সাফল্যজনকভাবে পালিত হলো। বৃটিশ সরকার চালালেন কঠোর দমননীতি। কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতা কারারুদ্ধ হলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। শরৎচন্দ্র জেলে গেলেন না বটে কিন্তু জেলের বাইরে থেকে দেশের কাজ করে যেতে লাগলেন।

তারপর এলো ডিসেম্বরের শেষ দিক। ঐ সময় আহমদাবাদে বসলো কংগ্রেসের অধিবেশন। নির্বাচিত সভাপতি দেশবন্ধু জেলে ছিলেন বলে উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন হাকিম আজমল খাঁ।

ঐ অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং মহাত্মা গান্ধীকে ঐ আন্দোলন চালিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়।

স্থির হলো, গুজরাট থেকে আন্দোলন শুরু হবে। উক্ত অঞ্চলের অন্তর্গত বারদৌলী তালুকের সরকারী খাজনা বন্ধ করে আন্দোলন চালাতে হবে।

সারা ভারতবর্ষ ঐ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লো। কিন্তু হঠাৎ এক ঘটনায় আন্দোলনের গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। ঘটনাটি অতি সামান্য। গোরক্ষপুর জেলায় চৌরীচোরা গ্রামে উত্তেজিত জনতার হাতে থানার সিপাইরা নিহত হয়। মহাত্মা গান্ধী ঐ খবর শুনে মর্মাহত হন এবং ঐ আন্দোলন পরিত্যাগ করেন।

মহাত্মার ঐ ধরনের কাজ তখন দেশের অনেকেই সমর্থন করলেন না। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তিনি ক্ষুব্ধ হয়ে মন্তব্য করলেন 'গোটাকতক কনস্টেবল Infuriated mob-এর হাতে পুড়ে মরেছে তাতে কি

হয়েছে? এতেই গোটা ভারতবর্ষের আন্দোলন বন্ধ করতে হবে? এত বড় বিরাট দেশের মুক্তির সংগ্রামে রক্তপাত হবে না? হবেই ত! রক্তের গঙ্গা বয়ে যাবে চারদিকে—সেই শোণিত প্রবাহের মধ্যেই ত ফুটবে স্বাধীনতার রক্তকমল। এতে ক্ষোভ কিসের, দুঃখ কিসের? কিসের অনুতাপ এতে?... non-violence খুব noble idea কিন্তু Achievement of freedom is nobler—hundred times nobler.'

এর দ্বারা বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্র অহিংসার চেয়ে সহিংসক পন্থায় স্বাধীনতা-লাভে বিশ্বাসী ছিলেন।

কারাগার থেকে মুক্তিলাভ করলে কোলকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে দেশবন্ধুকে সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। উক্ত সম্বর্দ্ধনা সভায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সেই অভিনন্দন-পত্রটি লিখে দেন।

গয়া কংগ্রেসের সভাপতি নিযুক্ত হন দেশবন্ধু। গয়া কংগ্রেসে তিনি কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব তোলেন। কিন্তু অধিকাংশ প্রতিনিধিই তাঁর প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন

কংগ্রেস অধিবেশনের পর তিনি দেশময় প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হন। তা সত্ত্বেও তিনি নিজের ব্রতে অটল ছিলেন। বাংলার অনেক কংগ্রেসপ্রার্থী এবং সংবাদপত্র তাঁর বিরুদ্ধে যান। কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর পাশে থেকে তাঁকে নানাভাবে উৎসাহ, প্রেরণা এবং সাহস যোগান।

হাওড়াবাসীদের নিষ্ক্রিয়তা, জড়তা ও স্বার্থমগ্নতার জন্যে অতিষ্ঠ হয়ে শরৎচন্দ্র ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে হাওড়া-জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ ত্যাগ করেন। বিদায়ী ভাষণে তিনি বলেন, 'হাবড়া (হাওড়াকে অনেকে হাবড়া বলে, বিশেষ করে হিন্দিতে) জেলার পক্ষ থেকে আজ যদি আমি মুক্তকণ্ঠে বলি অন্তত এ-জেলার লোক স্বরাজ চায় না, তার তীব্র প্রতিবাদ হবে। কাগজে কাগজে আমাকে অনেক কটূক্তি, অনেক গালাগালি শুনতে হবে। কিন্তু তবুও একথা সত্য। কেউ কিছু করব না। কোন ক্ষতি, কোন অসুবিধা, কোন সাহায্য কিছুই দেব না—আমার বাঁধা-ধরা সুনিয়ন্ত্রিত জীবন যাত্রার একতিল বাহিরে যেতে পারব না, আমার টাকার উপর টাকা, বাড়ীর উপর বাড়ী, গাড়ীর উপর গাড়ী, আমার দোতালার উপর দোতালা এবং তার উপর চৌতলা অবারিত এবং অব্যাহত থাক—কেবল এই গোটাকতক বুদ্ধিভ্রষ্ট লক্ষ্মীছাড়া লোক না খেয়ে না দেয়ে, খালি গায়ে খালি পায়ে ঘুরে ঘুরে যদি স্বরাজ এনে দিতে

পারে ত দিক, তখন না হয় তাকে ধীরে সুস্থে চোথ বুজে পরম আরামে রস-গোল্লার মত চিবানো যাবে। কিন্তু এমন কাণ্ড কোথাও কখনো হয় না। আসল কথা, এরা বিশ্বাস করতেই পারে না, স্বরাজ নাকি আবার কখনও হতে পারে। তার জন্য আবার নাকি চেষ্টা করা যেতে পারে। কি হবে তাতে, কি হবে চরকায়, কি হবে দেশাত্মবোধের চর্চায়? নিবানো দীপশিখার মত মনুষ্যত্ব ধুয়ে মুছে গেছে, একবার হাত পেতে ভিক্ষের চেষ্টা ছাড়া কি হবে কিছুতে?'

শরৎচন্দ্র পদত্যাগ করলে কি হবে দেশবন্ধুর অনুরোধে তিনি ঐ পদে পুনরায় আসীন হলেন। তারপর দীর্ঘ দশ বছর তিনি ঐ পদে আসীন ছিলেন।

১৩২৩ সাল। বরিশাল শহরে বসলো বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন।

দেশবন্ধু ও শরৎচন্দ্র উভয়ে গেলেন উক্ত অধিবেশনে যোগদান করতে।

সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী।

সভাপতির এক বিধান প্রসঙ্গে দেশবন্ধু কিছু বলতে উঠলে তিনি মুখ ফিরিয়ে বললেন 'I won't hear that man.

শরৎচন্দ্র ঐ কথার প্রতিবাদ করলে সভাপতি বলে উঠলেন, 'I can't stand your face.'

শরৎচন্দ্র এই অপমান সহ্য করতে না পেরে বাসায় ফিরে এলেন। বাসায় ফিরে উত্তেজিত কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'যে রাজনীতি করতে ভদ্রলোককে এমন অপমানিত হতে হয়, তাতে আর আমি নেই।'

তখন দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রের হাত ধরে সস্নেহে বলতে লাগলেন, 'তাই করুন, শরৎবাবু, এবারে আপনি ছেড়ে দিন। আপনি সাহিত্যিক, শিল্পী মানুষ, আপনার অনুভূতি বড় ডেলিকেট। এত ব্যথা আর অপমান আপনার সহ্য হবে না। এবার কোলকাতায় ফিরে গিয়ে আপনি কংগ্রেস আর পলিটিক্স একেবারে ছেড়ে দিন।'

শরৎচন্দ্র তখন বেদনা ও সহানুভূতির সঙ্গে বলতে লাগলেন, 'আপনার এই অসহায় অবস্থা, চারদিকে এই বাধা বিদ্রূপের বেড়াজাল, এর মধ্যে আপনাকে বিসর্জন দিয়ে, পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করি কি করে?—নাঃ আপনাকে ফেলে পালাতে পারব না।'

এভাবে শরৎচন্দ্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের পাশে বহুদিন ছিলেন। দেশবন্ধু

বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মাঝে মাঝে হতাশা ও ক্লান্তিতে ভেঙ্গে পড়লে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁকে উৎসাহ দিতেন।

শরৎচন্দ্র মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, বিপ্লব ছাড়া ভারতের স্বাধীনতা আসবে না।

একদল বিপ্লবী কংগ্রেসের অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন। শরৎচন্দ্র তাঁদের সঙ্গেও যোগাযোগ রেখে চলতেন। আবার তিনি বিপ্লবীদের ভালবাসতেন। স্বনামধন্য দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বাড়ীতে বিপ্লবীদের আড্ডা বসতো। শরৎচন্দ্র সেই সময় বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের জীবন-সংগ্রাম বিষয় নানা তথ্য ও তত্ত্ব জেনে নিতেন।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ছিলেন শরৎচন্দ্রের সম্পর্কিত মাতুল। বিপিন-বিহারীর সহকর্মীদের নানাভাবে সাহায্য করতেন শরৎচন্দ্র।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শরৎচন্দ্র যেসব রচনা লিখেছেন সেইগুলির মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চেতনা ও গণচেতনার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর রাজনৈতিক চেতনার সার্থক রূপায়ন ঘটেছে 'পথের দাবী' উপন্যাসে। কৃষক সমাজের অধিকার তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর 'দেনাপাওনা' উপন্যাসে এবং 'মহেশ' নামক গল্পে।

শরৎচন্দ্রের 'দেনা-পাওনা' উপন্যাসখানি ১৩২৭ সালের আষাঢ়-আশ্বিন, পৌষ ও চৈত্র, ১৩২৮ সালের জ্যৈষ্ঠ, শ্রাবণ, কার্তিক ও চৈত্র, ১৩২৯ সালের বৈশাখ-শ্রাবণ, আশ্বিন-কার্তিক ও মাঘ-চৈত্র ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ় ও শ্রাবণ সংখ্যা ভারতবর্ষে প্রথম প্রকাশিত হয়। ওটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৩০ সালের ভাদ্র মাসে।

শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত থাকবার সময় ঐ উপন্যাসখানি লেখেন।

শরৎচন্দ্রের চিত্ত সকল সময়ের জন্যেই যে সাহিত্যরচনায় নিযুক্ত থাকতো এমন কথা বলা উচিত হবে না। সাহিত্যসাধনা ছাড়াও তাঁর চিত্তে অন্য আর এক প্রধান চিন্তা ছিল। তা হচ্ছে রাজনৈতিক। এর প্রমাণ আমরা পেয়েছি তাঁর এক ভাষণে। উক্ত ভাষণটি তিনি দেন ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে বরিশালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদশাখা কর্তৃক তাঁকে সম্বর্ধনা জানানোর উত্তরে। তিনি বলেন, 'আমি বক্তা নই। কিছু বলতে আমি আদপেই পারি নে। ঘরে বসে

কাগজ কলম নিয়ে লেখা এক ব্যাপার, আর বাইরে দাঁড়িয়ে বলা আর এক ব্যাপার। আপনারা আমার বই পড়ে সবাই প্রশংসা কচ্ছেন, অথচ কিছুদিন থেকে লেখা আমি একমত ছেড়ে দিয়েছি। সাহিত্যসেবাকেই সবচেয়ে বড় সার্থকতা বলে মনে করতে পারচি নে।...

এখানে রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে কারুর মনে ভয় জাগিয়ে তুলতে আমি চাইনে, কিন্তু দেখি কথা হয় যেন সব লুকিয়ে, ভয়ে ভয়ে। সিডিশন (sedition) বাঁচিয়ে এখানে মুক্তির কথা বলা হয়। তাই আমার মনে হয়, বড় সাহিত্যিক আমাদেয় দেশে এখন আর জন্মাবে না। রাজনীতিতে, ধর্মে, সামাজিক আচারব্যবহারে যেদিন আমাদের হাত-বাঁধা, পা-গুটানো আর থাকবে না, যেদিন আনন্দের ভিতর দিয়ে লিখতে পারা যাবে, সেইদিন আবার সাহিত্য-সৃষ্টির দিন ফিরে আসবে।'

বিপ্লবে বিশ্বাসী শরৎচন্দ্র বিপ্লবী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রতি আজীবন সহানুভূতিসম্পন্ন ও অনুরাগী ছিলেন। কবি যখন ইংরেজ শাসকের রাজরোষে অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে ছিলেন এবং ইংরেজঅপশাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে হুগলী জেলে অনশন শুরু করেন সেই সময় শরৎচন্দ্র অত্যন্ত বিচলিত হন এবং তাঁর অনশন ভাঙবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যান। এই ব্যাপারে তিনি ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে একখানি পত্রে নিজের মনের কথা জানান: 'হুগলী জেলে অমাদের কবি কাজী নজরুল উপোস করিয়া মর মর হইয়াছে। বেলা ১টার গাড়িতে যাইতেছি, দেখি যদি দেখা করিতে দেয় ও দিলে আমার অনুরোধে যদি সে আবার খাইতে রাজী হয়। না হইলে তার কোন আশা দেখি না। একজন সত্যকার কবি। রবি-বাবু ছাড়া আর বোধ হয় এমন কেহ আর এত বড় কবি নাই।'

১৩৩০ সালের ১৬ই আষাঢ় তারিখে শিবপুর ইনষ্টিটিউট এক সাহিত্যসভার আয়োজন করে। উক্ত সভায় শরৎচন্দ্র 'আধুনিক সাহিত্যের কৈফিয়ৎ' নামে এক ভাষণ দেন। তাতে তিনি বঙ্কিম সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক সাহিত্যের আদর্শগত পার্থক্য বিশ্লেষণ করেন।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে প্রচুর অবদানের কথা স্মরণ করে জগত্তারিনী সুবর্ণ পদক দেন।

শরৎচন্দ্রের কাছে স্বধর্মদ্রোহিতা ও বিজাতীয় আচার-ব্যবহার যেমন ছিল বিসদৃশ তেমনি নিজের ধর্মের অকারণ স্বেচ্ছাচারিতা বা আচার-নিষ্ঠার সংকীর্ণতা

ও ভণ্ডামি তাঁর কাছে চক্ষুশূল ছিল। তিনি ভালবাসতেন শান্ত ও সংযতভাবে ধর্মপালনের আদর্শ। ধর্ম ও সামাজিক আচার-ব্যবহার প্রসঙ্গে তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস 'নববিধান'-এ।

১৩৩১ সালের ১০ই আশ্বিন তারিখে শরৎচন্দ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। উক্ত অধিবেশনে তিনি 'সাহিত্য ও নীতি' প্রসঙ্গে অপূর্ব এক ভাষণ দেন।

১৩৩১ সালের চৈত্র মাসে মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের সাহিত্য শাখায় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে তিনি আধুনিক সাহিত্যের দাবী জোরালো ভাষায় প্রকাশ করেন।

মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ইতিহাসশাখার সভাপতি ছিলেন ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আলাপ হয়। শরৎচন্দ্র তাঁর আমন্ত্রণে তাঁর বাড়ীতেও যান। তবে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতেই থাকতেন।

ঢাকা হতে ফিরে আসার অল্প কয়েকদিন বাদেই তাঁর প্রিয় কুকুর ভেলি মারা যায়। তার মৃত্যুতে শরৎচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হন এবং একাধিক লোকের কাছে তাঁর দুঃখের কথা পত্রমারফৎ জানান।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণ নদের ধারে সামতা গ্রামে নিজের বাড়ী তৈরী করান। এর পরিকল্পনা অবশ্য তাঁর মনে অনেক কাল আগে থাকতেই দানা বেঁধে উঠেছিল। তাঁর দেবানন্দপুরের পৈতৃক বাড়ীর উদ্ধারের কোন রাস্তা ছিল না বলেই গোবিন্দপুরের সংলগ্ন সামতা গ্রামে নিজের বাড়ী প্রস্তুত করান। তাছাড়া আর একটা কারণেও তিনি ওখানে বাড়ী তৈরী করান। সেটি হচ্ছে তাঁর দিদির বাড়ী। তাঁর দিদি অনিলাদেবীর বাড়ী ছিল গোবিন্দপুর গ্রামে। শরৎচন্দ্রের বাড়ীটি একপ্রান্তে অর্থাৎ বেড়ে অবস্থিত বলে জায়গাটির নাম দেন সামতাবেড়। বাড়ী, পুকুর ইত্যাদি তৈরী করতে শরৎচন্দ্রের মোট ব্যয় হয় সতেরো হাজার টাকা।

শরৎচন্দ্রের 'হরিলক্ষ্মী' প্রকাশিত হয় ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে। হরিলক্ষ্মীর মধ্যে 'হরিলক্ষ্মী' 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' এই তিনটি গল্প রয়েছে।

১৩৩২ সালের 'শারদীয়া বসুমতী'তে প্রকাশিত হয় 'হরিলক্ষ্মী' গল্পটি আর 'মহেশ' ও 'অভাগীর স্বর্গ' গল্প দু'টি প্রকাশিত হয় ১৩২৯ সালের 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার আশ্বিন ও মাঘ সংখ্যায়।

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সামতাবেড়েতে স্থায়ী-ভাবে বসবাস করতে শুরু করেন। প্রধানতঃ স্বাস্থ্যের কারণেই তিনি পল্লীভবনে যেতে চেয়েছিলেন। তারপর তিনি চেয়েছিলেন একটু নিরিবিলি নির্জন জায়গায় শান্তির মধ্যে জীবনের শেষ কটাদিন অতিবাহিত করতে। ঐ সময় তাঁর মনে একপ্রকার বৈরাগ্যপূর্ণ ভাবের উদয় হয়েছিল। তা আমরা জানতে পারি কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর লেখা এক পত্রে। পত্রটি তিনি লেখেন ১৩৩৩ সালের ৮ই বৈশাখ তারিখে। তাতে তিনি লেখেন, 'কিছুই আর করি না, রূপনারায়ণের তীরে ঘর বাঁধিয়াছি,—একটা ইজিচেয়ারে দিনরাত পড়িয়া থাকি।...সহরেই থাকি বা পাড়াগাঁয়ে বাস করি আমি সংসারের জোয়ার-ভাঁটার উভয়েরই বাহিরে গিয়াছি।

'দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে—মনে আছে হয়ত আপনার ৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠিতে ধার্য করা আছে, আর বড় তার বিলম্ব নাই; বছর দেড়েক—জগদীশ্বর করুণ তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।'

১৩৩৩ সালের ভাদ্র মাসে শরৎচন্দ্রের যুগান্তকারী উপন্যাস 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। তার আগে অর্থাৎ ১৩৩০ সালের বৈশাখ, আষাঢ়-ভাদ্র, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন, ১৩৩১ সালের জ্যৈষ্ঠ, আশ্বিন-কার্তিক, পৌষ-মাঘ, ১৩৩২ সালের বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, ভাদ্র, কার্তিক-ফাল্গুন ও ১৩৩৩ সালের বৈশাখ সংখ্যা বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকাটি প্রকাশ করতেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এবং তাঁর পুত্রগণ। এই প্রসঙ্গে শরৎ-মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎ-পরিচয়'-এ লিখেছেন, 'তাঁর (আশুতোষের) কাগজ না হ'লে বাংলাদেশ কোন দিন পথের দাবীর আলো পেত না। সে কথা শরৎচন্দ্র অনেকবার বোলেছেন।'

পত্রিকায় 'পথের দাবী' উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হলো। এবার শরৎচন্দ্র ওটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করার জন্যে চেষ্টা করতে লাগলেন। এই ব্যাপারে তিনি দু'জন প্রকাশক—এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর কর্ণধারদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষকালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার কর্ণধারদ্বয় রমাপ্রসাদ ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় 'পথের দাবী' পুস্তকাকারে প্রকাশ করেন।

'পথের দাবী' প্রকাশ হবার সঙ্গে সঙ্গেই কিরূপ জনসমাদর লাভ করে তা জানা

যায় শরৎচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার শচীনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, '...শুনেছি নাকি গ্রন্থখানি পাঁচ হাজার কপি মুদ্রিত হয়েছিলো। বিক্রী শেষ হতে সাত দিন লেগেছিল কিনা সন্দেহ। কোন কোন দোকানদার তিন টাকা মূল্যের গ্রন্থখানি দশ টাকা মূল্যেও বিক্রী করেছেন, পাঠক-পাঠিকারা তাই দিয়ে নিয়ে গেছেন।'

'পথের দাবী' জনপ্রিয়তা লাভ করলে কি হবে ইংরেজ সরকার উক্ত গ্রন্থ বাজেয়াপ্ত করেন। তার জন্যে মর্মান্তিক কষ্ট পান শরৎচন্দ্র। তিনি কবিগুরু এবং তখনকার দিনে যশস্বী ও স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক এবং লেখক রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জানাবার জন্যে অনুরোধ করেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উক্ত গ্রন্থটি পাঠ করে যে মন্তব্য করেন তাতে আদৌ শরৎচন্দ্রের মনঃপূত হয় নি। এই ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রকে যে পত্র লেখেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ নিম্নে দেওয়া হলো :

কল্যাণীয়েষু,

তোমার পথের দাবী পড়া শেষ করেছি। বইখানি উত্তেজক অর্থাৎ ইংরেজের শাসনের বিরুদ্ধে পাঠকের মনকে অপ্রসন্ন করে তোলে। ...আমি নানা দেশ ঘুরে এলাম—আমার যে অভিজ্ঞতা হয়েছে তাতে এই দেখলেম—একমাত্র ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট ছাড়া স্বদেশ বা বিদেশী প্রজার বাক্যে বা ব্যবহারে বিরুদ্ধতা আর কোন গভর্ণমেণ্টই এতটা ধৈর্যের সঙ্গে সহ্য করে না। নিজের জোরে নয় পরন্তু সেই পরের সহিষ্ণুতার জোরেই যদি আমরা বিদেশী রাজত্ব সম্বন্ধে যথেচ্ছ আচরণের সাহস দেখাতে চাই তবে সেটা পৌরুষের বিড়ম্বনা মাত্র—তাতে ইংরেজ রাজের প্রতিই শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হয়, নিজের প্রতি নয়।...শক্তিমানের দিক দিয়ে দেখলে তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা। অন্য কোন প্রাচ্য বা প্রতীচ্য বিদেশী রাজ্যের দ্বারা এটি হত না। আমরা রাজা হ'লে যে হতই না, সে আমাদের জমিদারের ও ভারতীয় রাজন্যের বহুবিধ ব্যবহারে প্রত্যহই দেখতে পাই। কিন্তু তাই বলে কি কলম বন্ধ করতে হবে ? আমি তা বলিনে—শাস্তিকে স্বীকার করেই কলম চলবে। যে কোনো দেশেই রাজশক্তিতে প্রজাশক্তিতে সত্যকার বিরোধ ঘটেছে, সেখানে এমনিই ঘটেছে। রাজ-বিরুদ্ধতা আরামে নিরাপদে থাকতে পারে না। এই কথাটা নিঃসন্দেহে জেনেই ঘটেছে।

তুমি যদি কাগজে রাজ-বিরুদ্ধ কথা লিখতে, তাহলে তার প্রভাব স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী হ'ত—কিন্তু তোমার মত লেখক গল্পচ্ছলে যে কথা লিখবে তার প্রভাব

নিয়ত চলতেই থাকবে—দেশে ও কালে তার ব্যাপ্তির বিরাম নেই—অপরিণত বয়সের বালক বালিকা থেকে আরম্ভ করে বৃদ্ধরা পর্যন্ত তার প্রভাবের অধীনে আসবে। এমন অবস্থায় ইংরেজরাজ যদি তোমার বই প্রচার বন্ধ করে না দিত, বোঝা যেত যে সাহিত্যে তোমার শক্তি ও দেশে তোমার প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে তার নিরতিশয় অবজ্ঞা বা অজ্ঞতা। শক্তিকে আঘাত করলে তার প্রতিঘাত সইবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই কারণেই সেই আঘাতের মূল্য—আঘাতের গুরুত্ব নিয়ে বিলাপ করলে সেই আঘাতের মূল্য একেবারেই মাটি করে দেওয়া হয়।

ইতি—২৭শে মাঘ, ১৩৩৩

তোমাদের

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্রনাথের পত্রটি পাঠ করে রীতিমত ক্ষুব্ধ হন শরৎচন্দ্র। এই ব্যাপারে শরৎচন্দ্র রাধারাণীদেবীকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর তারিখে একখানি পত্রে নিজের মতামত জানান। তিনি লেখেন, 'ভাবতে পারো বিনা অপরাধে কেউ কাউকে এত বড় কটূক্তি করতে পাবে? এ চিঠি তিনি ছাপাবার জন্যেই দিয়েছিলেন কিন্তু আমি ছাপাতে পারিনে এই জন্যে যে কবির এত বড় সার্টিফিকেট তখুনি স্টেটসম্যান প্রভৃতি ইংরাজি কাগজওয়ালারা পৃথিবীময় তার করে দেবে। এবং এই যে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের বিনা বিচারে জেলে বন্ধ করে রেখেছে এবং এই নিয়ে যত আন্দোলন হচ্ছে সমস্ত নিষ্ফল হ'য়ে যাবে।'

এই প্রসঙ্গে 'পথের দাবী' গ্রন্থের প্রকাশক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শরৎচন্দ্র একখানি পত্র লেখেন। তাতে তিনি লেখেন, 'শ্রীযুক্ত রবিবাবুর চিঠি পেলাম। তাঁর অভিমত মোটের উপর এই যে, বইখানি পড়লে ইংরাজ গভর্ণমেন্টের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। এবং তাঁর অভিজ্ঞতা এই যে, স্বদেশে বিদেশে যত রাজশক্তি আছে, ইংরাজের মত ক্ষমতাশীল আর কেউ নয়। মাত্র বইখানি চাপা দিয়ে আমাকে কিছু না বলা আমাকে ক্ষমা করা। অর্থাৎ এটুকু বোঝা গেল এ বই পড়ে তিনি অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন।'

কবিগুরুর এই রকম পত্রাঘাত অনেকদিন পর্যন্ত মনে রেখেছিলেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তিনি উত্তেজিত মুহূর্তে কবিগুরুর পত্রের জবাবে একখানি পত্রও লেখেন। পত্রটি নিম্নরূপ:

সামতাবেড়, পাণিত্রাস পোষ্ট
জেলা—হাবড়া

শ্রীচরণেষু,

আপনার পত্র পেলাম। বেশ, তাই হোক। বইখানা আমার নিজের বলে একটুখানি দুঃখ হবারই কথা। কিন্তু সে কিছু নয়। আপনি যা কর্তব্য এবং উচিত বিবেচনা করেছেন, তার বিরুদ্ধে আমার আভিমানও নেই, অভিযোগও নেই। কিন্তু আপনার চিঠির মধ্যে অন্যান্য কথা যা আছে, সে সম্বন্ধে আমার দু একটা প্রশ্ন আছে, বক্তব্যও আছে। কৈফিয়তের মত যদি শোনায় সে শুধু আপনাকেই দিতে পারি।

আপনি লিখেছেন, ইংরাজ রাজের প্রতি পাঠকের মন অপ্রসন্ন হ'য়ে ওঠে। ওঠবারই কথা। কিন্তু এ যদি আমি অসত্য প্রচারের মধ্যে দিয়ে করবার চেষ্টা করতাম, লেখক হিসেবে তাতে আমার লজ্জা ও অপরাধ দুইই ছিল। কিন্তু জ্ঞানতঃ তা আমি করিনি। করলে পলিটিশিয়ানদের প্রোপাগাণ্ডা হত, কিন্তু বই হত না। নানা কারণে বাঙলা ভাষায় এ-ধরণের বই কেউ লেখে না। আমি যখন লিখি এবং ছাপাই তার সমস্ত ফলাফল জেনেই করেছিলাম। সামান্য সামান্য অজুহাতে ভারতের সর্বত্রই যখন বিনা বিচারে, অবিচারে অথবা বিচারের ভান করে কয়েদ, নির্বাসন প্রভৃতি লেগেই আছে, তখন আমি যে অব্যাহতি পাবো, অর্থাৎ রাজপুরুষেরা আমাকেই ক্ষমা করে চলবেন, এ-দুরাশা আমার ছিল না। আজও নেই। তাঁদের হাতে সময়ের টানাটানি নেই, সুতরাং দুদিন আগে পাছের জন্য কিছুই যায় আসে না। এ আমি জানি এবং জানার হেতুও আছে। কিন্তু এ যাক। এ আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু বাঙ্গলাদেশের গ্রন্থকার হিসেবে গ্রন্থের মধ্যে যদি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে থাকি এবং তৎসত্ত্বেও যদি রাজরোষে শাস্তিভোগ করতে হয় ত করতেই হবে—তা মুখ বুজেই করি বা অশ্রুপাত করেই করি। কিন্তু প্রতিবাদ করা কি প্রয়োজন নয়? প্রতিবাদেরও দণ্ড আছে এবং মনে করি তারও পুনরায় প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক। নইলে গায়ের জোরকেই প্রকারান্তরে ন্যায্য বলে স্বীকার করা হয়। এই জন্যেই প্রতিবাদ চেয়েছিলাম। শাস্তির কথাও ভাবিনি এবং প্রতিবাদের জোরেই যে এ বই আবার ছাপা হবে, এ-সম্ভাবনার কল্পনাও করিনি।

চুরি ডাকাতির অপরাধে যদি জেল হয়, তার জন্যে হাইকোর্টে আপিল করা চলে, কিন্তু আবেদন যদি অগ্রাহ্যই হয়, তখন দু'বছর না হয়ে তিন বছর হল

কেন, এ নিয়ে বিলাপ করা সাজে না। রাজবন্দীরা জেলের মধ্যে দুধ, ছানা, মাখন পায় না বলে, কিংবা মুসলমান কয়েদীরা মহরমের তাজিয়ার পয়সা পাচ্ছে আমরা দুর্গোৎসবের পয়সা পাই না কেন, এই বলে চিঠি লিখে কাগজে কাগজে রোদন করায় আমি লজ্জা বোধ করি। কিন্তু মোটা ভাতের বদলে যদি জেল অথরিটিরা ঘাসের ব্যবস্থা করে তখন হয়ত লাঠির চোটে তা চিবোতে পারি। কিন্তু ঘাসের ড্যালা কণ্ঠরোধ না করা পর্যন্ত অন্যায় বলে প্রতিবাদ করাও আমি কর্তব্য বলে মনে করি।

কিন্তু বইখানা আমার একার লেখা, সুতরাং দায়িত্বও একার। যা-উচিত বলে মনে করি তা বলতে পেরেছি কিনা এইটেই আসল কথা। নইলে ইংরাজ সরকারের ক্ষমাশীলতার প্রতি আমার কোন নির্ভরতা ছিল না। আমার সমস্ত সাহিত্যসেবাটাই এই ধরণের। যা উচিত মনে করেছি, তাই লিখে গেছি।

আপনি লিখেছেন, আমাদের দেশের রাজারা এবং প্রাচ্য ও প্রতিচ্যের অন্যান্য রাজশক্তির কারও ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের মত সহিষ্ণুতা নেই। একথা অস্বীকার করবার অভিজ্ঞতা আমার নেই। কিন্তু এ-আমার প্রশ্নই নয়। আমার প্রশ্ন ইংরেজ রাজশক্তির এ-বই বাজেয়াপ্ত করবার জাষ্টিফিকেশন যদি থাকে, পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষে প্রোটেষ্ট করার জাষ্টিফিকেশনও তেমনি আছে।

আমার প্রতি আপনি এই অবিচার করেছেন যে, আমি যেন শাস্তি এড়াবার ভয়েই প্রতিবাদের ঝড় তুলতে চেয়েছি এবং সেই ফাঁকে নিজে গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করেছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দেশের লোকে যদি প্রতিবাদ না করে আমাকে করতেই হবে। কিন্তু সে হৈ চৈ করে নয়, আর একখানা বই লিখে।

আপনি বহুদিন যাবৎ দেশের কাজে লিপ্ত আছেন, দেশের বাহিরের অভিজ্ঞতা আপনার অত্যন্ত বেশি, আপনি যদি শুধু আমাকে এইটুকু আদেশ দিতেন যে, এ-বই প্রচারে দেশের সত্যকার মঙ্গল নেই সেই আমার সান্ত্বনা হত। মানুষের ভুল হয়, আমারও ভুল হয়েছে মনে করতাম।

আমি কোনরূপ বিরুদ্ধভাব নিয়ে এ-চিঠি আপনাকে লিখিনি, যা মনে এসেছে তাই অকপটে আপনাকে জানালাম। মনের মধ্যে যদি কোন ময়লা আমার থাকতো, আমি চুপ করেই যেতাম। আমি সত্যকার রাস্তাই খুঁজে বেড়াচ্ছি, তাই সমস্ত ছেড়ে ছুড়ে নির্বাসনে বসে আছি। অর্থে, সামর্থ্যে, সময়ে কত যে

গেছে সে কাউকে জানাবার নয়। দিনও ফুরিয়ে এলো, এখন সত্যিকার কিছু একটা করবার ভারি ইচ্ছে হয়।

উত্তেজনা অথবা অজ্ঞতা বশত এ-পত্রের ভাষা যদি কোথাও রূঢ় হয়ে থাকে, আমাকে মার্জনা করবেন। আপনার অনেক ভক্তের মাঝে আমিও একজন, সুতরাং, কথায় বা আচরণে আপনাকে লেশমাত্র ব্যথা দেবার কথা আমি ভাবতেও পারিনে।

ইতি ২রা ফাল্গুন, ১৩৩৩

সেবক—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

এ-চিঠি কথাশিল্পী লিখেছেন বটে কিন্তু নানা কারণে তা কবিগুরুর কাছে পৌঁছতে পারে নি। উক্ত পত্রে শরৎমনের রাজনৈতিক চিন্তার কথা আমরা জানতে পারি।

শরৎচন্দ্রের পরলোক গমনের পর 'পথের দাবী' রাজরোষ-মুক্ত হয় এবং ১৩৪৬ সালের বৈশাখ মাসে দ্বিতীয় সংস্করণের ছাপ নিয়ে জনসাধারণের মাঝে পুনরায় প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' একটি সার্থক ও বলিষ্ঠ উপন্যাস। এতে তিনি রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক মুক্তির ইঙ্গিত দিয়েছেন। এই উপন্যাসে বৈচিত্রময় এবং বিপ্লবপূর্ণ শরৎপ্রতিভার অন্যতম সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। এর নায়ক সব্যসাচীর চরিত্র অপূর্ব। বোধ করি শরৎসাহিত্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেননা তাঁর অনন্য স্বদেশপ্রেম, অসামান্য সাহস, অতুলনীয় শক্তি, বহুবিস্তৃত বৈপ্লবিক অভিজ্ঞতা, অসাধারণ জ্ঞান, অতুল্য মনীষা, এবং বজ্রকঠোর ব্যক্তিত্ব তাঁকে এক অতিমানবিক ও অলৌকিক স্তরে উঠিয়ে দিয়েছে। তাঁর সমগ্র সত্তা বিভিন্ন প্রকার কাঠিন্যের উপাদানে গঠিত হলেও অন্তরে তিনি ছিলেন কোমলপ্রাণ, স্নেহরসসিক্ত এক আদর্শ দরদী মানুষ। দেশের বিশেষ করে পরাধীন দেশের সত্যিকারের নেতার এই তো যথার্থ পরিচয় এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। দূরদর্শী এবং বিপ্লবী শরৎচন্দ্র রাজনৈতিক চিন্তাধারার আলোকে রাজনীতিক ক্ষেত্রে এই গূঢ় সত্যটি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন বলেই সব্যসাচীর মত চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। এবং এর সঙ্গে তাঁর ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা সূক্ষ্ম মন এই সত্যও জেনেছিল যে আগামী দিনে ভারতবর্ষে এরকম যোগ্য নেতার প্রয়োজন দেশের স্বাধীনতা ও তার সর্বাঙ্গীন উন্নতির প্রয়োজনে। এখানে এ কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে শরৎচন্দ্রের সেই ভবিষ্যতের আশা-

আকাঙ্ক্ষা অনেকাংশে সার্থক করে তুলেছিলেন তাঁরই দেশের মানুষ বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু যিনি নাকি শরৎবর্ণিত অপরূপ চরিত্রের অধিকারী সব্যসাচীর জীবন্ত বিগ্রহ বিশেষ।

এলো ১৩৩৩ সালের আষাঢ় মাস। ঐ সময়ে সুরমা উপত্যকা ছাত্র সম্মিলনের তৃতীয় বার্ষিক অধিবেশনে শরৎচন্দ্র সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন। সেখানকার শিলচর ছাত্রসংঘ তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়ে এক মানপত্র দেয়।

১৩৩৩ সালের ১০ই কার্তিক শরৎচন্দ্রের মধ্যম ভ্রাতা প্রভাসচন্দ্র বা স্বামী বেদানন্দের মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন বৃন্দাবনধামে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ। সন্ন্যাসী হলেও তিনি মাঝে মাঝে দাদার বাসায় এসে থাকতেন। শেষজীবনে দাদা শরৎচন্দ্রের বাসায় তাঁর প্রাণবিয়োগ ঘটে।

ভাইয়ের মৃত্যুতে অত্যন্ত শোকগ্রস্ত হন শরৎচন্দ্র। তাঁর সেই শোকের কথা জানিয়ে একবার হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে লেখেন, 'এই আকস্মিক ছোট ভাইয়ের শোক আমাকে যেন প্রতিনিয়ত দগ্ধ করিতেছে। ব্যথা যে এতবড় থাকে এ আমি জানিতাম না।'

শরৎচন্দ্র রূপনারায়ণের তীরে ভাইয়ের মৃতদেহ সৎকার করেন এবং সেখানে একটি সমাধিবেদী তৈরী করে দেন। প্রতি সন্ধ্যায় তিনি নিজের হাতে প্রদীপ জেলে সমাধির জায়গায় রেখে আসতেন।

প্রতিবছর প্রভাসচন্দ্রের মৃত্যুদিবসে তিনি সমাধির জায়গায় কীর্তন গানের আয়োজন করতেন। ঐ দিনে বহু লোককে তিনি নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন।

হাওড়ার শিবপুর সাহিত্য সংসদ ১৩৩৪ সালের ৩১শে ভাদ্র শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানায়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন সাহিত্যিক বিজয়চন্দ্র মজুমদার। উক্ত সভায় শরৎচন্দ্রকে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে বাংলার একাধিক লেখক-লেখিকাদের লেখা রচনাপূর্ণ পুস্তক উপহার দেওয়া হয়।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল তারিখে শ্রীকান্তের তৃতীয় পর্ব প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার আগে এটি ১৩২৭ সালের পৌষ-ফাল্গুন ও ১৩২৮ সালের বৈশাখ, আষাঢ়, ভাদ্র-আশ্বিন ও পৌষ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' আংশিকভাবে মুক্তিলাভ করে।

আরও একটি বিষয়ে শরৎচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বাদ-প্রতিবাদ শুরু হয়। সেটি হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি প্রবন্ধ। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের নগ্নতা প্রসঙ্গে ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ মাসের 'বিচিত্রা'য় 'সাহিত্যধর্ম' নামে একটি প্রবন্ধ

লেখেন। তাতে তিনি সাহিত্যে নগ্নতা ও অশ্লীলতা প্রসঙ্গে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেন। তিনি লিখলেন, 'সম্প্রতি আমাদের সাহিত্যে বিদেশের আমদানি যে একটা বে-আব্রুতা এসেছে সেটাকেও এখানকার কেউ কেউ মনে করেছেন নিত্য-পদার্থ; ভুলে যান, যা নিত্য তা অতীতকে সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করে না। মানুষের রসবোধে যে আব্রু আছে সেইটেই নিত্য, যে আভিজাত্য আছে রসের ক্ষেত্রে সেইটেই নিত্য। এখনকার বিজ্ঞানমদমত্ত ডিমোক্রাসি তাল ঠুকে বলছে, ঐ আব্রুটাই দৌর্বল্য, নির্বিচার অলজ্জতাই আর্টের পৌরুষ।'

কবিগুরুর লেখা ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ জানিয়ে কথাসাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত 'সাহিত্যধর্মের সীমানা' নামে 'বিচিত্রা'র পুরবর্তী সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আধুনিক-সাহিত্য ও সাহিত্যে অশ্লীলতা প্রসঙ্গে যে আলাপ-আলোচনা হয় তা তিনি উক্ত পত্রিকার এক সংখ্যায় প্রকাশ করেন।

এই সকল পত্রপত্রিকা পাঠ করে অনেকেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন এবং এই ব্যাপারে তাঁর মতামত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে অনুরোধ জানালেন।

তাতে ১৩৩৪ সালের ১০ই ভাদ্র শরৎচন্দ্র জানালেন নিজের কথা উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে, 'নরেশবাবু পণ্ডিত মানুষ, বেশ গুছিয়ে অনেক কথারই জবাব দিয়েছেন। আমার আর ২।১টা কথা বলবার ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোন সম্পর্কেই আর থাকতে ইচ্ছে হয় না। এমন কি, ভয় হয়। আমাকে অযাচিত তিনি যত অপমান করেছেন পাছে তারই একটা উল্টো ছায়া আমার লেখার মধ্যে দেখা দেয়। নরেশবাবু যে সম্মান রক্ষা করে তাঁর প্রতিবাদ করেছেন পাছে আমি ততটা পেরে না উঠি।'

পরে আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যে প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সাহিত্যিক নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের বক্তব্য সমর্থন করে শরৎচন্দ্র ১৩৩৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গবাণীতে' 'সাহিত্যের রীতিনীতি' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।

তাঁর প্রবন্ধটি পাঠ করে অনেকের মধ্যে সন্দেহ জাগলো যে তিনি হয়তো কবিগুরুর প্রতি অযথা কটুক্তি করেছেন।

কিন্তু শরৎচন্দ্র তার প্রতিবাদে একাধিক জনের কাছে পত্র লেখেন। তাঁরা হলেন রাধারাণী দেবী এবং উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

উক্ত পত্রদ্বয়ে শরৎচন্দ্র ঐসব অপপ্রচার খণ্ডন করে বলেন যে যাঁকে তিনি গুরুর মত শ্রদ্ধা করেন তাঁর বিরুদ্ধাচরণ তিনি কিভাবে করতে পারেন তা তিনি ভাবতে পারছেন না। তিনি কেবলমাত্র বিশ্বকবির উক্ত প্রবন্ধের শেষের দিকটা সবিনয়ে প্রতিবাদ করেছেন মাত্র।

১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনে ঘটলো এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সুভাষচন্দ্র, বিপিন গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ প্রমুখ কংগ্রেসের বিপ্লবী নেতারা বৃটিশ সরকারের বিভিন্ন কারাগার থেকে মুক্তি পেলেন।

তাঁরা মুক্তি পেলেন বটে কিন্তু তাঁদের মনে সুখ-শান্তি আদৌ রইল না। কারণ তাঁরা না পারলেন তাঁদের আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে দেখা করতে, না পারলেন কংগ্রেসী সহকর্মীদের সঙ্গে আগের মত প্রাণখোলাভাবে মেলামেশা করতে।

শরৎচন্দ্র এই বিপ্লবী রাজবন্দীদের যোগ্য সম্মান দেবার জন্যে উৎসাহী হলেন। হাওড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির পক্ষ থেকে তাঁদের সম্বর্দ্ধনা জানাবার আয়োজনে মনপ্রাণ সঁপে দিলেন। তার জন্যে একটি অভ্যর্থনা-সমিতি গঠিত হলো। শরৎচন্দ্র উক্ত সমিতির সভাপতি হন।

সম্বর্দ্ধনাসভায় মুক্ত রাজবন্দীদের উদ্দেশ্য করে শরৎচন্দ্র বললেন, 'দেশের জন্যে এরা জীবন উৎসর্গ করেছে, যৌবন উৎসর্গ করেছে, সর্বস্ব উৎসর্গ করেছে, এরাই দেশের মুক্তির অগ্রদূত। গভর্ণমেণ্ট এদের ভয় করে, কারণ জানে এদের তপস্যার মধ্যেই রচিত হচ্ছে তাদের ধ্বংসের মন্ত্র। গভর্ণমেণ্ট সহস্র চেষ্টা করেও পারলে না ধ্বংস করতে এদের মনের অপরাজেয় বল আর অন্তরের অনির্বাণ স্বাধীনতার স্বপ্ন। চিরচঞ্চল চিরজীবী চিরতরুণ এরা। দেশের তরুণদের আমি বলি, তোমাদের এত বড় জীবন্ত আদর্শ আর কেউ নেই।'

শরৎচন্দ্রের এই ভাষণ দেশের তরুণদের মনে-প্রাণে এনে দিলো এক নবজাগরণের মন্ত্র। তারপর থেকে তারা বিপ্লবী রাজবন্দীদের যথার্থভাবে বুঝতে শুরু করলো।

শরৎচন্দ্র পৃথকভাবে কোন নাটক রচনা করেন নি। তবে তাঁর লেখা দু'টি মাত্র উপন্যাস 'দেনাপাওনা' ও 'পল্লীসমাজ'-এর নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাও 'দেনাপাওনা'র নাট্যরূপ তিনি নিজে দেন নি। দিয়েছেন একালের স্বনামধন্য সাহিত্যিক শিবরাম চক্রবর্তী। তিনি কেবল শেষবারের মত সংশোধিত ও মার্জিত করে দিয়েছেন এবং নাটকটি পুস্তকাকারে তাঁর নামেই প্রকাশিত হয়।

উক্ত উপন্যাসটির নাট্যরূপ দেবার পর শরৎচন্দ্র তার একটা কপি পাঠিয়ে দেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছে।

রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ষোড়শী নাটক প্রসঙ্গে ভাল মতামত দিলেন না। তিনি বললেন, ষোড়শীতে বাস্তব ঘটনা বিশেষ কিছু নেই। যা আছে তা নিছক ফরমাসের মনগড়া বস্তুমাত্র।

কবিগুরুর উক্ত মন্তব্য শুনে বিশেষভাবে ব্যথিত হন শরৎচন্দ্র। পরে তিনি তাঁর মন্তব্য লিখে জানান, 'অনেক কিছু দেখা এবং জানা সাহিত্যিকের পক্ষে নিছক ভালো কিনা এ বিষয়ে আমার সন্দেহ জন্মেছে। কারণ, অভিজ্ঞতায় কেবল শক্তি দেয় না, হরণও করে। এবং সাংসারিক সত্য সাহিত্যের সত্য নাও হতে পারে। বোধহয় এই বইখানাই তার একটা উদাহরণ। এটা লিখি একটা অত্যন্ত ঘনিষ্টভাবে জানা বাস্তব ঘটনাকে ভিত্তি করে। সেই জানাই হ'ল আমার বিপদ। লেখবার সময় পদে পদে জেরা করে সে আমার কল্পনার আনন্দ ও গতিকে কেবল বাধাই দেয় নি, বিকৃত করেছে। সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনা মেশাতে গেলেই বোধ হয় এমনি ঘটে। জগতে দৈবাৎ যা সত্যই ঘটেছে তার যথাযথ বিবৃতিতে ইতিহাস রচনা হ'তে পারে, কিন্তু সাহিত্য রচনা হয় না। অথচ সত্যের সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে হোলো আমার ষোড়শী। এই উপায়ে সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হোলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিস্ফল করে দিলো।'

শরৎচন্দ্রের চিঠির উত্তরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত ব্যাখ্যা করে লিখলেন, 'তোমার নাটকে যে Perspective-এর কথা বলেছি সে হচ্ছে নাটকের আখ্যানবস্তুগত। অর্থাৎ যে পল্লীগ্রামের মধ্যে যে পরিবেষ্টনের মধ্যে সমস্ত ঘটনা স্থাপিত তার ভাষায় চরিত্রে ব্যবহারে যথাযথ পরিমাণ সামঞ্জস্য রক্ষা হয়নি বলেই আমার বিশ্বাস। অর্থাৎ তুমি যা কিছু বলতে চেয়েছ তাকে যদি তার পরিবেষ্টনের সঙ্গে সঙ্গত করে বলতে তা হ'লে ভাষায় ঘটনায় অন্যরকম হত—মূল কথাটা বজায় থাকত কিন্তু এই রূপটা থাকত না। আর্টে বিষয়ের সঙ্গে রূপের মিল হ'লে তবেই সেটা সত্য হয়।'

এই ষোড়শী নাটক প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'রবীন্দ্রনাথ হয়তো ষোড়শীর ভৈরবীরূপটি যথাযথ বাস্তবধর্মী হয় নাই বলিয়াই অভিযোগ করিয়াছেন। ষোড়শীর অলকা ও বিদ্রোহিনী প্রজানেত্রী সত্তা তাহার ধর্মীয় ভৈরবী সত্তাকে কিছুটা হয়তো আচ্ছন্ন করিয়াছে, কিন্তু ষোড়শীর পরিবেশ ও

আচরণের মধ্যে তাহার বাস্তব রূপের সঙ্গে সামঞ্জস্য নাই ও-কথা বলা চলে না।
ষোড়শী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সুবিচার করেন নাই।'

যাই হোক বাংলার প্রসিদ্ধ নট শিশিরকুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে শরৎচন্দ্র ষোড়শী নাটকের শেষ দিকে কিছু রদবদল করে দেন। মূল আখ্যানের সঙ্গে নাটকের বিষয় বস্তুর অমিল ঘটে। মূল আখ্যানে অর্থাৎ দেনাপাওনায় জীবানন্দের মৃত্যুদৃশ্য দেখানো হয় নি অথচ 'ষোড়শী' নাটকে তা দেখানো হয়েছে।

১৩৩৪ সালের ২১শে শ্রাবণ শনিবার নাট্যমন্দিরে প্রথম অভিনীত হয় ষোড়শী। জীবানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন যশস্বী নট শিশিরকুমার ভাদুড়ী।

ঐ অভিনয় দেখার পর সমস্ত প্রেক্ষাগৃহের দর্শকগণ একবাক্যে অভিনেতা-অভিনেতৃদের প্রশংসা করেন। এমনকি শরৎচন্দ্র স্বয়ং অভিনয় দেখে খুসী হয়ে কেদার নাথ বন্দোপাধ্যায়কে লেখেন, '…শিশিরের অভিনয় দেখেছেন? কি চমৎকার করে। বইটা আমার উপন্যাস দেনাপাওনার গল্প থেকে নেওয়া।'…

এই প্রসঙ্গে সুসাহিত্যিক হেমেন্দ্রকুমার রায় লেখেন, '…শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যে এ হচ্ছে আর এক অভিনব সৃষ্টি, নূতন রূপের তরঙ্গ, না-দেখা ভাবের মূর্তি।…'

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা আগষ্ট তারিখে শরৎচন্দ্রের আর এক অমর উপন্যাস 'পল্লীসমাজে'-র কাহিনী নিয়ে 'রমা' নামক নাটক রচিত হয়। নাট্যকার এই নাটকে নাট্যশিল্পের গুণাবলীর বিচিত্র প্রকাশ না ঘটিয়ে উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাগুলিই একের পর এক সাজিয়ে গেছেন। তার মধ্যে নাটকীয় চমৎকারিত্ব নেই যা নাকি দর্শকদের কাছে আরও উপভোগ্য ও আকর্ষনীয় করতে পারতো। তবু দর্শকরা এই নাটকটি দেখে আনন্দে অভিভূত হন। 'রমা' ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয় ১৩৩৫ সালের ১৯শে শ্রাবণ তারিখে। সুপ্রসিদ্ধ নাট্যগোষ্ঠী আর্ট থিয়েটার এর অভিনয়ের দায়িত্ব নেন।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চেষ্টায় ও পরিচালনায় নাট্যমন্দিরে পুনরায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয় 'রমা' নাটকটি। শিশিরকুমার নিজেও একাধিকবার এই নাটকের অভিনয়ে নামেন।

এলো ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র। ঐ বছরে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তিপান্ন বছরে পদার্পণ করেন। সেই উপলক্ষে দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁকে ইউনিভার্সিটি

ইন্‌ষ্টিটিউট-এ এক নাগরিক সম্বর্দ্ধনা জানানো হয়। উক্ত সম্বর্দ্ধনাসভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাসাহিত্যের 'বীরবল' প্রমথনাথ চৌধুরী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ এই উপলক্ষে এক বাণী পাঠান। তাতে তিনি লেখেন, 'শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা-সভায় বাংলাদেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সঙ্গে আমার অভিনন্দন বাক্যকে আমি সম্মিলিত করি। আজও সশরীরে পৃথিবীতে আছি, সেটাতে সময় লঙ্ঘনের অপরাধ প্রত্যহই প্রবল হচ্ছে সে-কথা স্মরণ করাবার নানা উপলক্ষ্য সর্বদাই ঘটে, আজ সভায় সশরীরে উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে পারলুম না। এও তারি মধ্যে একটা। বস্তুত আমি আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ—এখানকার প্রদোষান্ধকার থেকে ক্ষীণ কর প্রসারিত করে তাঁকে আমার আশীর্বাদ দিয়ে যাই, যিনি বর্তমান বাংলা সাহিত্যের উদয় শিখরে আপন প্রতিভাজ্যোতি বিকীর্ণ করছেন।'

সম্বর্দ্ধনার উত্তরে কথাশিল্পী তাঁর সাহিত্যধর্ম প্রসঙ্গে বলেন, 'হেতু যত বড়ই হোক, মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায় আমার লেখা কোন দিন যেন না এতবড় প্রশ্রয় পায়। কিন্তু অনেকেই তো আমার অপরাধ বলে গণ্য করেছেন, এবং যে অপরাধে আমি সবচেয়ে বড় লাঞ্ছনা পেয়েছি, সে আমার এই অপরাধ। পাপীর চিত্র আমার তুলিতে মনোহর হয়ে উঠছে। আমার বিরুদ্ধে তাঁদের সবচেয়ে বড় এই অভিযোগ।

'এ ভালো কি মন্দ আমি জানিনে, এতে মানবের কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ অধিক হয় কিনা এ বিচার করেও দেখিনি—শুধু সেদিন যাকে সত্য ব'লে অনুভব করেছিলাম তাকেই অকপটে প্রকাশ করেছি। এ-সত্য চিরন্তন ও শাশ্বত কিনা এ চিন্তা আমার নয়। কালে যদি সে মিথ্যা হ'য়েও যায়—তা নিয়ে কারও সঙ্গে আমি বিবাদ করতে যাব না।'...

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে শরৎচন্দ্র ঢাকা জেলার মালিকান্দা অভয় আশ্রমের এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সভার আয়োজন করেন পশ্চিম দিনাজপুরের যুবক ও ছাত্রগণ। ঐ সভায় শরৎচন্দ্র যে ভাষণ দেন তাই 'সত্যাশ্রয়ী' নামে পুস্তকের আকারে প্রকাশিত হয়।

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ইস্টারের ছুটি পড়লো। ঐ সময় রংপুরে বসলো বঙ্গীয় যুব-সম্মিলনীর অধিবেশন। উক্ত অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সভায় তিনি এক জোরালো ও বলিষ্ঠ ভাষণ দেন। তাতে বলেন, 'কংগ্রেস অনেকদিনের—আমারই মত সে বৃদ্ধ; কিন্তু যুব-সংঘ

সে'দিনের—তার শিরায় রক্ত এখনও উষ্ণ, এখনও নির্মল। কংগ্রেস দেশের মাথাওয়ালা আইনজ্ঞ রাজনীতি—বিশারদগণের আশ্রয়কেন্দ্র, কিন্তু যুব-সংঘ কেবলমাত্র প্রাণের ঐকান্তিক আবেগ ও আগ্রহ দিয়ে তৈরী।'

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, 'ভারতের আকাশে আজকাল একটা বাক্য ভেসে বেড়ায়—সে বিপ্লব। বৈদেশিক রাজশক্তি তাই তোমাদের ভয় করতে শুরু করেছে। কিন্তু একটা কথা তোমরা ভুলো না যে, কখনও কোন দেশেই শুধু শুধু বিপ্লবের জন্যেই বিপ্লব আনা যায় না। অর্থহীন অকারণ বিপ্লবের সৃষ্টি মানুষের মনে, অহেতুক রক্তপাতে নয়। তাই ধৈর্য ধরে তার প্রতীক্ষা করতে হয়। ক্ষমাহীন সমাজ, প্রীতিহীন ধর্ম, জাতিগত ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, মেয়েদের প্রতি চিত্তহীন কঠোরতা, এর আমূল প্রতিকারের বিপ্লব-পন্থাতেই শুধু রাজনৈতিক বিপ্লব সম্ভবপর হবে।'

১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর তারিখে শরৎচন্দ্রের চুয়ান্নতম জন্মতিথি সাড়ম্বরে উদ্‌যাপন করা হয়। এর উদ্যোক্তা ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের বঙ্কিম-শরৎ সমিতি। তাঁরা অমর কথাশিল্পীকে যথাযোগ্য অভিনন্দন জানান। অভিনন্দনসভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। উক্ত সভায় কথাশিল্পী তরুণ লেখকদের সাহিত্য প্রসঙ্গে নিজের মতামত ব্যক্ত করেন। তার সারমর্ম হচ্ছে এই যে তরুণদের রচিত সাহিত্যে শক্তির পরিচয় থাকলেও রসবস্তুর অভাব রয়েছে।

শরৎচন্দ্রের আর এক অমর উপন্যাস—সমাজবিদ্রোহের সার্থক রূপময় 'শেষপ্রশ্ন' প্রকাশিত হয় 'ভারতবর্ষে'র ১৩৩৪ সালের শ্রাবণ-কার্তিক, মাঘ-চৈত্র, ১৩৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ ও ফাল্গুন; ১৩৩৬ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ, কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন ও চৈত্র, ১৩৩৭ সালের চৈত্র ও ১৩৩৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায়।

পরে ১৩৩৮ সালের বৈশাখ মাসে সামান্য রদবদলের পর উক্ত উপন্যাসটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে যে বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হইয়া উঠিতেছিল তাহাই লেলিহান অগ্নিশিখারূপে 'শেষপ্রশ্নের' মধ্যে আত্মপ্রকাশ করিল।'...

এই বিদ্রোহী গুণসম্পন্ন পুস্তকটি প্রকাশিত হবার পর অনেকের কাছ থেকে

কটূ ও তিক্ত সমালোচনা শুনেছেন শরৎচন্দ্র। কিন্তু তার জন্যে তিনি আদৌ দমে যান নি। তাঁর সংস্কার-শুদ্ধ মন ছিল খাপখোলা তলোয়ারের মত। তার দ্বারা তিনি তদানীন্তন কালের সমাজে প্রচলিত যাবতীয় ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কুসংস্কারের মূল কর্তন করতে উদ্যত হয়েছিলেন। সুতরাং বিপরীত মতের তীক্ষ্ণ কটাক্ষে ভীরুর মত পিছু হটে যান নি। বিরুদ্ধ সমালোচনার উদ্বেল তরঙ্গের সামনে সাহসী যোদ্ধার মত অচল—অটল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তবে মাঝে মাঝে তিনি যে তাঁর সবচেয়ের প্রিয় উপন্যাস 'শেষপ্রশ্নে'র পক্ষে মতামত শোনবার জন্যে উৎসুক ছিলেন তা আমরা জানতে পারি ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ রাধারাণীকে লেখা এক পত্রে। উক্ত পত্রে তিনি লেখেন, 'শেষপ্রশ্ন' তোমার ভাল লেগেছে শুনে ভারি আনন্দ পেলাম। ভেবেছিলাম এ-বই ভালো লাগবার মানুষ বাংলা দেশে হয়ত পাবো না; শুধু গালি-গালাজই অদৃষ্টে জুটবে, কিন্তু, দেখছি ভয়ের কারণ অত গুরুতর নয়। মরুভূমির মাঝে মাঝে ওয়েসিসের দেখাও মিলচে।'

শেষপ্রশ্নে কেবল সমাজবিদ্রোহের ইঙ্গিত নেই, তাতে রয়েছে নতুন কালের সাহিত্যের এক নতুনতর রূপ। শরৎচন্দ্র নিজেই এই প্রসঙ্গে বলেছেন, 'অতি আধুনিক সাহিত্য কি হওয়া উচিত এ তারই একটুখানি ইঙ্গিত'...

এই মন্তব্যটি তিনি রাধারাণীদেবীর কাছে পত্রমারফৎ করেন। আবার ১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ তারিখে দিলীপ কুমার রায়কে যে পত্র লেখেন তাতেও ঐ একই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি লেখেন, 'শেষপ্রশ্নে অতি-আধুনিক সাহিত্য কি রকম হওয়া উচিত তারই একটুখানি আভাস দেবার চেষ্টা করেছি। খুব করবো, গর্জন করে নোঙরা কথাই লিখবো'।

শরৎচন্দ্র ঠিক কথাই বলেছেন। এই উক্তি হচ্ছে তাঁর মত যথার্থ বিপ্লবী সাহিত্যিকের। লেখকের লেখক-এর জবানবন্দী।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দ। ডিসেম্বর মাস।

রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মোৎসব পালন করেন দেশবাসী। এই উপলক্ষে কবিগুরুকে দেশবাসীর তরফ থেকে যে মানপত্রটি উপহার দেওয়া হয় তা রচনা করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র।

উক্ত জয়ন্তী উৎসবে সাহিত্যসম্মেলনও হয়। তাতে সভাপতিত্ব করেন শরৎচন্দ্র। সম্মেলনে তিনি 'রবীন্দ্রনাথ' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাতে

কবি ও কবিরচিত সাহিত্যের প্রতি তাঁর নিষ্কলুষ শ্রদ্ধা ও প্রীতি প্রকাশ পেয়েছে।

আবার এলো ১৩৩৯ সালের ৩১শে ভাদ্র। ঐদিন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের পুণ্য জন্মতিথি। কলকাতার নাগরিকবৃন্দ ঐ দিনে অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিনে তাঁকে সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করলেন টাউন হলে।

কিন্তু রাজনৈতিক দলাদলির জন্যে ঐ দিন উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হতে পারে না। পরে ২রা আশ্বিন ঐ সভা হলো। তাতে সভাপতিত্ব করার কথা ছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু পারিবারিক কারণে তিনি অনুপস্থিত থাকলেন। তবে তিনি একটি বাণী পাঠিয়ে দেন। তাতে লেখেন, '...পথে পথে পদে পদে তুমি পাবে প্রীতি, তুমি পাবে সমাদর। পথের দুই পাশে যেসব নবীন ফুল ঋতুতে ফুটে উঠবে তারা তোমার। অবশেষে দিনের পশ্চিমকালে সর্বজন হস্তে রচিত হবে তোমার মুকুটের জন্য শেষ বরমাল্য। সেদিন বহুদূরে থাক। আজ দেশের লোক তোমার পথের সঙ্গী, দিনে দিনে তারা তোমার কাছ থেকে পথের দাবী করবে, তাদের সেই নিরন্তর প্রত্যাশা পূর্ণ করতে থাক, পথের চরম প্রান্তবর্তী আমি সেই কামনা করি।'

শরৎ-বন্দনা সমিতি কয়েকজন সাহিত্যিকের লেখা সংগ্রহ করে 'শরৎ-বন্দনা' নামে একটি পুস্তক সংকলন করেন এবং সেটা যথাসময়ে তাঁরা শরৎচন্দ্রের হাতে তুলে দেন। এ ছাড়া তাঁকে সোনার দোয়াত কলম, গরদের জোড়, চন্দনকাঠের খড়ম আর কয়েকটি মানপত্রও উপহার দেওয়া হয়।

১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ তারিখে শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব) প্রকাশিত হয় পুস্তকাকারে। তার আগে এটি ১৩৩৮ সালের ফাল্গুন-চৈত্র ও ১৩৩৯ সালের বৈশাখ-মাঘ সংখ্যায় 'বিচিত্রায়' প্রথম প্রকাশিত হয়।

'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব) শরৎচন্দ্রের মনের মত উপন্যাস। এই প্রসঙ্গে ১৩৪০ সালের ১০ই ভাদ্র তারিখে দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে লেখেন, 'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব) তোমার এত ভালো লেগেছে জেনে কত যে খুশি হয়েছি বলতে পারিনে, —কারণ এ বইটি সত্যিই আমি যত্ন করে মন দিয়ে লিখেছিলাম হৃদয়বান পাঠকের ভালো লাগার জন্যই।'...

কবিশেখর কালিদাস রায় এই গ্রন্থ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'এটা রীতিমত একটা এপিক কাব্য।'

কালিদাস রায় নিজে কবি। তিনি হৃদয়বান। তাই তিনি যথার্থই বুঝেছেন

শ্রীকান্ত (৪র্থ পর্ব)-এর মহিমা। এই গ্রন্থে শরৎপ্রতিভা যে উজ্জ্বল আলোক-মালায় মণ্ডিত হয়ে ললাটদিগন্ত হতে অন্তরের মণিকোঠায় প্রবেশ করে ধীর, স্থির, সংযত ও শান্ত হয়ে শিল্পীকে এক অসাধারণ ও অলৌকিক গৌরবের উচ্চ আসন দিয়েছে তা যে কোন সদ্, নিরপেক্ষ এবং হৃদয়বান পাঠক একবাক্যে স্বীকার করবেন।

কথাশিল্পী কি মনোভাব নিয়ে উক্ত উপন্যাসটি লেখেন সেই প্রসঙ্গে তিনি ১৩৪০ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে জানিয়েছেন, 'আমার অভিপ্রায় ছিল সাধারণ সহজ ঘটনা নিয়ে এ-পর্বটা শেষ করবো এবং নানাদিকের থেকে অল্প কথায় এবং সাহিত্যিক সংযমের মধ্যে দিয়ে কতটুকু রস সৃষ্টি হয় সেটা যাচাই করবো। উপাদান বা উপকরণের প্রাচুর্য্যে নয়, ঘটনার অসামান্যতায় নয়, বরঞ্চ, অতি সাধারণ পল্লী-অঞ্চলের প্রাত্যহিক ব্যাপার নিয়েই এ বইটা শেষ হবে। বিস্তৃতি থাকবে না, থাকবে গভীরতা, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবৃতি নয়, থাকবে শুধু ইঙ্গিত—শুধু রসিক যাঁরা তাঁদের আনন্দের জন্য। কতটা কি হয়েছে জানিনে তবে উপন্যাসসাহিত্যের যতটুকু বুঝি তাতে এই আশা করি যে, যদি আর কিছুই ভালো না পেয়ে থাকি, অন্ততঃ অসংযত হয়ে উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপ প্রকাশ করে বসি নি।'

'শ্রীকান্ত' (৪র্থ পর্ব) প্রসঙ্গে প্রখ্যাত শরৎসাহিত্যসমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন, 'চতুর্থ পর্বে রাজলক্ষ্মীর গৃহলক্ষ্মীরূপ দেখিলাম। যে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়াছে, কিন্তু ধরা দেয় নাই, এ যেন সে নহে। এ শ্রীকান্তকে নিশ্চিন্ত করিয়া কল্যাণবাঁধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে।'...

শরৎচন্দ্রের শেষ গল্প হচ্ছে 'অনুরাধা'। এটা 'সতী' ও 'পরেশ' গল্পের সঙ্গে একত্র হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই মার্চ তারিখে।

'অনুরাধা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪০ সালের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতবর্ষে'।

এই গল্পটি প্রসঙ্গে অনেকে অনেক রকম মন্তব্য করেন। একদল বললেন, শরৎচন্দ্র এই গল্পটি লিখেছেন আধুনিক সাহিত্যিকদের দেহসর্বস্ব প্রেমের প্রতিবাদস্বরূপ।

কিন্তু আসলে শরৎচন্দ্রের মনে তেমনিধারা ভাব ছিল না। তিনি এই প্রসঙ্গে নিজের মতামত জানান, 'দেখ, কোন কিছুর প্রতিবাদের উদ্দেশ্য নিয়ে আমি অনুরাধা লিখিনি। এতে নায়িকার যে মাতৃমূর্তি, সেবাপরায়ণতা, চরিত্রের মাধুর্য নায়ককে মুগ্ধ করলে—তার ফলে নায়কের চিত্তে যে অনুরাগের রঙ রঞ্জিত হ'ল,

তা তো অলীক নয়—সেই-ই তো প্রেম। নারীচরিত্রের এই বিভিন্ন রসধারাকে যে শিল্পী উপভোগ করতে না পেরে তার দেহকেই সর্বস্ব মনে করে, তার সাহিত্য-সৃষ্টি কখনও সার্থক হ'তে পারে না। প্রেমে দেহের যে স্থান নেই তা নয়, কিন্তু তার স্থান ঠিক গাছের শেকড়ের মত—মাটির নীচে।'

শরৎচন্দ্রের 'সতী' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৪ সালের আষাঢ় সংখ্যা 'রঙ্গবাণী'-তে আর 'পরেশ' গল্পটি প্রকাশিত হয় ১৩৩২ সালের ভাদ্র মাসে এক পত্রিকার পূজাবার্ষিকী সংখ্যায়।

শরৎচন্দ্র ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বালীগঞ্জের ২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে এলেন। ঐ সময় তিনি একখানি মোটরও কেনেন।

ক্রমে তিনি কোলকাতায় অবস্থান করে সচ্ছল জীবন-যাত্রা চালাতে লাগলেন। এক সময় যে মানুষ অর্থের অভাবে পরীক্ষার ফির টাকা যোগাড় হতে পারে নি বলে পরীক্ষা দিতে পারলেন না এখন সেই মানুষের লেখা বইয়ের অসম্ভব বাজার চাহিদা তাঁকে ধনবান করে তুললো। বাংলার লেখকের কাছে এ কম ভাগ্যের বিষয় নয়।

তবু শরৎচন্দ্র কোলকাতায় থাকতে চাইতেন না। মাঝে মাঝে তিনি চলে যেতেন তাঁর প্রিয় সামতাবেড়ের বাগানবাড়ীতে। সেখানে দরিদ্র গ্রামবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে যতটা শান্তি ও সুখ পেতেন তার একান্ত অভাব ছিল কোলকাতার বাড়ীতে। শহুরে মানুষের তুলনায় পল্লীগ্রামের মানুষই ছিল কথাশিল্পীর কাছে অপেক্ষাকৃত আপনজন। কারণ তিনি ছিলেন যেমন দিলখোলা ও সরল মনের মানুষ তেমনিধারা প্রকৃত মানুষের সন্ধান পেতেন বাংলার পল্লীগ্রামের মানুষদের জীবনে। আসলে এটাই ছিল শরৎচন্দ্রের যথার্থ স্বরূপ—মহাজীবনের আসল পরিচয়।

শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসটি অবলম্বন করে 'বিজয়া' নামে এক নাটক প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তারিকে। উক্ত নাটকে উপন্যাসের মূল কাহিনীর প্রায় সবটুকুই বর্তমান। বিশেষ করে উপন্যাসে লিখিত সংলাপগুলি নাটকে অবিকৃতভাবে স্থান পেয়েছে। তবে শরৎচন্দ্র কিছু রদবদলও করেছেন দর্শকদের মুখের দিকে তাকিয়ে। এই প্রসঙ্গে তিনি একবার অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে বলেন, 'বিজয়া যদিও দত্তা থেকে নেওয়া কিন্তু আমি অনেক কিছু বদলে, একরকম একখানি নতুন নাটক লিখে দিয়েছি। আমার

মনে হয়, আমার ষোড়শীকে দেশের লোকেরা যেভাবে নিয়েছিল বিজয়া তার চেয়েও আদর পাবে—অবশ্য অভিনয় যদি ভাল হয়। আমার বিশ্বাস, শিশির যদি একটু পরিশ্রম করে, তাহলে বিজয়া নিশ্চয়ই তাকে বাঁচিয়ে দেবে। সত্যি কথা বলতে কি, লোকে যে যাই বলুক, শিশির যে একজন সত্যিকারের আর্টিস্ট সে বিষয়ে আমার একটু সন্দেহ নাই।'

প্রসিদ্ধ নট শিশির কুমার ভাদুড়ী 'বিজয়া' নাটকটি ১৯৩৪ সালের ২২শে ডিসেম্বর তারিখে 'নবনাট্য মন্দিরে' মঞ্চস্থ করেন।

নাটকটি মঞ্চস্থ করার আগে তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে নাটকটির কিছু পরিবর্তন করতে ইচ্ছে প্রকাশ করলে শরৎচন্দ্র অনুমতি দেন নি।

তথাপি নাটকটি অসাধারণ মঞ্চসাফল্য লাভ করলো। তাইতে উৎসাহিত হয়ে শরৎচন্দ্র 'নববিধানে'র নাট্যরূপ দিতে চাইলেন। কিন্তু ঐ সময় শিশির কুমার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। সুতরাং তাঁর দ্বারা ঐ কাজ আর হলো না।

পরে শিশির ভাদুড়ীর অনুরোধে শরৎচন্দ্র তাঁর অমর উপন্যাস 'গৃহদাহ'-এর নাট্যরূপ দিতে প্রবৃত্ত হলেন। দু' অঙ্ক লেখার পর তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর দ্বারা আর লেখা সম্ভব হলো না। বাকি দু'টি অঙ্ক শিশির কুমার নিজে লিখে অভিনয় করেন। নাটকে ওর নাম হলো 'অচলা'।

কিন্তু উক্ত নাটকটি মঞ্চে সাফল্যলাভ করতে পারে নি। আর শরৎচন্দ্রও 'গৃহদাহে'র নাট্যরূপ 'অচলা' পাঠ করে খুশী হতে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের অনেক উপন্যাস নাটকাকারে যেমন মঞ্চস্থ হয়েছে তেমনি তাঁর কতকগুলি উপন্যাসের কাহিনীকে কেন্দ্র করে চলচিত্রও তৈরী হয়েছে। বাংলার অন্যতম স্বনামধন্য চলচিত্রশিল্পী প্রমথেশ বড়ুয়া শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাস' ও 'দেবদাস' চলচিত্রে রূপ দেন। শরৎচন্দ্র প্রমথেশকে 'দেবদাস' চলচিত্রের জন্যে অকুণ্ঠ প্রশংসা ও সাধুবাদ জানান। বাস্তবিক সেদিন 'দেবদাস' চলচিত্রে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করে। আজও তার রেশ কিছুমাত্র কমেছে বলে মনে হয় না। কেননা কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্রের এই উপন্যাসের চলচিত্ররূপ হিন্দী ও বাংলা ভাষায় সিনেমার পর্দায় জনসাধারণ প্রত্যক্ষ করে অসাধারণ আনন্দ লাভ করে। বক্স্ অফিসে প্রতিদিন ভীড়—সিনেমাহল হাউসফুল।

শরৎচন্দ্র নাটক লেখেন নি। তিনি তাঁর যে তিনখানি বইয়ের নাট্যরূপ দিয়েছেন তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নয় লোকের কথামত চাপে পড়ে। তাই বলে তিনি নাটক লিখতে পারতেন না এমন কথা বলা ঠিক হবে না। তিনি নাটক

লিখতে পারতেন ঠিক কথা। তবে কেন লেখেন নি তার কৈফিয়ৎ দিয়েছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে। তিনি লিখেছেন, 'আমি নাটক লিখি না, তার কারণ হচ্ছে আমার অক্ষমতা। দ্বিতীয়, এই অক্ষমতাকে অস্বীকার করে যদিই বা নাটক লিখি, তাহলেও আমার মজুরি পোষাবে না। মনে কোরো না কথাটা টাকার দিক থেকেই শুধু বলচি। সংসারে ওটার প্রয়োজন, কিন্তু একমাত্র প্রয়োজন নয়। এ-সত্য একদিনও ভুলিনে। উপন্যাস লিখলে মাসিক পত্রের সম্পাদক সাগ্রহে তা নিয়ে যাবেন, উপন্যাস ছাপাবার জন্যে পাবলিশারের অভাব হবে না, অন্তত হয়নি এতদিন এবং সেই উপন্যাস পড়বার লোকও পেয়ে এসেছি। গল্প লেখার ধারাটা আমি জানি। অন্তত, শিখিয়ে দিন বলে কারও দ্বারস্থ হবার দুর্গতি আমার আজও ঘটেনি। কিন্তু নাটক? রঙ্গমঞ্চের কর্তৃপক্ষই হচ্ছেন এর চরম হাইকোর্ট। মাথা নেড়ে যদি বলেন, এ জায়গাটার অ্যাকশন কম,—দর্শকে নেবে না। কিংবা এ-বই অচল, ত তাকে সচল করার কোন উপায় নেই। তাঁদের রায়ই এ-সম্বন্ধে শেষ কথা। কারণ তাঁরা বিশেষজ্ঞ। টাকা-দেনে-ওয়ালা দর্শকের নাড়ীনক্ষত্র তাঁদের জানা। সুতরাং এ-বিপদের মধ্যে খামাকা ঢুকে পড়তে মন আমার দ্বিধা বোধ করে।

'নাটক হয়ত আমি লিখতে পারি। কারণ, নাটকের যা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু—যা ভালো না হলে নাটকের প্রতিপাদ্য কিছুতেই দর্শকের অন্তরে গিয়ে পৌঁছয় না—সেই ডায়ালোগ লেখার অভ্যাস আমার আছে। কথাকে কেমন ভাবে বলতে হয়, কত সোজা ক'রে বললে তা মনের ওপর গভীর হ'য়ে বসে, সে-কৌশল জানিনে, তা নয়। এ-ছাড়া চরিত্র বা ঘটনাসৃষ্টির কথা যদি বল, তাও পারি বলেই বিশ্বাস করি। নাটকে ঘটনা বা সিচুয়েশান সৃষ্টি করতে হয় চরিত্রসৃষ্টির জন্যেই। দু'রকমের হতে পারে—এক হচ্ছে, প্রকাশ অর্থাৎ পাত্র পাত্রীরা, তাই ঘটনা পরম্পরার সাহায্যে দর্শকের চোখের সুমুখে প্রকাশিত করা। আর দ্বিতীয় হচ্ছে—চরিত্রের বিকাশ অর্থাৎ ঘটনা পরম্পরের মধ্যে দিয়ে তার জীবনের পরিবর্তন দেখানো।...আর একটা কথা—উপন্যাসের মত নাটকের elasticity নেই। নাটককে একটা নির্দিষ্ট সময়ের বেশি এগুতে দেওয়া চলে না। ঘটনার পর ঘটনা সাজিয়ে নাটককে দৃশ্যে বা অঙ্কে ভাগ করা—তাও হয়তো চেষ্টা করলে দুঃসাধ্য হবে না। কিন্তু ভাবি। ক'রে কি হবে? নাটক যে লিখব, তা অভিনয় করবে কে? শিক্ষিত বোঝদার অভিনেতা-অভিনেত্রী কৈ? নাটকের হিরোয়িন সাজবে, এমন একটিও অভিনেত্রী তো নজরে পড়ে

না। এমনিধারা নানা কারণে সাহিত্যের এই দিকটায় পা বাড়াতে ইচ্ছে করে না। আশা করি, একদিন বর্তমান রঙ্গালয়ের এই অভাবটা ঘুচবে, কিন্তু আমরা তা' হয়ত চোখে দেখে যেতে পারব না। অবশ্য সত্যিকারের তাগিদ যদি আসে, কখনো হয়তো লিখতেও পারি। কিন্তু আশা বড় করিনে।'

শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের ফাগুন-চৈত্র, ১৩৪০ সালের বৈশাখ-আষাঢ়, আশ্বিন-ফাল্গুন, ১৩৪১ সালের বৈশাখ, শ্রাবণ-ভাদ্র ও কার্তিক-মাঘ সংখ্যা 'বিচিত্রা'-য়। এটি হচ্ছে শরৎচন্দ্রের জীবদ্দশায় প্রকাশিত শেষ উপন্যাস। এর আগে উপন্যাসটির ১০ম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ৩য় ও ৪র্থ বর্ষের (১৩৩৬-'৩৮) 'বেণু' তে প্রকাশিত হয়।

প্রায় একই সময় শরৎচন্দ্র 'শেষপ্রশ্ন' ও 'বিপ্রদাস' উপন্যাস দু'খানি লেখেন। অথচ উভয়ের বিষয়বস্তুর মধ্যে কত প্রভেদ।

'বিপ্রদাস' উপন্যাসখানি শরৎচন্দ্র পরিণত বয়সে লিখলেও তার কোথাও কোথাও অসঙ্গতি রয়ে গেছে। কোথাও বা কস্টকল্পনার প্রকাশ ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্যের অন্যতম সমালোচক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন,

'...বিপ্রদাস' উপন্যাসের অনেকস্থলে ঘটনার অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যায়। উপন্যাসটির মধ্যে লেখকের গভীর মনোযোগের অভাব ও রচনার শিথিলতা অনেকস্থলে স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। বন্দনা এই উপন্যাসের কাহিনীতে বোম্বাই হইতে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কিন্তু তাহার আর বোম্বাই ফেরা হইল না। কেবল তাহাকে যাওয়ার উদ্যোগ করিতে দেখি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া আর হইয়া উঠে না।'...

বিদেশে শরৎ-সাহিত্য প্রচার হোক এই শুভ কামনা অনেক শরৎ-অনুরাগী করেছিলেন। তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেনও শরৎচন্দ্রের উপন্যাসগুলি ইংরেজীতে অনুবাদ করার জন্যে। তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা নেন স্বনামধন্য দিলীপ কুমার রায়। এই ব্যাপারে মহাযোগী অরবিন্দের অবদানও কম ছিল না। আমরা এইসব খবর জানতে পারি দিলীপ কুমার রায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একাধিক পত্রে। একটি পত্র লেখেন ১৩৪১ সালের ৩রা মাঘ তারিখে। তাতে তিনি লেখেন, 'অনুবাদ ভালো হবেই যা দেখে দেবার সংকল্প করেছেন শ্রীঅরবিন্দ নিজে। কিন্তু বইটার নিজস্ব গুণ এমন কি আছে মণ্টু? কেন যে শ্রীঅরবিন্দের ভালো লাগলো জানি নে। অন্ততঃ না লাগলে বিস্মিতও হোতাম না, ক্ষুণ্ণও

হোতাম না। তুমি শ্রীকান্ত যবে প্রচার করতে পারবে তখনই শুধু আশা করবো হয়ত বাঙালী একজন গল্পলেখককে পশ্চিমের ওরা একটুও শ্রদ্ধার চোখে দেখবেন। তোমার উদ্যোগ থাকলে এবং শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদ থাকলে এ-অসম্ভবও হয়ত একদিন সম্ভব হবে। এই ভরসাই করি।'...

আর একখানি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখলেন, 'মণ্টু, এই অতি তুচ্ছ নিষ্কৃতি নিয়ে সমরাঙ্গনে নেমে পড়া আর টিনের খাঁড়া নিয়ে মোষ কাটতে যাওয়া প্রায় এক কথা। নিজের মধ্যে সত্যিই বিশেষ ভরসা পাইনে। শুধু একটা কথা এই মনে করি যে, তোমার গুরুদেবের আশীর্বাদ আছে এবং তোমার নিজের অকৃত্রিম স্নেহ ও শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু নিজের তরফ থেকে যে কিছুই নেই মনে হয় ভাই।

'তুমি শ্রীকান্ত তর্জমা করতে সঙ্কোচ বোধ করচো কেন? যদি হয় ত তোমাকে দিয়েই হবে। ভবানীকে ডেকে ৪র্থ ভাগ শ্রীকান্ত দিয়ে বলেছিলাম, এর যে কোন একটা অধ্যায় তর্জমা ক'রে নিয়ে এসো। আট দশ দিন পরে সে নিজেত এলই না, চিঠিতে জানালে তার সাহস হয় না। এবং যে ইংরিজি চিঠিটুকু পাঠালে তার থেকে তার কথাটাকে মিথ্যে বিনয় ব'লেও ভাবতে পারলাম না। সে সত্যিই লিখেচে। তাকে দিয়ে হবে না। হ'লে খবরের কাগজের ভাষা হবে।

'সোমনাথ মৈত্র' যে 2nd part translation করতে উদ্যত হয়েছে এ-খবর আমি নিজেও জানি নে। বিচিত্রার উপেন নিজে যদি এ-ব্যবস্থা ক'রে থাকে ত সে আলাদা। খবর নেবো। আমি ত খুঁজেই পাচ্ছিনে কে এ-কাজে হাত দিতে পারে তুমি ছাড়া। নিষ্কৃতির যে-তর্জমা তুমি করেছো তার চেয়ে ভালোই বা কে করতো? তবে, তোমাকে শ্রীকান্ত তর্জমা করতে বলতে আমার ইচ্ছে হয় না। কারণ এত বড় পরিশ্রমের কাজে হাত দিলে তোমার অন্য কাজের ক্ষতি হবে।

'নিষ্কৃতির সম্বন্ধে তোমার যে-রকম ব্যবস্থা করতে ইচ্ছে হয় কোরো। ছোট গল্পগুলোর তর্জমা এখানে করাবার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু লোক পাইনে। আমার নিজের কাছেই রয়েছে পণ্ডিত মশাইয়ের তর্জমা। কিন্তু সে-দেখলেও তোমার হয়ত দুঃখ হবে।'

এই পত্র দু'খানি পাঠ করলে বেশ স্পষ্টই বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্রের নিজেরও কম ইচ্ছে ছিল না যে তাঁর সাহিত্য ইংরেজীতে অনুবাদ এবং বিদেশে প্রচার হোক।

শরৎচন্দ্রের মনে একসময় ইউরোপ দর্শনের আগ্রহ হয়। সে দেশে যাবার

জন্যে পাসপোর্ট পর্যন্ত তৈরী হয়েছিল। কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়ার জন্যে তাঁর পক্ষে সে দেশে যাওয়া সম্ভব হয় নি।

শরৎচন্দ্র সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নামেন নি ঠিক কথা তবে তিনি রাজনৈতিক অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত ছিলেন। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুলাই তারিখে টাউন হলে এক জনসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে জনসাধারণ প্রবল বিক্ষোভ জানায়। উক্ত সভায় সভাপতি হন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ। সভার উদ্বোধন করেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন, 'রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মবিশ্বাস কি হয়ে দাঁড়ালো সকলের বড়? আর মানুষ হলো ছোট? যে ব্যবস্থা জগতের কোথাও নেই, যাতে কোনও কল্যাণ হয় নি এই দুর্ভাগা দেশে তাই কি হলো special and peculier circumstances? আর সে কেউ বোঝে না—নাবালকের trustee-রা ছাড়া?...নূতন শাসনব্যবস্থার আগাগোড়াই মন্দ। সেই অপরিসীম মন্দের মধ্যেও বাংলার হিন্দুরা ক্ষতিগ্রস্ত হল সবচেয়ে বেশী। আইনের পেরেক ঠুকে তাদের ছোট করা হল চিরদিনের মতো।...তাঁদের বলতে চাই—অন্যায়, অবিচার—একজনের প্রতি হলেও সে অকল্যাণময়। তাতে শেষ পর্যন্ত না মুসলমানের, না হিন্দুর, না জন্মভূমির—কারও মঙ্গল হয় না।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে ডি. লিট উপাধি দিয়ে সম্মানিত করে। তিনি যখন ঢাকায় গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত উক্ত উপাধি গ্রহণ করেন তখন দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে তীব্র বিক্ষোভ চলছিল। অনেকেই শরৎচন্দ্রের এই উপাধি গ্রহণটা ভাল নজরে দেখলেন না। বিশেষ করে আর এক কারণে অনেকেই শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজের উত্তরে শরৎচন্দ্র বলেন, 'এখন থেকে আমি মুসলমান সমাজ নিয়েই গল্প-উপন্যাস লিখবো।'

শরৎচন্দ্রের এই প্রকার সিদ্ধান্তে অনেকেই অসন্তুষ্ট হন। তখনকার সাময়িক পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে কটুক্তি করে নানারকম লেখা ছাপা হলো।

পরে শরৎচন্দ্র তাঁর বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে তাঁর ঐ সিদ্ধান্ত প্রসঙ্গে বললেন, 'উপাধি বিতরণের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাংলার লাট মহোদয়। যখন তাঁর সঙ্গে আহার করছি তখন কথাপ্রসঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মনোমালিন্যের কথা ওঠে। সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি যদি আমার সাহিত্যে মুসলমান সমাজের কথা দরদের সঙ্গে লিখি, তা হ'লে এই মনোমালিন্যের অনেকটা সুরাহা

হবে এবং তাতে দেশের কল্যাণ হবে। আমি তাঁর এ-কথায় সম্মতি জানাই। ভেবে দেখলুম তিনি কিছু অন্যায় বলেন নি। বাস্তবিকই, আমরা যতই মুসলমান সম্প্রদায়কে আমাদের বিরুদ্ধবাদী ব'লে মনে করি না কেন, আসলে ওরা আমাদের দেশেরই—এখানেই ওদের সব। আমাদের যা মাতৃভাষা ওদের মাতৃভাষাও তাই। সত্যিকারের সহানুভূতি দিয়ে যদি তাদের কথা লিখি, তারা তা শুনবেই—না শুনে পারে না।'

১৩৪৩ সাল। ১১ই আশ্বিন। দমদমের 'অলকাভবন'। ওখানকার রবিবাসরে শরৎচন্দ্রকে সম্বর্দ্ধনা জানাবার আয়োজন করা হলো। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করবার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানালে তিনি বললেন, ২৫ তারিখে হলে আমি রাজী আছি।'

ঐ কারণে ১১ই আশ্বিনে সম্বর্দ্ধনায় পর আবার ২৫শে আশ্বিন রবিবাসরের সম্বর্দ্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রবিবাসরের অন্যতম সদস্য অনিল কুমার দেবের বেলেঘাটার বাগানবাড়ীতে ঐ সম্বর্দ্ধনা-সভা অনুষ্ঠিত হলো। রবীন্দ্রনাথ ঐ সভায় স্বয়ং উপস্থিত হয়ে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দিত করে বললেন, 'জ্যোতিষী অসীম আকাশে ডুব মেরে সন্ধান করে বের করেন নানা জগৎ, নানা রশ্মি সমবায়ে গড়া, নানা কক্ষপথে নানা বেগে আবর্তিত। শরৎচন্দ্রের দৃষ্টি ডুব দিয়েছে বাঙালীর হৃদয়-রহস্যে। সুখে দুঃখে মিলনে বিচ্ছেদে সংঘটিত বিচিত্র সৃষ্টির তিনি এমন করে পরিচয় দিয়েছেন, বাঙালী যাতে আপনাকে প্রত্যক্ষ জানতে পেরেছে। তার প্রমাণ পাই তার অফুরান আনন্দে। যেমন অন্তরের সঙ্গে তারা খুশী হয়েছে, এমন আর কারো লেখায় তারা হয় নি। অন্য লেখকরা অনেকে প্রশংসা পেয়েছে, কিন্তু সর্বজনীন হৃদয়ের এমন আতিথ্য পায় নি। এ বিস্ময়ের চমক নয়, এ প্রীতি। অনায়াসে যে প্রচুর সফলতা তিনি পেয়েছেন তাতে তিনি আমাদের ঈর্ষাভাজন।'......

এরকম অভিনন্দন শরৎচন্দ্র এর আগে আর লাভ করেন নি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে। সেই কারণে রবীন্দ্রনাথের ওপর থেকে তাঁর সকল প্রকার অভিযোগ ও অভিমান সমূলে উৎপাটিত হলো। তাঁর মন খুশীতে ভরে উঠলো। এই প্রসঙ্গে তিনি ১৩৪৩ সালের ১১ই কার্তিক উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে লেখেন, 'আমার একষট্টি বছরের প্রারম্ভে কবি আশীর্বাদ করেছেন। অকৃপণ ভাষায় মন খুলে মঙ্গল কামনা করেছেন।'...

কবিশেখর কালিদাস রায়ের সম্পাদনায় 'রসচক্র' নামে এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের নিবিড় ঘনিষ্ঠতা ছিল। শরৎচন্দ্র উক্ত চক্রের বৈঠকে নিয়মিতভাবে যাতায়াত করতেন। একসময় তিনি ঐ চক্রের সভাপতি হন। উক্ত বৈঠকে শরৎচন্দ্র তাঁর জীবনের নানারকম অভিজ্ঞতার কথা বলতেন।

ডি, লিট উপাধি লাভ করার পর শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাবার জন্যে রসচক্রের সভ্যগণ শিল্পী অর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায়ের বন হুগলীর বাগানবাড়ীতে এক উদ্যান-সম্মেলনের আয়োজন করেন। উক্ত সম্মেলনে শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে বলা হলো, 'আমরা কোন ঘটা সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই। আমরা কোন মামুলি বচন-বিন্যাসের আড়ম্বর করি নাই, আমরা সভাপতি ভাড়া করে আনি নাই, আমরা অভিনন্দন পত্র রচনা করি নাই—আমরা ফুলের মালা পর্যন্ত পরাই নাই আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর আনন্দটুকু জানাইতেছি। রসস্রষ্টা হইতে পারা বহু জন্মের সাধনার ফল—রসস্রষ্টা হইতে না পারি, যেন রসের পরিপূর্ণ মর্ম উপলব্ধি করিয়া রসচক্রের নাম সার্থক করিতে পারি—এই আশীর্বাদ তাঁহার কাছে চাই।'

শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য কোনদিন ভাল ছিল না। ইদানীং আরও খারাপ হয়ে পড়লো। তাঁর চিকিৎসকগণ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে বায়ুপরিবর্তনের উপদেশ দিলেন। সেইমত তিনি কিছুদিনের জন্যে দেওঘরে গিয়ে থাকেন। সেখানে থাকার সময় 'দেওঘরস্মৃতি' নামে একটি গল্পও লেখেন। উক্ত গল্পের প্রধান নায়ক হচ্ছে একটি কুকুর।

এলো ১৩৩৪ সালের ৩১ শে ভাদ্র। শরৎচন্দ্রের প্রিয় দেশবাসী এবং গুণমুগ্ধ বন্ধুরা তাঁর শেষ জন্মোৎসব পালন করলেন একটু আড়ম্বর করে। বিশেষ করে আকাশবাণীর অধিকর্তা মিষ্টার স্টেপেলটন এই ব্যাপারে অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করলেন। তিনি বেতারে এক বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। তার নাম দেওয়া হলো 'শরৎ-শর্বরী'। ঐ অনুষ্ঠানে অনেকেই শরৎচন্দ্রের দীর্ঘজীবন কামনা করে বক্তৃতা দেন। উত্তরে শরৎচন্দ্র যা বলেন তার সারমর্ম হচ্ছে, দীর্ঘজীবন বাইরে থেকে সাধারণত দেখতে ভাল হলেও সব সময়ে ও সব ক্ষেত্রে ওটা কাম্য নয়। যদি স্বাস্থ্য, শান্তি ও কর্মশক্তি অটুট থাকে, দেশ, সমাজ ও লোকসেবা করবার ক্ষমতা থাকে, কোনও দিকে কোনরূপ অশান্তি না থাকে তবেই দীর্ঘজীবন কাম্য। কিন্তু মানসিক অশান্তি ও দৈহিক

অসুস্থতার মধ্যে দিয়ে যে দীর্ঘজীবন—তেমন দীর্ঘজীবনকে তিনি ভাগ্যের অভিসম্পাত বলেই মনে করেন। ব্যাধিপীড়িত হয়ে কর্মশক্তি হারিয়ে তিনি একদিনও বাঁচতে চান না।

দেহত্যাগের আগে শরৎচন্দ্র তাঁর সর্বশেষ যে সম্বর্দ্ধনা সভায় যোগ দেন সেটির অয়োজন করে কলকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের ছাত্রগণ। আর্যসমাজ হলে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হলো। রোগজীর্ণ অসুস্থ শরীর নিয়ে শরৎচন্দ্র উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। উক্ত সম্বর্দ্ধনা সভায় তিনি বলেন, 'আমার সাহিত্যিক মৃত্যু যদি হয়ে থাকে তবে আমি আর বাঁচতে চাই না।'

অসুস্থ হওয়া সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র লেখার কাজ একেবারে ত্যাগ করেন নি। কিছু.কিছু লিখেছেন। তাঁর সঙ্গে লেখার কাজে অর্থাৎ অসম্পূর্ণ উপন্যাস সম্পূর্ণ করার কাজে সহযোগিতা করেন অন্যান্য সাহিত্যিকগণ। 'ভারতী' পত্রিকায় বারোজন সাহিত্যিক একখানি উপন্যাস লেখেন। তার নাম দেন 'বারোয়ারী'। উক্ত উপন্যাসের একুশ ও বাইশ নম্বরের পরিচ্ছেদ লেখেন শরৎচন্দ্র নিজে। পরে ঐ উপন্যাসখানি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

শরৎচন্দ্র আর একখানি উপন্যাস লিখতে শুরু করেন 'বাড়ির কর্তা' নামে কাশী থেকে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রসাদজ্যোতিঃ' পত্রিকায়। তবে তিনি এটি নিজে লিখে শেষ করে যেতে পারেন নি। 'উত্তরা' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুরোধে 'রসচক্রে'র সদস্যরা উক্ত উপন্যাসখানির লেখা শেষ করেন। উক্ত উপন্যাসের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ লেখেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, তৃতীয় পরিচ্ছেদ জগদীশ গুপ্ত, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, সপ্তম ও অষ্টম পরিচ্ছেদ নরেন্দ্র দেব, নবম পরিচ্ছেদ রাধারাণী দেবী ; দশম হতে চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ সরোজ রায়চৌধুরী, পঞ্চদশ হতে উনবিংশ পরিচ্ছেদ মনোজ বসু, বিংশ হতে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ বিশ্বপতি চৌধুরী, ত্রিবিংশ হতে পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ষষ্ঠ বিংশ হতে অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ রাধিকারঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায় এবং উনত্রিংশ হতে একত্রিংশ পরিচ্ছেদ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। উপন্যাসটি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে 'রসচক্র' নামে প্রকাশিত হয়।

'শরৎচন্দ্রের লেখা সর্বশেষ উপন্যাস হচ্ছে 'ভালমন্দ'। এটিও তিনি লেখেন আংশিকভাবে। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৪৪ সালের শারদীয়া সংখ্যা 'বাতায়ন' পত্রিকায়। পরে অন্য দশজন সাহিত্যিক মিলে এটির বাকি অংশ লিখে শেষ করেন। উক্ত উপন্যাসখানি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৩৫৯ সালের মাঘ মাসে।

জন্মালেই মরতে হবে একথা একেবারে ধ্রুব সত্য। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়টা কেউ সুস্থভাবে বেঁচে থাকে আবার কেউ অসুস্থতার মাঝে। শরৎচন্দ্রের স্বাস্থ্য আদৌ ভাল্ ছিল না। তিনি প্রায়ই অসুখে ভুগতেন। শেষ জীবনে গোটা দুই বছর একনাগাড়ে ভীষণভাবে ভুগেছিলেন। তিনি নিজেই নিজের শরীর সম্বন্ধে বলতেন, 'আমার শরীরের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ডিসপেনসারি গড়ে উঠেছে।'

শরৎচন্দ্রের শেষ জীবনের অসুখ প্রসঙ্গে কবিশেখর কালিদাস রায় 'বাতায়ন' পত্রিকার সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র ঘোষালকে যে পত্রখানি লেখেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি:

'গত আড়াই বছর ভগ্নস্বাস্থ্য ও রুগ্ন দেহ নিয়েই তিনি বেঁচেছিলেন। বহুদিন হতে তাঁর অর্শরোগ ছিল—এই সময়ে বেড়ে গিয়েছিল। সামতাবেড় হ'তে একদিন রোদে স্টেশনে হেঁটে এসে তিনি গাড়ীর মধ্যেই অবসন্ন হয়ে পড়েন। সেদিন হ'তে তিনি একপ্রকার শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হন। প্রায়ই মাথা ধরত—মাথাধরার জন্য কিছুদিন ধরে খুব কষ্ট পান। কপালের নিম্নভাগটায় সব সময়েই বেদনা অনুভব করতেন। একদিন শ্যামবাজারে একটি আমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তিনি হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে জ্বর হতো। ঢাকায় Convocation-এ ডিগ্রী আনতে গিয়ে সাহিত্যিক অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে জ্বরে বিশেষ কাতর হয়ে পড়েন। সেখান হ'তে ফেরার পর মাঝে মাঝে জ্বরে পড়তেন—শেষে অবিচ্ছেদ্য জ্বরে কিছুকাল শয্যাতে থাকেন—তাঁর জ্বর বি-কোলাই ইন্‌ফেক্‌শনের ফল বলে স্থির হয়। তাঁকে ম্যালেরিয়াও ধরেছিল। তিনি বলতেন—'সামতাবেড়ে ম্যালেরিয়া নেই—ম্যালেরিয়া কিছুতেই হতে পারে না। ম্যালেরিয়া যদিই হয়ে থাকে তবে তোমাদের বালিগঞ্জেই ধরেছে।' যাই হোক—ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাতেই তাঁর জ্বর সেরে যায়। ম্যালেরিয়ার চিকিৎসাতেই তাঁর মাথাধরা ও বেদনাও দূর হয়ে যায়। Change-এ যাওয়া তিনি পছন্দ করতেন না—তবু ডাক্তারের পীড়াপীড়িতে কিছুদিনের জন্য তিনি দেওঘরে গিয়েছিলেন। ঔষধপত্রে তাঁর বিশেষ বিশ্বাস ছিল না—তবু ডাক্তারের নির্দেশে ঔষধপত্র যথেষ্টই খেয়েছিলেন—কিছুদিন কবিরাজী চিকিৎসাও করেছিলেন। তিনি বলতেন, এই দুই বছরে আমার শরীরের ভিতর একটা প্রকাণ্ড ডিসপেনসারি গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে জেদ করে বসতেন, আর ওষুধ কিছুতেই খাব না। কেউ তাঁকে ওষুধ খাওয়াতে পারত না। তাঁর বন্ধু ডাক্তার কুমুদশঙ্কর

রায়ের উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ছিল—শিশুকে আত্মীয়-স্বজনেরা যেমন করে ভোলায় তেমনি করে তিনি শরৎচন্দ্রকে ভুলিয়ে আবার ওযুধ খাওয়াতেন।

'জ্বর সেরে গেল, মাথার অসুখ সেরে গেল, কিন্তু শরীরের সে সামর্থ্য, সে স্বাস্থ্য, মনের সে প্রফুল্লতা আর ফিরল না। তারপর গত আশ্বিন মাস হতে নূতন ব্যায়রামের সূত্রপাত হলো। তারই পরিণতির ফলেই তাঁর জীবনাবসান।

'গত দুই বৎসর তিনি মনে মনে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর কথাবার্তায় এরূপ আভাষ পাওয়া যেত। একটা মৃত্যুভয় তাঁর জীবনের স্বাভাবিক প্রফুল্লতার ওপর ছায়াপাত করেছিলো। এই মৃত্যুভয় দমন করবার শক্তিও তাঁর ছিল অসাধারণ। কোনদিন কথাবার্তায় তিনি সে ভয় প্রকাশ করেন নি।

'দুবৎসর আগে একদিন কথায় কথায় বলেছিলেন, দেখ, যারা অনেক টাকাকড়ি খরচ করে নানা প্রকার ধর্মাচরণ করে, তাদের বিশ্বাস স্বর্গ আছে—স্বর্গে গিয়ে পুরস্কার পাবে। আমার কোন ধর্মাচরণও নেই, স্বর্গও নেই, সেদিক হতে কোন আশ্বাস বা সান্ত্বনা পাই না। আমার নরকও নেই—নরকভয়ই মৃত্যুভয়কে ভীষণ করে তোলে, আমার নরকভয়ও নেই। আমার পরলোকও নেই, পরলোকের জন্য প্রস্তুত হওয়ার জন্য তাই তাগিদও নেই।'

অসুখ দিনের পর দিন বেড়ে যেতে লাগলো। তাই শরৎচন্দ্র তাঁর চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষার তত্ত্বাবধান করবার জন্যে তাঁর মামা সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ভাগলপুর থেকে চলে আসবার জন্যে লিখলেন।

সুরেন্দ্রনাথও এলেন যথাসময়ে। তিনি শরৎচন্দ্রের রোগজীর্ণ অবস্থা দেখে রীতিমত শঙ্কিত হলেন। ভাবলেন, সামতাবেড়ে থাকলে শরৎচন্দ্রকে আর বাঁচানো যাবে না। তাঁর সুচিকিৎসার জন্যে তাঁকে কোলকাতায় নিয়ে যেতে হবে।

শরৎচন্দ্রের ইচ্ছে ছিল না যে তিনি সামতাবেড় ত্যাগ করে যান। তাঁর বড় সাধের বাঁসা ঐ সামতাবেড়। ও যেন তাঁর প্রিয়তমা গর্ভধারিণী। তাই ওকে ত্যাগ করে আসতে ওঁর কষ্ট হচ্ছিল।

অবশেষে তিনি কোলকাতায় আসতে রাজী হলেন। স্ত্রী হিরন্ময়ী তাঁর সঙ্গে আসতে চাইলেন। তিনি নিষেধ করলেন। বললেন, আমি তো যাচ্ছি তিন চার দিনের জন্যে। আবার ফিরে আসবো।

কোলকাতা অভিমুখে রওনা হবার আগে কথাশিল্পী প্রবেশ করলেন তাঁর প্রিয় গৃহদেবতা গোবিন্দজীর ঘরে। সেখানে ভূমিষ্ট হয়ে গোবিন্দজীকে প্রণাম

জানালেন। তারপর গান ধরলেন, 'পথের পথিক কোরেছ আমায়—সেই ভালো, ওগো সেই ভালো। আলেয়া জ্বালালে প্রান্তর ভালে সেই আলো মোর সেই আলো।'

ঘর ছেড়ে কথাশিল্পী এলেন কোলকাতায় আর এক ঘরে। ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে সঙ্গে করে এলেন শরৎচন্দ্রকে দেখতে। ডাঃ রায় শরৎচন্দ্রের পেট পরীক্ষা করে বললেন 'কিং কিংস' ব্যাধি অর্থাৎ অন্ত্রের ব্যাধি—নাড়ি জটপাটকেল। এরপর এক্সরে করা হলো। তাতে ধরা পড়লো পেটের মধ্যে দুরারোগ্য ক্যান্সার।

ডাঃ রায়ের পরামর্শমত শরৎচন্দ্রকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হলো অপারেশনের জন্যে।

অপারেশনও হলো যথাসময়ে। কিন্তু তিনি বাঁচলেন না। ভুলবশত আফিমগোলা জল পান করেছিলেন বলে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী বাংলা ১৩৪৪ সালের ২রা মাঘ বেলা দশটার সময় ৬১ বছর ৪ মাস বয়সে শরৎচন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ দেশবিদেশে দ্রুত ছড়িয়ে পড়লো। কোলকাতার একাধিক দৈনিক পত্রিকা এই ব্যাপারে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করলো।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুশয্যার পাশে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ডাঃ কুমুদশঙ্কর রায়, ক্যাপ্টেন ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, এন, সি, চ্যাটার্জী, নরেন্দ্র দেব ইত্যাদি।

ক্রমে শরৎচন্দ্রের মৃতদেহ নার্সিং হোম থেকে নিয়ে আসা হলো তাঁর ২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ীতে। সেখানে লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠলো। বহু শোকগ্রস্ত মানুষ অশ্রুপূর্ণ নয়নে এই প্রিয় কথাশিল্পীকে শেষবারের মত দেখতে এলেন। ঐ সময়কার এক মর্মস্পর্শী বিবরণ লিখেছেন শরৎচন্দ্রের জনৈক জীবনীকার: '...দেখিতে দেখিতে কলিকাতার চারিদিক হইতে সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শেষ শ্রদ্ধা জানাইবার জন্য শরৎচন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিলেন। মর্মছেঁড়া আকুল শোকের যে ভাষাহীন মূর্তি সেদিন শরৎচন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণে দেখিয়াছি, স্মরণীয় কালের মধ্যে কোন সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সেরকম দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। যিনি সকলের জন্য এতদিন বেদনা বহন করিয়াছেন তাঁহার মৃত্যুতে সেই বেদনাই সকলের হৃদয়ে চিরস্থায়ী হইয়া জাগিয়া রহিল।

'বেলা ৩-১৫ মিনিটের সময় অসংখ্য পুষ্পমাল্যে ও স্তবকে সজ্জিত শবাধারটি লইয়া শোভাযাত্রা বাহির হয়। অশ্বিনী দত্ত রোড, মনোহর পুকুর রোড, ল্যান্সডাউন রোড, এলগিন রোড, আশুতোষ মুখার্জি রোড, হইয়া শোভাযাত্রা কালিঘাট কেওড়াতলা শ্মশানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। এলগিন রোডে সুভাষচন্দ্রের বাড়ি, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ও খালশা স্কুলের শিখ গুরুদ্বারের সম্মুখে শবাধারটি থামাইয়া মাল্যদান করা হয়। শবশোভাযাত্রায় চলিবার সময় সেদিন এক অবিস্মরণীয় দৃশ্য দেখিয়াছি। শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে আমরা ছিলাম অধিকাংশই ছাত্র। যাঁহারাই পথপার্শ্ব হইতে তাঁহাদের প্রিয়তম সাহিত্যিকের অন্তিম যাত্রা দেখিলেন তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে সেই শোভাযাত্রার অংশীভূত হইয়া যাইতে লাগিলেন। চলমান গাড়ি থামাইয়া সাহেবরা টুপি খুলিয়া সম্মান দেখাইতে লাগিলেন সেই দৃশ্যও বারবার চোখে পড়িল। সেদিন শোভাযাত্রীদের মুখে অপরাজেয় কথাশিল্পীর জয়নাদ যেমন ধ্বনিত হইতে লাগিল, তেমনি 'পথের দাবী'র উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা তুলিয়া লইবার জন্য ঘন ঘন সম্মিলিত দাবী উত্থাপিত হইল।'

অমর কথাশিল্পীর শেষকৃত্যের দৃশ্যও ছিল স্মরণীয়। এই প্রসঙ্গে ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যা 'ভারতবর্ষ' লিখেছে :

'আদিগঙ্গার তীরে যেখানে ভারতবর্ষের কয়েকজন বরেণ্য মহাপুরুষের মৃতদেহ অগ্নিশিখায় ভস্মীভূত হইয়াছে, যেখানে চিত্তরঞ্জন, যতীন্দ্রমোহন, আশুতোষ, শাসমল, যতীনদাস প্রভৃতির নশ্বর দেহ লয় প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে শ্রীকান্তের অমর রচয়িতা, চিরদুঃখদরদী, আধুনিক কথা-সাহিত্যের নবজন্মদাতা, দরিদ্রবান্ধব শরৎচন্দ্রের রোগক্লিষ্ট কঙ্কালখানি চিতায় তুলিয়া দেওয়া হইল। শরৎচন্দ্রের সহোদর প্রকাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় শেষকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। সেই চিতাশয্যার চতুর্দিকে মহীশূর উদ্যানে, পথেঘাটে, অদিগঙ্গার ওপারে নদীর তীরভূমিতে সেদিন যে বিপুল জনসমাগম হইয়াছিল তাহা আজ পর্যন্ত ভারতবর্ষের কোনও সাহিত্যিকের মৃত্যুতে ঘটে নাই।...

শীতকালের মলিন সন্ধ্যা, ৫-৪৫ মিনিটে শরৎচন্দ্রের চিতায় অগ্নিপ্রদান করা হয়। প্রকাশচন্দ্র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মুখাগ্নি করেন। উমাপ্রসাদ শবদেহের বস্ত্রগ্রন্থিগুলি মোচন করিয়া দেন। দেখিতে দেখিতে চন্দনকাষ্ঠ সজ্জিত চিতা লেলিহান শিখায় জ্বলিয়া উঠে। যে শিখায় পুড়িয়াছিল দেবদাস, নীরুদিদি, জ্ঞানদার মা, দুর্গাসুন্দরী

সেই শিখায় আধুনিক বাংলার সমাজ বিদ্রোহের মন্ত্রগুরু জ্বলিয়া ভস্মরাশিতে পরিণত হইলেন।'

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে কোলকাতার যেসব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর গৃহে এবং শ্মশানে উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন মেয়র সনৎকুমার রায়চৌধুরী, অনারেবল সত্যেন্দ্র চন্দ্র মিত্র, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, নলিনীরঞ্জন সরকার, জ্যোতির্ময়ী দেবী, জে. সি. গুপ্ত, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, রাজা ক্ষিতীন্দ্রদেব রায়, জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী, কুমার মুনীন্দ্রদেব রায়, কে. আমেদ, মুকুল দে ও তাঁর স্ত্রী, রায় বাহাদুর জলধর সেন, যতীন্দ্রমোহন বাগচী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রভৃতি।

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে অনেক স্বনামধন্য মানুষ এবং প্রতিষ্ঠান আন্তরিক শোক প্রকাশ করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তখন ছিলেন শান্তিনিকেতনে। তিনি শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে শোকাভিভূত হয়ে বললেন, 'যিনি বাঙালীর জীবনের আনন্দ ও বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করিয়াছেন আধুনিক কালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সহিত আমি গভীর মর্মবেদনা অনুভব করিতেছি।'

এর কিছুদিন পরেই কবি তাঁর স্বভাবসুলভ কাব্যিক ভাষায় তাঁর অন্তরের শোক প্রকাশ করেন:

'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে ধরি।'

দেশনেতা সুভাষচন্দ্র শোকাভিভূত হয়ে বললেন, 'করাচীতে অবতরণ করবা মাত্রই আমি ভারতবর্ষের উপন্যাসসম্রাট শরৎচন্দ্রের স্বর্গারোহণের শোকসংবাদ পেলাম।...তাঁর সঙ্গে আমার অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। আমার বেদনা আজ অতি গভীর। তাঁহার মৃত্যুতে আমার ব্যক্তিগত ক্ষতি যে পরিমাণ হইল তাহা কোন দিনই পূর্ণ হইবে না।'

বাংলার গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ-এর প্রাইভেট সেক্রেটারী শরৎচন্দ্রের মাতুল শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে লর্ড ব্রাবোর্ণ-এর শোকবার্তা পত্র মারফৎ পাঠান :

'বরেণ্য সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যুতে মাননীয় গভর্ণর লর্ড ব্রাবোর্ণ মর্মাহত হয়েছেন। তাঁর মৃত্যুতে দেশের ও সাহিত্যের সমূহ ক্ষতি হলো। গভর্ণর বাহাদুরের নির্দেশে আমি আপনাকে এই বার্তা জানালুম।'

ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী বললেন, 'শরৎচন্দ্রের সহিত ব্যক্তিগত পরিচয়ে অনুভব করিয়াছি মানুষের প্রতি প্রেমে এবং পরিচ্ছন্ন ও সরল জীবনের প্রতি একাগ্রতায় তাঁহার হৃদয় পরিপূর্ণ। তাঁহার মরণে দেশের ও সাহিত্যের মহৎ ক্ষতিসাধন হইল। আমি অতিশয় শোকাভিভুত হইয়াছি।

বিখ্যাত দেশনেতা এবং পরবর্তী যুগে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বললেন, 'বঙ্গসাহিত্য ইহার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিককে হারাইল। আধুনিক লেখকগণের মধ্যে তাঁহার পাঠকমহল ছিল সকলের অপেক্ষা বিস্তৃত। কংগ্রেসের ব্যাপারে তিনি অংশগ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার মরণে বাঙ্গলার কংগ্রেস একজন প্রধান সমর্থনকারীকেও হারাইল। বাঙ্গালার সাহিত্যিকগণের ও তাঁহার পরিবারবর্গের এই শোকে আমরা সকলেই শোকার্ত্ত।'

মিঃ সি. এফ. এণ্ড্রুজ বললেন, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত একজন মহিমাময় সাহিত্যিকের মৃত্যুতে সমগ্র বাঙ্গালার যে বেদনা ফুটিয়া উঠিয়াছে, আমার সমবেদনা তাহার সহিত যুক্ত করিলাম। সমগ্র ভারতবর্ষ বাঙ্গালার দুঃখে দুঃখিত।'

তদানীন্তন কালের মাদ্রাজের (আধুনিক নাম তামিলনাড়ু) মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বি গোপাল রেড্ডী বললেন, 'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের অকাল মৃত্যুতে শুধু 'বাঙ্গালা-দেশের বিরাট ক্ষতি হয় নাই, সাহিত্য জগতেরও ক্ষতি হইয়াছে। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালার তথা ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী ঔপন্যাসিক। তিনি বাঙ্গালার উচ্চশিক্ষিত জনগণের ও বাঙ্গালার সরল পল্লীবাসীর সমধিক প্রিয় লোক ছিলেন।...বাঙ্গালার সাহিত্যাকাশ হইতে একটি অত্যুজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক খসিয়া পড়িয়াছে এবং বাঙ্গালার দিক্-

চক্রবাল হইতে এই জ্যোতিষ্কের তিরোধানে প্রত্যেক সাহিত্যিক ও সাহিত্য রসিকগণ অশ্রুপাত করিতেছেন।'

তদানীন্তন কালের বাংলা সরকারের অর্থসচিব এবং স্বাধীনতার পর পশ্চিম-বাংলার অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকার বললেন, 'শরৎচন্দ্রের তিরোধানে আজ বাংলাদেশ শোকে মুহ্যমান। গত কয়েক বৎসর যাবৎ বাঙ্গলার আকাশের যে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক কয়টি নিভিয়া গেল—তাহার স্থান আদৌ পূরণ হইবে কিনা কে জানে?'

জননায়ক শরৎচন্দ্র বসু বললেন, 'বাঙ্গলামায়ের নয়নের মণি হারাইয়া গেল। তিনি ছিলেন উদার, কোমল-হৃদয় ও আবেগময়। তাঁহার অন্তরে ছিল সর্ব-প্রকারের অত্যাচারের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। হৃতসর্ব্বস্ব পদদলিতের জন্য তাঁহার হৃদয়ে ছিল সীমাহীন করুণার স্রোতধারা।'

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালযের বিশিষ্ট অধ্যাপক, প্রবীণ সাহিত্যিক রায়বাহাদুর খগেন্দ্রনাথ মিত্র বললেন ;

'...সত্যের প্রকাশ সাহিত্যে আছে বলিয়াই তাহা চিরদিন সজীব, সবুজ, প্রাণবন্ত থাকে। শরৎচন্দ্রের সাহিত্য-সৃষ্টির মধ্যে এই প্রাণের পরশ পাওয়া যায় বলিয়াই তিনি বরেণ্য। তাঁহার চরিত্রসৃষ্টির মধ্যে, তাঁহার রসানুভূতির মধ্যে যে সত্যরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলার নরনারীকে স্পর্শ করিয়াছে মাতাইয়াছে। এমন দরদী কবি, এমন অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন ঔপন্যাসিক, এমন অপূর্ব রস-স্রষ্টার মৃত্যুতে তাই এত হাহাকার উঠিয়াছে। বাঙ্গালীর অন্তরের অন্তরতম সুধা মন্থন করিয়া তিনি সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, তাই তাহারা তাঁহাকে হৃদয়ের মণিকুটিরে বসাইয়া অর্চনা করিয়াছিল, যেমন অর্চনা হয়ত আর কাহাকেও করে নাই।'

রায়বাহাদুর দীনেশ চন্দ্র সেন, ডি লিট বলেন, 'বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা আজ মনে পড়ে—যেদিন আমি "রামের সুমতি" পাঠ করি, সেদিন এই অজ্ঞাত-কুলশীল লেখকটীর ক্ষুদ্র রচনা পাঠ করিয়া এতটা বিহ্বল হইয়াছিলাম যে, সেই রচনাটীর উপর চার পাঁচ দিন ক্রমাগত অশ্রুপাত করিয়াছিলাম। আমি তখনই বুঝিয়া-ছিলাম এই লেখকের স্থান বঙ্কিমবাবু ও রবিবাবুর পার্শ্বে এবং এই কথা বলিতে কিছু মাত্র কুণ্ঠাবোধ করি নাই। সেই সময়ের ভারতবর্ষে ১৫।১৬ পৃষ্ঠাব্যাপী

শরৎ-প্রতিভা অভিধেয় এক প্রবন্ধ লিখিয়া আমি তাঁহার গল্পগুলি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলাম। তাহার অব্যবহিত পরে তিনি সমগ্র বঙ্গদেশে বিখ্যাত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার নিজগুণেই তিনি দেশ উজ্জ্বল করিয়া যশস্বী হইয়াছেন। আমার গৌরব এই যে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভা-অর্জ্জিত যশের আমি প্রথম প্রচারক হইতে পারিয়াছিলাম।

হায় শরৎ, তোমাকে হারাইয়া আমাদের সাহিত্যের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা অনেকেই জানেন ও সকলেই স্বীকার করিবেন। কিন্তু তুমি যে সুহৃদগণের কত অন্তরঙ্গ ও প্রিয় ছিলে, তাহা অনেকেই জানেন না।'

তদানীন্তন কালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং স্বাধীন ভারতের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বললেন, 'যতদিন বাংলা ভাষা বাঁচিয়া থাকিবে, ততদিন বাঙালীর সুখদুঃখের সাথী শরৎচন্দ্রকে কেহ ভুলিবে না। সাহিত্যজগতে শরৎচন্দ্রের অভ্যুদয় কল্পকথার মতই বিস্ময়কর। বিশ বৎসর পূর্বে বাঙালী তাঁহাব পরিচয় জানিত না। অতি সহসা কিন্তু সহজভাবেই তিনি একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ও অপরাজেয় কথাশিল্পীরূপে বাঙালীর হৃদয় অধিকার করিলেন।'

স্বনামধন্য ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বললেন, 'ভাষার উপর তাঁহার ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা ছিল। বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার কখন কখন দরকার হয় বটে; কিন্তু যে-ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষকে পরিচিত করে সেই ভাষায় তিনি অপরাজেয় ছিলেন। এগুারসন সাহেব বিলাতের টাইমস পত্রিকার দেড় কলম প্রবন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'ছোটবুলী' লেখায় শরৎচন্দ্র সিদ্ধহস্ত ছিলেন। পাঠকের উপর তিনি ইন্দ্রজালের মত প্রভাব বিস্তার করিতেন। শরৎচন্দ্রের লেখা চন্দ্রকিরণের মতই স্নেহশীতল ছিল। তাহার ভিতর মদিরা ছিল না, ঘরের কথার মতই তাহা শীতল ছিল। সেই চন্দ্রকে হারাইয়া আজ বাংলার সাহিত্য-গগন অন্ধকার হইয়া গিয়াছে।'

দার্শনিক সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বললেন, 'তাঁহার কতকগুলি গল্প যাহা মাসিক কাগজে ক্রমশঃ প্রকাশিত হইত—আদি নাই, অন্ত নাই, চরিত্র বিশ্লেষণ জানি না,—তাহার ৩।৪ পৃষ্ঠা পড়িয়াই বলিয়াছি বাংলাসাহিত্যে অমন লেখা দেখি নাই। যেখানে যে কথাটি প্রয়োগ করা আবশ্যক সে কথাটি যদি সেখানে প্রয়োগ

করা হয়, তাহাকে সাহিত্য প্রতিভা বলা হয়। মনের ভাবকে ভাষায় প্রকাশ করার ভঙ্গী দ্বারা কবি হন এবং সাহিত্যিক সাহিত্য রচনা করেন। শরৎচন্দ্রের যদি সমস্ত গ্রন্থ বিলুপ্ত হয়, মাত্র তাঁহার ৩।৪ খানি পাতা থাকে এবং তাহা যদি বাংলা-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ ইতিহাসলেখকের হাতে পড়ে ও তিনি তাহা অন্তর্দৃষ্টি দিয়া দেখেন, তাহা হইলে তিনি অনায়াসে বলিতে পারিবেন লেখক বাংলাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ স্থান পাওয়ার উপযুক্ত।

'কেহ কেহ বলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য সমাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ পথে চালান। আবার কেহ কেহ বলেন রূপ ও আনন্দ সৃষ্টিই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। শরৎচন্দ্র যেভাবে মানুষের প্রেম উপলব্ধি করিতেন সেইভাবে প্রকাশ করিবার সৎসাহস তাঁহার ছিল। নীতিশাস্ত্রবিদ বা ধর্মশাস্ত্রবিদের ন্যায় এক পক্ষে ওকালতি করিবার জন্য তিনি লেখনী ধারণ করেন নাই। জীবনের উপলব্ধিকে প্রকাশ করিবার জন্য ছিল তাঁহার ব্যস্ততা। যেখানে দেখিয়াছেন, স্বচ্ছ প্রাণের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে তাহা পঙ্কিল হইলেও সমাজ বিরোধী হইলেও উহা বলিবার সাহস তাঁহার ছিল। মানুষের কাছে যাহা সত্য হইয়া উঠিয়াছে তাহাকে তিনি রূপ দিয়াছেন, সৃষ্টি করিয়াছেন, রূপে অভিষিক্ত করিয়াছেন—ইহাই শরৎচন্দ্রের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।'

বৈদান্তিক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বললেন, 'কেহ কেহ মনে করেন, শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে কামগন্ধ ছিল। আমি তাহা মনে করি না। তাঁহার রচনার মধ্যে একটা অমোঘতা ছিল—সেইজন্য পড়া শেষ না করিয়া পাঠকেরা তাঁহার উপন্যাস হস্তচ্যুত করিতে রাজী হইতেন না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে ডাক্তার উপাধি দিয়াছেন কিন্তু কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দেয় নাই, কারণ গেঁয়ো যোগী ভিক পায় না। শরৎচন্দ্রের নামের 'চন্দ্র' শব্দে আমি আপত্তি প্রকাশ করি, কারণ চন্দ্রের আলো ধার করা কিন্তু শরৎচন্দ্রের লেখার মধ্যে বিলক্ষণ মৌলিকতা ছিল। তিনি স্বপ্রকাশ। অপরে যে পথে চলেন নাই তিনি সেইপথে চলিয়া সাফল্যলাভ করিয়াছেন।'

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'তিনি দেখাইয়া দেন—আমাদের সঙ্কীর্ণ জীবনে গভীর ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছে। যাহাকে আমরা অত্যন্ত তুচ্ছ ও সামান্য মনে করি সেই তুচ্ছ দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যেও নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাত চলিয়াছে। তাহার ভিতর কত বিচিত্ররূপে কত ছদ্মবেশে প্রেম দেখা দিয়াছে,

তাহা নানারকমে রূপায়িত হইয়াছে। নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ সনাতন ভালবাসার রূপ তিনি দেখাইয়াছেন—যাহা বাংলাসাহিত্যে স্থান পায় নাই তাহাকে তিনি স্থান দিয়াছেন ; ইহার significance সম্বন্ধে আজ বলিতে পারি না। মোট কথা আমাদের উপন্যাস সাহিত্য মুমূর্ষু অবস্থায় আসিয়া পড়িয়াছিল। বিষয় নির্বাচন বা রসসৃষ্টির দিক হইতে তাহার কোন অবসর ছিল না, মুমূর্ষুকে তিনি জীবনদান করিয়াছেন, অবরুদ্ধ ধারাকে স্রোতস্বিনী করিয়াছেন। আমাদের সম্পদকে অনুভব করিবার শক্তি দিয়াছেন। যাহাকে অবজ্ঞা করিয়াছিলাম তাহার মধ্যে কতখানি ভাবসম্পদ আছে প্রকৃত কবির অন্তর্দৃষ্টির সহিত তিনি তাহা দেখাইয়াছেন।'

কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক লিখলেন,

'...তব সতীত্ব অতি অপূর্ব নিধি
তুলনা তোমার নাহি অন্নদা দিদি।...
তোমারে দেখিয়া অবাক হয়েছে বিধি,
তুলনা তোমার নাহি অন্নদা দিদি।'

কবি কালিদাস রায় লিখলেন,

'এই তব মাতৃভূমি। এর সারা অঙ্কটি ব্যাপিয়া
ছিলে তুমি এতদিন।...
হৃদয়ে হৃদয়ে বাঁধা শত পাকে, সহস্র বন্ধনে
নিসর্গে, সংসারে, ভক্ত বন্ধুসঙ্ঘে জাতীয় জীবনে
ছিলে তুমি, একে একে যে বাঁধন ছেদিবারে, আহা
কি যে ব্যথা পেলে তুমি, ভিষকেরা জানিল কি তাহা ?'

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম লিখলেন,

'সেদিন দেখেছি আকাশের শোভা
শরৎচন্দ্র তিলকে।
শূন্য গগন বিষাদ মগন
সে তিলক মুছি দিল কে ॥...
সে চাঁদ কোথায়, কোটি আঁখিদীপ খুঁজিয়া ফিরিছে ত্রিলোকে।
পৃথিবীর চাঁদ অস্ত গিয়াছে, আলো তার প্রতি ভবনে।

তেজ প্রদীপ্ত তেমনি জ্বলিছে, নিভিবে না তাহা পবনে ঃ
ঝরিবে তাহার রসধারা চির-অমরাবতীর শ্রীলোকে।'

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখলেন,—

'...নাম, সে ত' অক্ষরের শুষ্ক শবাধার !
নাম নয়, নয় স্মৃতি নহে পরিচয়—
বাকি যা রহিবে তারা অমূল্য বিস্মৃতি।
রেখে গেলে বীর্যবন্ত কল্পনার বীজ,
তারা কভু হবে না বিফল।'

কবি নরেন্দ্র দেব লিখলেন,—

'মানে নাই কোনো বাধা
সমাজের অমর্যাদা
শিরে বহি সহিয়াছে তীব্র অপমান।
গেয়েছ তাদেরি বন্ধু বেদনার গান।'...

এসব ছাড়া কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ এবং সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় শোক প্রকাশ করলেন কাব্যিক ভাষায়।

শরৎচন্দ্রের মৃত্যুতে বাংলায় এবং বাংলার বাইরে যে সকল প্রতিষ্ঠান শোক-প্রকাশ করেছে তাদের মধ্যে কয়েকটির নাম নিম্নে উদ্ধৃত করছি :

কোলকাতা কর্পোরেশন (পৌরসভা), কোলকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিট্যুট, নিখিল বঙ্গ শিক্ষক সমিতি, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভা, বহরমপুর বন্দীনিবাস, বহরমপুর বয়ন বিদ্যালয়, শান্তি নিকেতন, মহিলা কলেজ, ভারত স্ত্রী শিক্ষাসদন, স্কীণ করপোরেশন, সাহিত্যবাসর, সমাজপতি স্মৃতি সমিতি, সাহিত্যসেবক সমিতি, রবিবাসর, রসচক্র, স্কটিশচার্চ্চ কলেজ, হিন্দুস্থান ইনস্যুরেন্স, সিটি গার্লস হাই স্কুল, মহিমা প্রতিষ্ঠান, ডেণ্টাল কলেজ, টেলর মোসলেম হোস্টেল, ক্যালকাটা একাডেমি, ইভ্‌নিঙ্‌ রিক্রিয়েশন ক্লাব, রেনবো ক্লাব, বিদ্যাসাগর কলেজ, আশুতোষ কলেজ, 'শ্রীহট্ট' কার্য্যালয়, ভারতীয় সংস্কৃতি সমিতি, মনিপুর সম্মিলনী, শিবপুর দীনবন্ধু ইনস্টিট্যুসন, বালী ওয়েলিংটন ক্লাব, পাটনা প্রভাতী সঙ্ঘ, দেবানন্দপুর শরৎচন্দ্র পল্লীপাঠাগার, বঙ্গীয় প্রদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতি, নদীয়া গ্রন্থাগার সভা, রাজবাড়ী ব্যবহারজীব সভা, বহরমপুর আইনব্যবসায়ী সভা, বেলতলা গার্লস স্কুল ইত্যাদি।

টুকরো কথা

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র তাঁর জীবদ্দশায় দু'টি উপন্যাস পুস্তকাকারে প্রকাশিত অবস্থায় দেখে যেতে পারেন নি। তার আগেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করে যান। এই দু'টির মধ্যে একটি হচ্ছে 'শুভদা' আর একটি 'শেষের পরিচয়।'

'শুভদা' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৩৪৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন তারিখে। এটি তাঁর প্রথম বয়সের রচনা। তাই এতে কাঁচা অভিজ্ঞতার ছাপ পরিস্ফুট। মাত্র ২২ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র এটি রচনা করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, পরবর্তী কালে এটিকে পরিমার্জিত করে প্রকাশ করবেন। তিনি ওকাজে হাতও দেন কিন্তু দু'তিন পাতায় দু' একটি কথা বদলানো ছাড়া অন্য কিছু করতে পারেন নি। তবে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হোক এমন ইচ্ছে তাঁর ছিল না। কেননা প্রথম বয়সের অধিকাংশ রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশ হওয়ার বিপক্ষে তিনি মত পোষণ করতেন। এমন কি এই উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে ফেলার জন্যে তিনি তাঁর বড়দি অনিলাদেবীর জায়ের ছেলে হোঁদলকে নির্দেশও দেন। কিন্তু হোঁদল সে কাজ করে নি। সে ওটিকে লুকিয়ে রেখেছিল। পরে শরৎচন্দ্র হোঁদলের কাজ দেখেশুনে অবাক হয়ে যান। তারপর তিনি আর ওটিকে পোড়ানোর কথা বলেন নি। উক্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের পারিবারিক জীবনের ছাপ পড়েছে। ভবঘুরে ও উদাসীন হারাণ মুখুজ্জের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পিতা মতিলালের কিছু মিল পাওয়া যায়। আবার শুভদার সঙ্গে শরৎচন্দ্রের আদর্শবাদিনী মাতা ভুবন মোহিনীর চরিত্র তুলনা করা চলে।

শরৎচন্দ্রের 'শেষের পরিচয়' উপন্যাসটি ভারতবর্ষে ১৩৩৯ সালের আষাঢ়, আশ্বিন, অগ্রহায়ণ, ও ফাল্গুন, চৈত্র, ১৩৪০ সালের বৈশাখ, আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ, ১৩৪১ সালের আষাঢ়-শ্রাবণ, কার্তিক ও ফাল্গুন এবং ১৩৪২ সালের বৈশাখ সংখ্যাগুলিতে প্রকাশিত হয়। শরৎচন্দ্র উক্ত উপন্যাসের মাত্র ১৫টি পরিচ্ছেদ লিখে যান। বাকি ১১টি পরিচ্ছেদ লেখেন তাঁরই স্নেহধন্যা বিশিষ্ট মহিলা কবি এবং সাহিত্যিক রাধারাণীদেবী। তবে শেষাংশ অন্য জনের দ্বারা রচিত হলেও উক্ত উপন্যাসে শরৎচন্দ্র-প্রবর্তিত ভাবাদর্শ বিন্দুমাত্র হোঁচট খেয়েছে বলে মনে হয় না।

'শেষের পরিচয়' হচ্ছে শরৎচন্দ্রের অনবদ্য সৃষ্টি। এই উপন্যাসের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের লেখা অন্য কোন উপন্যাসের মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই উপন্যাস প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার এবং শরৎসাহিত্যের গবেষক ডঃ অজিত কুমার ঘোষ লিখেছেন: 'কুলত্যাগ করিয়া আসিয়া অপর পুরুষের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে থাকিয়াও পূর্বতন স্বামী ও কন্যার জন্য অস্থির আকর্ষণবোধ করা এবং তাহাদের সঙ্গে একটি স্বাভাবিক ও নিঃসঙ্কোচ সম্বন্ধ বজায় রাখা, এ-ধরণের নারীচরিত্র শরৎসাহিত্যেও অভিনব বটে।'···

•

মনীষী লেখক ও কবিদের রচনাই যুগে যুগে ক্লাসিক পর্যায়ী হয়ে ওঠে এবং তা বহুকাল যাবৎ বিদগ্ধজন, পাঠকমহল এবং সাহিত্যিকদের কাছে অনুপ্রেরণা, শান্তি, জ্ঞান ও তৃপ্তির উৎস হয়ে ওঠে। আগেকার দিনের মনীষী লেখক ও কবি ব্যাস-বাল্মিকীর রচনাবলী যেমন একালের বহু মনীষী লেখক ও কবির রচনায় প্রেরণা ও প্রভাব বিস্তার করেছে তেমনি একালের অনেক মনীষী লেখক ও কবি যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, চার্লস্ ডিকেন্স, ম্যাকসিম গোর্কির রচনাবলী হতে প্রেরণা ও প্রভাব এসেছে মনীষী লেখক শরৎসাহিত্যে। শরৎচন্দ্র তো রবীন্দ্রনাথকে মহর্ষি ব্যাসদেবের সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং তাঁকে সাহিত্যগুরু রূপে বরণ করেছেন। আবার বর্তমানকালের অনেক কথাশিল্পী, লেখক ও কবি শরৎসাহিত্যের প্রভাবের দ্বারা চালিত হয়েছেন। তাঁরা শরৎচন্দ্রের অসামান্য এবং কালজয়ী প্রতিভার কাছে ঋণী। এই প্রসঙ্গে শরৎসাহিত্যের অন্যতম ব্যাখ্যাকার ডঃ অজিত কুমার ঘোষ যা লিখেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করছি :

'শরৎচন্দ্রের পরে বাংলাসাহিত্য শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই চলিয়াছে। কল্লোল যুগের সাহিত্যিকরা অনাবৃত ও নিষিদ্ধ জীবনের বর্ণনা করিবার সাহস পাইয়াছিলেন শরৎচন্দ্রের কাছেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র ও শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত মানুষের প্রতি যে সহানুভূতি বোধ করিয়াছেন তাহার দীক্ষা শরৎচন্দ্রের কাছেই লাভ করিয়াছিলেন। পল্লীজীবনের কোমল মাধুর্যের প্রতি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে প্রীতি তাহা শরৎসাহিত্যের দ্বারা হয়তো কিছুটা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে সমাজবিদ্রোহের যে প্রজ্বলিত শিখা দেখিতে পাই তাহা শরৎসাহিত্য হইতেই অগ্নিস্পর্শ লাভ করিয়াছিল বলা যায়। মনোজ বসুর গল্পে যে স্নিগ্ধ কমনীয়তা রহিয়াছে তাহাও বোধ হয় কিছুটা প্রেরণা পাইয়াছে শরৎসাহিত্য হইতে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা বর্ণনা করিয়া তিনি 'আমার সাহিত্য জীবনে' বলিয়াছেন, 'এর আগে শরৎচন্দ্রের পল্লীজীবন নিয়ে লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রমা, অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী, সাবিত্রীর জীবনের ব্যর্থতায় বেদনাহত হয়েছি, এবং দেখেছি সমাজ সর্বত্র দাঁড়িয়ে আছে ত্রিভুজের এক কোণে, বিপুল তার শক্তি, কঠিন তার আক্রোশ।' শ্রদ্ধেয় সমালোচক ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র মধ্যে বলিয়াছেন, 'এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, শরৎচন্দ্রই আমাদের ভবিষ্যৎ উপন্যাসের গতিনিয়ামক হইবেন।' এ-উক্তি সত্য প্রমাণিত হইয়াছে। আধুনিক কথাসাহিত্যের লেখকরা জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে 'শরৎচন্দ্রের নির্দেশিত পথে চলিয়াই উপন্যাসের নব নব সম্ভাবনার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতেছেন।'

শরৎসাহিত্যে পুরুষদের তুলনায় নারীদের এত প্রাধান্য রয়েছে কেন? তবে কি নারীজাতির প্রতি শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক হৃদয়দৌর্বল্য ছিল? না, ঠিক তা নয়। নারীদের প্রতি শরৎচন্দ্রের অন্তরে ছিল সাগরসমান অসীম দরদ ও অকৃত্রিম সহানুভূতি। নারী যে সমাজ ও সংসারের অঙ্গস্বরূপ এ কথা কথাশিল্পী কখনো বিস্মৃত হন নি। সংসার নারী-পুরুষ উভয়কে নিয়েই গঠিত। বৈদিক যুগে নারীর মর্য্যাদা রক্ষিত হয়েছে। কিন্তু একালে আমাদের পুরুষশাসিত সমাজে নারীর মর্য্যাদা ধুলায় লুটিয়েছিল বলেই আমাদের দুর্দশার সীমা-পরিসীমা নেই। নারী পরাধীন ছিল বলেই আজ দেশ ও সমাজের চারদিকে নেমে এসেছে সর্বগ্রাসী অন্ধকার। এক পাখায় পাখীর উত্থান সম্ভব নয়। পাখীকে উড়তে গেলে দুটো পাখারই দরকার হয়। তেমনি সমাজরূপ পাখীকে উড়তে হলে নারী ও পুরুষরূপ দুই পাখা বা ডানার প্রয়োজন হয়। এই বৈদিক সত্যটুকু বুঝেছিলেন যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণ এবং তাঁর যোগ্যতম ও প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। তাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর নিজের সহধর্মিনী সারদাদেবীকে স্বয়ং জগজ্জননীরূপে পূজো করলেন যাতে করে তাঁর দেখাদেখি এদেশের মানুষ ঘরে ঘরে শক্তির বা নারীজাতির সম্মান রাখতে ব্রতী হয়। তাঁর মত স্বামী বিবেকানন্দ নারীজাগরণের মন্ত্র দেশবিদেশে ঘোষণা করলেন। তিনি এদেশের পতিত ও নির্য্যাতিত নারীশক্তিকে পুনরায় বৈদিক যুগকালীন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবার জন্যে নিয়ে এলেন বিদেশ থেকে ম্যাকলাউড, মার্গারেট (ভগিনী নিবেদিতা) প্রমুখ একাধিক তেজস্বিনী নারীকে। তাঁরা এসে এদেশের নারীদের সামনে তুলে ধরলেন

অপূর্ব এক আদর্শ—নারী অভ্যুত্থানের অমোঘ মন্ত্র। সেই মন্ত্রের শক্তি মূলত এসেছে শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ধারা হতে। ঐ ধারায় অবগাহন করেছেন আমাদের কথা-শিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ যখন দেহত্যাগ করেন তখন শরৎচন্দ্র ছিলেন কিশোর। সুতরাং তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ যুগেরই মানুষ—মহীয়সী ভারতমাতার অন্যতম কৃতী সন্তান। এই কৃতী সন্তানের অমর লেখনীর মাধ্যমে ভারতমাতা লিখিয়েছেন তাঁর অবলা ও নির্যাতিতা কন্যাদের অপূর্ব দুঃখ-কাহিনী। এর পেছনে রয়েছে ভারতমাতার অমোঘ ইঙ্গিত এবং যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পরোক্ষ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ প্রভাব। শরৎচন্দ্রও স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শের আলোকে সম্পূর্ণভাবে বুঝেছিলেন যে এদেশের উন্নতি করতে হলে পুরুষদের মত নারীকেও জাগতে হবে—এগিয়ে আসতে হবে। অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে কেবল কান্নাকাটি করলে চলবে না। তাদেরকে জাগতে হবে। সমাজ এবং সংসারে পুরুষদের সঙ্গে সমানে পা ফেলে চলতে হবে। সেখানে থাকবে না অস্বাভাবিক ভীরুতা এবং অন্যায় রকম লজ্জা। এই নারী জাগরণের পরিপেক্ষিতেই কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র আমাদের সংসারে দুর্বল, অবলা ও অশিক্ষিতা নারীদের অসীম ও অনন্ত দুঃখের কথা সুনিপুণ ও সুকৌশল ভাবে লিখে রেখে গেছেন যাতে করে ভাবীকালে এদেশের সত্যিকার নারী জাগরণ হয় এবং তার সুফল ভোগ করবে এদেশের সংসার এবং সমাজ। বোধকরি সেদিনে তাঁর সেই স্বপ্ন সার্থক ও সত্য হয়ে উঠেছে আধুনিক কালে। শরৎচন্দ্র ছিলেন মঙ্গলদূত। সমাজের মঙ্গলের দিকে তাকিয়েই সমাজের অন্যতম অঙ্গ নারীজাতির সুখদুঃখের প্রতি উদাসীন থাকতে পারেন নি। তাঁর সাহিত্যসাধনা ছিল না নিছক বিলাসদ্রব্য বা অবসর বিনোদনের অঙ্গ, ছিল সত্যকার প্রাণের বস্তু যা দিয়ে তিনি পরোক্ষভাবে দেশ মাতৃকারই মহান সেবায় ব্রতী হয়েছিলেন। সুতরাং যাঁরা বলেন নারীজাতির প্রতি শরৎচন্দ্রের স্বাভাবিক দুর্বলতা ছিল; তাঁরা ভুল করেন। বরং বলা উচিত, নারীজাতির প্রতি তাঁর ছিল অসীম শ্রদ্ধা মাতৃরূপিনী মহাশক্তিস্বরূপিনী বলে আরাধনা করবার অসীম আকাঙ্খা। তাই তো দেখি তিনি তাঁর সাহিত্যে একজন পরম সাধিকাকে যে স্থান দিয়েছেন একজন নীচ ও পতিতাকেও সেই স্থান দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করেন নি।

শরৎচন্দ্রের কাছে সামতাবেড় ছিল বড় সাধের জায়গা। ওখানকার সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ বিশেষ করে রূপনারায়ণ নদের শোভা তাঁর মন-প্রাণকে

আনন্দে ভরিয়ে তুলতো। তিনি ছিলেন জনগণের অকৃত্রিম ও দরদী বান্ধব। কথাসাহিত্যের ছত্রে ছত্রে তিনি জনগণের সুখদুঃখের কথা যেমন অপরূপ দরদী ও সহানুভূতিময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন তেমনি করেছেন নিজের দৈনন্দিন জীবনসূচীতে অসহায় জনগণের সেবা-পরিচর্যায়। তিনি যখন সামতাবেড়ের মাটির কুটিরে আশ্রয় নেন তখন আশপাশের গ্রাম হতে কত দরিদ্র নর-নারী তাঁর ভিটেয় আসতো। তিনি তাদের বিমুখ করতেন না। কখনো পয়সা, কখনো চাল ইত্যাদি দিয়ে তাদের পরিতৃপ্ত করতেন।

এসব ছাড়াও দরদী শরৎচন্দ্র অন্যভাবে জনগণের সেবা করতেন। এই প্রসঙ্গে লেখক বীরেন্দ্র দত্ত 'মিলন মেলা' পত্রিকায় যে কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ এখানে পাঠকবর্গের চোখের সামনে তুলে ধরছি। তিনি লিখেছেন :

'আমার মা ও পিসিমা স্বাস্থ্যের কারণে সে সময়ে রূপনারায়ণের ধারে বেড়াতে যেতেন ভোরবেলা। এবং প্রায় প্রতিদিনই। রূপনারায়ণ তখন শরৎচন্দ্রের বাড়ীর কোলঘেঁষে উত্তাল। কখনো চর পড়ায় জল সরে যায়, কখনো বন্যায় টাইটুম্বুর উথাল-পাতাল। সারা গোবিন্দপুর গ্রামের প্রান্ত বরাবর এবং পানিত্রাস সামতাবেড়ের তীরে বেড়াবার ভাল জায়গা শরৎচন্দ্রের বাড়ীর সামনের ঘেরা বাগানের বাইরের খোলা জায়গা—শরৎচন্দ্র যে ঘরে বসে লিখতেন তার সামনেই।

একদিন ভোরে মা-পিসিমা বেড়াচ্ছেন, এমন সময় লেখার ঘর থেকে বেড়িয়ে এলেন শরৎচন্দ্র। পিসিমাকে শরৎচন্দ্র একটু চিনতেন আমার বাবা শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দত্তের বোন হিসেবে। দালানে দাঁড়িয়ে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কে গো, তোমরা বেড়াতে এসেছ ?

পিসিমা হাসতে হাসতে বললেন, 'হ্যাঁ।'

'সঙ্গে কে ? পুলিনের বউ ?'

পিসিমা যথারীতি ঘাড় নেড়ে 'হ্যাঁ'-ই বললেন। তখনকার দিনে গ্রামের বউ হিসেবে মায়ের মাথায় বড় ঘোমটা।

শরৎবাবু বললেন, 'তোমরা ওদিকে কোথায় যাচ্ছ ?'

'বাড়ী ফিরছি।'

'কিন্তু মা, ওদিকে তো রাস্তা খারাপ, যেতে পারবে ?'

'কেন আমরা তো ওদিক দিয়েই যাই !'

'তবু খাল পড়েছে। রাস্তা ভেঙ্গে গেছে। কখন জল থাকে। তোমাদের যেতে খুবই অসুবিধে হবে।' বলতে বলতে শরৎবাবু মা-পিসিমার পিছনে চলে এসেছেন।

'পিসিমা বললেন, 'তাহোক, তবু কোন রকমে চলে যাব না, হলে এতটা ঘুরতে হয়।' বলে স্বাভাবিক লজ্জায় মা-পিসিমা সেই ভাঙা খালের পথে গোবিন্দপুরের পাড় ধরেই এগোতে লাগলেন।

'শরৎবাবুও পিছনে আসছেন। খালের সামনে এসে পিসিমা দেখেন সত্যি রাস্তা খারাপ, ভাঙা। যেতে খুবই কষ্ট। শরৎবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। পিসিমা আমার মাকে সঙ্গে নিয়ে অতি কষ্টে খালটা পেরোলেন। মা-পিসিমা খাল পেরিয়ে অদৃশ্য না হওয়া পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্র দাঁড়িয়ে রইলেন। দেখলেন খালটাকে। বন্যায় মাটি ভেঙ্গে রাস্তা একেবারে চলার অনুপযোগী হয়ে গেছে। যে কোন মুহূর্তে পথচারীদের বিপদ হতে পারে।

'পরের দিন যথারীতি ভোরে ফেরার পথে শরৎবাবু দেখতে পান আমার মা-পিসিমাদের। মা-পিসিমা দাঁড়িয়ে ইতস্তত করছেন কালকের সেই খারাপ পথ ধরে ফিরবেন কিনা ভেবে। শরৎবাবু পেরিয়ে এসে ওঁদের সামনে দাঁড়ালেন, 'তোমরা বাড়ি ফিরবে তো?'

'হ্যাঁ, ভাবছি ওদিকে যাবো কিনা।'

'না, না যাও ওদিকের রাস্তা ঠিক করে দিয়েছি।'

'পিসিমা-মা দুজনেই অবাক। কি করে ঠিক হল। তবু শরৎবাবু বলায় ওঁরা সেই পথেই এগোলেন। এসে দেখেন, ভাঙা রাস্তায় চমৎকার করে, সযত্নে, শক্ত করে মাটী ফেলে সাঁকো করা আছে। যাওয়ার আর কোন অসুবিধেই নেই। ওঁরা অবাক ও খুশী হয়ে পিছন ফিরতেই দেখেন শরৎবাবু দাঁড়িয়ে হাসছেন।'

সামতাবেড়ের জীবন যে কত সুখ ও শান্তিতে ভরপুর ছিল তা প্রকাশিত হয়েছে শরৎচন্দ্রের লেখা একাধিক চিঠিপত্রে। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই জুন তারিখের এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'এদের ফেলে আমার কোলকাতায় যেতে ইচ্ছা হয় না। এরা যে কি রকম গরীব, তা' তোমরা শহর থেকে কিছুতেই ধারনা করতে পারবে না। আর কি জান, দুঃখ জিনিসটা এমনি যে জীবন দিয়ে তাকে উপলব্ধি না করলে, কোনদিন তার সত্য রূপটা ধরা পড়ে না। এদের দেখলে আমার নিজের গোড়ার জীবনটা যেন ছবির মত আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে...'

১৩৩৮ সালের ৩০শে বৈশাখ-এর এক পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, 'শ্রাবণের ঘন মেঘে চারিদিক আচ্ছন্ন হইয়া আসে, কর্দ্দমাক্ত জনহীন গ্রাম্য পথ নিতান্ত দুর্গম। নিবিড় অন্ধকার ভারের মত বুকের পরে চাপিয়া বসে…। আবার কোনও দিন ক্ষান্ত বর্ষণ আকাশে লঘু মেঘের ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো দেখা যায়। বর্ষার সুবিস্তীর্ণ নদী-জলে মলিন জ্যোৎস্না ছড়াইয়া পড়ে। আমি তখন প্রাঙ্গণের একান্তে নদীতটে আরাম কেদারায় চোখ বুজিয়া বসি…।

১৩৪২ সালের ২৮শে মাঘ-এর এক পত্রে লিখেছেন শরৎচন্দ্র, 'পাড়াগাঁয়ের মাটির বাড়ী আর রূপনারায়ণ নদ,—এদের মায়া কাটিয়ে আমি বেশী দিন কোথাও থাকতে পারিনে। তবে এও সত্যি এদের মায়া কাটিয়ে যাবারও বেশী দিন বাকী নেই। পুরানো বন্ধুবান্ধব অনেকেই এগিয়ে গেছেন।'

আবার ১৩৪৩ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখের আর একটি পত্রে শরৎচন্দ্র লিখেছেন, '…ইচ্ছে হয় না যে কলকাতায় থাকি, কিন্তু একলা ত কেউ ছেড়ে দেবে না।… কতদিন যে বাড়ীতে (সামতাবেড়) গিয়ে উপস্থিত হ'তে পারবো— এ ভাবনা নিত্যি ভাবি সেজকত্তা! ক'লকাতা আমার একেবারে ভাল লাগে না।'…

এই প্রিয় সামতাবেড়েতে শরৎচন্দ্রের বাড়ীর কাছে এবছর অর্থাৎ ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শরৎমেলার আয়োজন করা হয়। এই মেলা শুরু হয় ২৫শে জানুয়ারী এবং শেষ হয় ২৭শে-জানুয়ারী। এই মেলার উদ্যোক্তা হলেন শরৎ-স্মৃতি গ্রন্থাগার, শরৎ-মেলা পরিচালন সমিতি ও শরৎচন্দ্র জন্ম শতবর্ষপূর্তি বৎসর সমিতি (পানিত্রাস শাখা) উক্ত মেলার প্রথম দিনকার অনুষ্ঠানসূচী নিম্নে উদ্ধৃত করছি,—

২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫

সকাল ১০টায় উদ্বোধন :—

উদ্বোধক :—শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ (সম্পাদক, অমৃতবাজার পত্রিকা)

সভাপতি :—শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় (শিক্ষামন্ত্রী, পঃ বঃ সঃ)

ভুবনমোহিনী মঞ্চ :—

বিকাল ২টা থেকে ৫টা ৪৫মিঃ (নাট্যশাখার আসর)

সভাপতি :—অজিত কুমার ঘোষ।

আলোচক—ডঃ ক্ষেত্রগুপ্ত, দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, বিভূতি দাস, প্রবোধচন্দ্র সাহু, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক নিত্যানন্দ দে, মদনমোহন গরাই।

হিরন্ময়ী মঞ্চ :—বিকাল ৪টা থেকে ৫টা ৩০মি:

আঞ্চলিক লোকগীতি—পরিবেশন—পূরবী মিউজিক কলেজ।

পরিচালনায়—বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

৬টা থেকে ৮টা লোকগীতি—পূর্ণচন্দ্র দাস ও সম্প্রদায় (কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ দপ্তরের সৌজন্যে)

৮-১৫মি: থেকে ৯-১৫ মি:—

একটি প্রতীকের মৃত্যু (নাটক)—অংশ গ্রহণে 'অনিকেত' গোষ্ঠী।

৯-৩০ মি: থেকে ১১টা—

পাথর ভাঙা কান্না (নাটক)—অংশগ্রহণে 'ধূমকেতু'।

এই শরৎ-মেলা প্রসঙ্গে যুগান্তরের সংবাদদাতা গত ইং ৪।২।৭৫ তারিখের সংবাদপত্রে একটি নাতিদীর্ঘ সংবাদ পরিবেশন করেছেন। তার অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'মাত্র তিন বছর বয়সেই তাও কলকাতার নয় গ্রাম বাংলার একটি সাংস্কৃতিক মেলা সারা বাংলাদেশে রীতিমত পরিচিত হয়ে ওঠাটা বেশ এলেমদার ব্যাপারই বটে। তাই হয়ে উঠেছে হাওড়া জেলায় পানিত্রাসের শরৎ-মেলা। নইলে মেলার তিনটে দিনে ৫০ হাজারের মত মানুষেই বা কেন এ মেলায় আসবেন। স্থানীয় বিভিন্ন অঞ্চল বাকসি কল্যাণপুর ওয়াফুলির চাষীবাসী পরিবারের অসংখ্য মানুষও যেমন এসেছেন তেমনি কলকাতা ও বিভিন্ন জেলা থেকে দলে দলে শিল্পী সাহিত্যিক সাধারণ মানুষ এসেছিলেন। এদের যাতায়াতের জন্যে দ: পূ: রেল কর্তৃপক্ষ তিনদিনই হাওড়া থেকে দেউলটি পর্যন্ত 'শরৎমেলা স্পেশ্যাল' ট্রেনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সরকারী বেসরকারী আরও অনেক তরফই সাহায্যের হাত না বাড়িয়ে থাকতে পারেন নি।

'আর পাঁচটা জেলার মত এখানেও হরেক চিজের দোকান পাঠ বসেছে। বসেছে যাত্রা থিয়েটার চলচ্চিত্র ও বাউল গানের আসর। মেলায় আগতরা যেমন দোকান পাটে ভিড় করেছেন কি অনেক রাত পর্যন্ত খোলা আকাশের নীচে দাঁড়িয়ে যাত্রা থিয়েটার দেখেছেন ঠিক তেমনি দেখেছেন সন্ধ্যে থেকে লাইন দিয়ে 'অত্যুৎসাহী' বাগনান ১নং ব্লক যুব কেন্দ্র প্রভৃতি গোষ্ঠীর চারুকারু শিল্পের প্রদর্শনীগুলিও। চলমান সাহিত্যের স্টলেও অনেকে ভিড় করেছেন।

'বসেছিল সাহিত্যপাঠ ও আলোচনার আসরও। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে ও দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ উজ্জ্বল মজুমদার প্রমুখের আলোচনায়

প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল কথাসাহিত্যের আসরটি। মনীন্দ্র রায়ের সভাপতিত্বে বসেছিল কবিতা পাঠের আসর। আকর্ষণীয় মেজাজ নিয়ে কবিতা পড়লেন গৌরাঙ্গ ভৌমিক, ধ্রুব মুখোপাধ্যায়, অমিতাভ দাশগুপ্ত প্রমুখ কবিরা। আরও বসেছিল নাট্যশাখা ও শিল্পসাহিত্যের আসরও। কি স্থানীয় কি বেস্থানীয় সাধারণ মানুষেরা উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় হাজির ছিলেন প্রতিটা আসরেই। শুধু হাজির থাকাই নয়। আগ্রহ নিয়ে সবকিছু শুনেছেনও।'...

মেলার দ্বিতীয় দিনে অর্থাৎ সাধারণতন্ত্র দিবসে আমি গেছলুম পানিত্রাসে। দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ পৌঁছলুম দেউলটি রেলওয়ে স্টেশনে। দেখলুম স্টেশনে যাত্রীদের বেশ ভিড়। সকলেই চলেছেন পানিত্রাসে 'শরৎ মেলা' দেখতে। এই মেলার জন্যে স্পেশাল ট্রেন দেওয়া হয়েছে। তেমনি করা হয়েছে স্টেশনসংলগ্ন বড় পীচ রাস্তা থেকে পানিত্রাস পর্যন্ত বাসের ব্যবস্থা। বহু যাত্রী ঐ বাসে চেপে যাতায়াত করছেন। একজনের একপিঠের ভাড়া হচ্ছে বিশ পয়সা।

মেলাটি জমেছে ভাল। একদিকে দেখলুম শরৎচন্দ্রের বিখ্যাত কয়েকটি গল্পের (অভাগীর স্বর্গ, রামের সুমতি, মহেশ ইত্যাদি) চরিত্রগুলি মাটির তৈরী পুতুলের সাহায্যে জীবন্ত রূপ দেওয়া হয়েছে। দর্শকরা সেগুলি অত্যন্ত ঔৎসুক্য ও প্রশংসাভরা দৃষ্টি নিয়ে দেখছে। অন্যদিকে রয়েছে শরৎচন্দ্রের লেখা ডায়েরী (রোজনামচা) এবং কয়েকটি পত্রের পাণ্ডুলিপি। এছাড়া উক্ত মেলায় স্বামী বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনের বিচিত্র কর্মধারার মডেল দেখানো হয়েছে। সেটাও কম আকর্ষনীয় নয়। আর একপাশে মেয়েদের তৈরী নানারকম সেলাইয়ের পোষাক-পরিচ্ছদ, তোয়ালে, বালিশের ঢাকা ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। শিল্পীর আঁকা কয়েকটি চিত্রও দেখলুম। সেই সঙ্গে দেখলুম প্রাচীন যুগের কতকগুলি ভাস্কর্য্য শিল্প। মেলার আর একদিকে দেখলুম সারি সারি তেলেভাজা, মুড়ি, চা ও মিস্টির দোকান। সেখানেও যাত্রীদের ভীড় কম ছিল না।

শতবর্ষের পুরোনো পাণিত্রাস হাইস্কুলের সামনেই এই মেলার আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত স্কুলের একতলায় চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন দেখে খুশী হয়েছি। আর তিন তলায় বসেছে প্রোগ্রামমত বিচিত্র অনুষ্ঠান।

যাত্রীদের থাকাখাওয়ার আয়োজনও মন্দ হয় নি। স্কুলসংলগ্ন একটি ছোট একতলা পাকা বাড়ীতে ডেলিগেট এবং সাধারণ যাত্রীদের (যাঁরা থাকতে বা খেতে চান) থাকা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মোট কথা মফঃস্বলে এখনকার এই দুর্মূল্যের বাজারে এইরকম একটা মেলার আয়োজন সত্যিই উদ্যোক্তাদের বাহাদুরী বলতে হবে।

মেলায় শরৎচন্দ্রকে একাধিকবার দেখেছেন বা তাঁর সঙ্গে মিশেছেন এমন দু'একজন বৃদ্ধের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারলুম, শরৎচন্দ্র নাকি শেষ বয়সে তাঁর জন্মস্থান দেবানন্দপুরে যাবার বাসনা করেছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, 'দেবানন্দপুর আমায় ডাকছে। তামতাবেড় আমার আর ভাল লাগছে না।'

আর একজন বললেন, 'ও! শরৎচন্দ্র কি দিলদরিয়া মেজাজের লোকই না ছিলেন। উনি বেঁচে থাকতে যদি কেউ ওঁর বাড়ীতে আসতেন তাকে পুকুরের ধরা মাছের ঝোল আর চাষের ধানের ভাত খেতে দিতেন।'

এরকম আরও অনেকের মুখে শরৎ প্রসঙ্গ শুনেছি। বেশীর ভাগ মানুষই শরৎসাহিত্য প্রসঙ্গে নানাপ্রকার মন্তব্য করলেন। বিশেষ করে মেয়েরা শরৎচন্দ্রের প্রশংসায় যেন পঞ্চমুখ। কারণ শরৎচন্দ্র আসলে জনদরদী হলেও বাংলার অবহেলিত নারীসমাজের প্রতি তাঁর দরদ ছিল অসীম। তিনি তাঁর সাহিত্যে নারীসমাজের যে তুলনাহীন চিত্র এঁকেছেন তা কোনকালে কোন নারীর কাছে অমর্য্যাদা পাবে না। তাঁর লেখনী কালজয়ী, শাশ্বত ও সনাতন। অনেকে হয়তো বলবেন, শরৎচন্দ্র যে সময়ে তাঁর সাহিত্যে অবহেলিত নারীকে স্থান দিয়েছেন সে যুগ এখন আর নেই। এখন নারী নিজেদের প্রতিষ্ঠা করছে সমাজে। পুরুষের মতই তার পুরুষশাসিত সমাজে সমান অধিকার। অনেক নারী পুরুষের মত কাজ করছে। সে সংসারের হাল ধরে আছে।

ওঁদের কথা ও যুক্তি মেনে নিলেও আমি বলতে বাধ্য হবো যে নারীশিক্ষার প্রসার হলেও সমাজের আনাচে-কানাচে এখনো অনেক বঞ্চিতা ও অশিক্ষিতা নারী রয়ে গেছে। তাদের সংখ্যা অনেক। এমনকি অশিক্ষিত পুরুষদের তুলনায় বেশী। তারা অশিক্ষিতা বলে সমাজে আজকাল বিশেষ স্থান অধিকারে বঞ্চিতা। এমন কি বিবাহব্যাপারেও তারা অবহেলিতা।

আবার অনেক নারী লেখাপড়া শিখেও সমাজ-সংসারে নিজের মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠালাভ করতে পারছে না। বিবাহের সময় তাদের পিতা যৌতুক দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করলে বরপক্ষ বেঁকে বসেন। সুতরাং তাদের আর বিবাহ হয় না। অনূঢ়া অবস্থায় তাদের সারাটা জীবন কাটাতে হয়। তবে হ্যাঁ তারা

চাকরী করতে পারে বলে স্বাবলম্বিনী থাকতে পারে। তাহলেও তারা একেবারে সমস্যা বা দুঃখমুক্ত হতে পারে না।

সুতরাং নারীসমাজের দুঃখদুর্দশা কোথায় আর গেছে। সেই আগের মত অমন ভয়াবহ আকারে না থাকলেও বেশ খানিকটা আছে যা এখনও সমাজ ও সংসারের পক্ষে হানিকর এবং দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মতামতেয় অনুসারী। এখন যদি শরৎচন্দ্র জীবিত থাকতেন তাহলে এদের নিয়ে আবার অন্য রকম সমস্যাপূর্ণ সাহিত্য রচনা করতেন। সুতরাং এদিক দিয়ে বিচার করলে শরৎপ্রতিভা কালোত্তীর্ণ। সে যুগ যুগ ধরে বেঁচে থাকার শক্তি অর্জন করেছে। এই সেদিন কোলকাতা শহরে বসে লক্ষ্য করেছি অসহায়া ও অবলা স্ত্রীর ওপর ক্রোধোন্মত্ত ও কাণ্ডজ্ঞানহীন স্বামীকে দানবসুলভ নির্মম ও অমানবিক ব্যবহার করতে।

কোলকাতা শহর ও শহরতলীর পতিতালয়ে নারীদেহ নিয়ে ফলাও করে ব্যবসা চলছে। এছাড়া অনেক অপ্রকাশ্য স্থানেও এই কাজ পূর্ণমাত্রায় চলেছে। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল ও মে মাসের যুগান্তর পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় খবরে প্রকাশ যে সুন্দরী নারী নিয়ে এক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক নারী ব্যবসা সমিতির যোগসাজসে গোপন পথে কোলকাতা ও ভারতের বিভিন্ন শহর থেকে বিদেশে নারী পাচার হচ্ছে।

সুতরাং শরৎসাহিত্য ও শরৎভাবনা 'যুগ যুগ জীও' বললে অত্যুক্তি হবে না।

আগেই লিখেছি যে দেবানন্দপুরের প্রতি কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আকর্ষণ স্বাভাবিক ছিল। তিনি শেষ জীবনে দেবানন্দপুরে গিয়ে থাকতে চেয়েছিলেন। শেষের দিকে তিনি প্রায়ই দেবানন্দপুরে যেতেন এবং সেখানে কয়েকদিন বেরিয়ে আসতেন। পরিচিত জনদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলাপ আলোচনা করতেন।

১৩৩৫ সালে তাঁর জন্মজয়ন্তী দিনে স্থানীয় যুবকরা প্রতিষ্ঠা করে 'শরৎচন্দ্র পল্লী পাঠাগার'। উক্ত পাঠাগারে শরৎচন্দ্র একটি আলমারিসহ নিজের লেখা বই ও অন্যান্য লেখকদের লেখা বইও উপহার দেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল যে তিনি পৈতৃক ভিটের কাছে একটি বাড়ী কিনবেন এবং তার একাংশে প্রতিষ্ঠা করবেন ঐ পাঠাগারকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি। দেবানন্দপুরে তিনি ইপ্সিত বাড়ী কিনতে পারেন নি। তবে পাঠাগারটি এখনো আছে। ওটা

অবৈতনিক করা হয় তাঁর ইচ্ছেমত। তিনি বলেছিলেন, 'ওরে গ্রামের লোকের চোখ ফুটিয়ে দে। তবে তারা বুঝবে নিজেদের ভালমন্দ, যারা দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পায় না। তারা কি চাঁদা দিয়ে বই পড়বে?'

একবার এক মামলাকে কেন্দ্র করে কথাশিল্পী শৎচন্দ্রকে আদালতের শমন পেতে হয়েছিল সাক্ষী হিসেবে। ঘটনাটি এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করছি। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন জীবিত ছিলেন। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুর পরামর্শ-মত পল্লীসংস্কারের কাজে হাত দেন। তার জন্যে অর্থের প্রয়োজন। তাই শরৎচন্দ্র জনসাধারণের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাইলেন। পেলেনও বেশ

কিন্তু ইতিমধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মারা গেলেন। তাতে করে শরৎচন্দ্র ঐ কর্ম হতে বিরত থাকেন। পরে দেশবন্ধুর সহকর্মীরা ঐ অর্থ নিয়ে 'দেশবন্ধু পল্লীসংস্কার সমিতি' নামে একটি সমিতি গড়ে গেলেন সমিতির সম্পাদক হন নলিনীরঞ্জন সরকার এবং প্রধান সংগঠন হন জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী যোগ্য সংগঠক ও প্রচারক ছিলেন।
তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে ছায়া চিত্রের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণ করতে লাগলেন। তিনি বহুরকম বক্তৃতা দেন। সেগুলির মধ্যে কতকগুলি ছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। ইংরেজরা যে শোষক জাতি এইটিই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন জনসাধারণকে। তিনি 'দেশের ডাক' নামে এক পুস্তিকা প্রকাশ করে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন।

জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী দেশের জনগণের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগাবার জন্যে ইংরেজ সরকারের শোষণ ও অপশাসনের সমালোচনা করে বক্তৃতা দেন। তাঁর ঐসব বক্তৃতা পুলিশের কাছে বিপ্লবাত্মক বলে মনে হলো। বিশেষ করে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে কোলকাতার ইন্টালী একাডেমীতে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ইংরেজ সরকারের অন্যায় শাসনের কথা যখন উল্লেখ করেন তখন তিনি জনসাধারণকে ঐ অন্যায় শাসনের অবসানের জন্যে বিপ্লবী হতে বলেন।

সেদিন তাঁর ঐ 'বিপ্লব' কথাটিতে ইংরেজ পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। তাঁরা বললেন, বিপ্লব শব্দটি হচ্ছে রাজদ্রোহমূলক। এর দ্বারা এদেশের জনসাধারণ সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে ইংরেজ রাজত্বের অবসান চাইবে।

এভাবে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী অভিযুক্ত হলেন। পরে তিনি জামিনে খালাস হন। এরপর মামলা চললো। তিনি সরকারকে বোঝাতে লাগলেন সাধারণ

আন্দোলন বা বিদ্রোহ অর্থেই তিনি 'বিপ্লব'শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এছাড়া তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না।

কিন্তু সরকার পক্ষ তাঁর যুক্তি বিশ্বাস করলেন না। তাঁরা বললেন, বিপ্লব মানেই হিংসাত্মক ব্যাপার। এই শব্দের মধ্যে প্রকাশ্য বিদ্রোহের ইঙ্গিত হয়েছে।

তখন জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী বললেন, আমি তাহলে সরকারকে অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন 'বিপ্লব' শব্দের অর্থ বাংলার দুই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে জেনে নেন। এই দুই সাহিত্যিক যদি বলেন যে বিপ্লব শব্দ হিংসাত্মক এবং সশস্ত্র বিদ্রোহমূলক তাহলে আমি তখন আপনাদের কথা মানতে বাধ্য।

সরকার পক্ষ বললেন, আমাদের কোন গরজ নেই। তবে আপনি যদি জানবার দরকার মনে করেন তাহলে তাঁদের মতামত আদালতকে জানাতে পারেন।

সরকারের কাছ থেকে এরূপ আশ্বাস পাবার পর জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী ভাবলেন, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে সাক্ষী মানবেন।

রবীন্দ্রনাথ অসুস্থ ছিলেন বলে আদালতে আসতে পারলেন না তবে শরৎচন্দ্র আদালত থেকে সমন পেয়ে তাঁর গ্রামের বাড়ী সামতাবেড় থেকে এলেন।

তখন পাবলিক প্রসিকিউটর তারকনাথ সাধু শরৎচন্দ্রকে গভীর শ্রদ্ধা করতেন। এর আগে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' প্রকাশিত হলে তারকনাথ গ্রন্থকার ও প্রকাশককে অব্যাহতি দিয়ে কেবল 'পথেরদাবী' বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা করে দেন।

তাই তারকনাথ এবার শরৎচন্দ্রকে সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে লজ্জাবোধ করতে লাগলেন। তিনি জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীকে বললেন, দেখুন, আপনি বিপ্লবের অর্থ হিংসাত্মক বা সশস্ত্রমূলক নয়, এরূপ প্রমাণ করলেও আপনার বিরুদ্ধে আরও যেসব অভিযোগ রয়েছে তাতে করেও আপনি অব্যাহতি পেতে পারেন না। কয়েক মাসের জন্যে জেলে আপনাকে যেতেই হবে। সুতরাং শুধু শুধু শরৎবাবুকে কাঠগড়ায় তুলে হয়রাণ করবেন। আর সত্যি কথা বলতে কি, তাঁকে কাঠ-গড়ায় তুলে প্রশ্ন করতেও আমি একটু ইতস্তত বোধ করছি। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, শরৎবাবুকে আর সাক্ষী হিসাবে তুলবেন না।

এই কথা শুনে জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী শরৎচন্দ্রকে আর সাক্ষীর কাঠগড়ায় তোলেন নি।

রূপনারায়ণের পূর্ব দিকে গোবিন্দপুর গ্রাম। ঐ গ্রামে বাস করতেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের দিদি। আবার ঐ দিকেই রয়েছে এব্‌ব্যাঙ্কমেণ্ট বা নদীর তীরে সরকারের তৈরী বড় বাঁধ। সুতরাং গোবিন্দপুর গ্রাম রূপনারায়ণ ও সরকারী বাঁধের ঠিক মাঝখানে।

রূপনারায়ণের একটা মাঝারি ধরণের শাখা খাল আছে গোবিন্দপুরের উত্তর দিকে। খালটার নাম বিরামপুরের খাল। এটি বেশ কয়েকটি গ্রামের মধ্যে দিয়ে গেছে।

গোবিন্দপুরের পূব দিকে সরকারী বাঁধের কোল ঘেঁষে বিরাট একটি মাঠ আছে। একে বলা হয় গোবিন্দপুরের মাঠ। এর আয়তন প্রায় নব্বই বিঘে। এই মাঠের পূবদিকে বাঁধের কোলে বাঁধ তৈরী করার সময়ে একটা আধমজা খাল রয়েছে। এই খালটি গিয়ে মিলিত হয়েছে বিরামপুরের খালের সঙ্গে। এটি জ মদারের খাসদখলে।

বর্ষার সময় রূপনারায়ণের উদর যখন ফুলে ফেঁপে ওঠে তখন তার জল বিরামপুরের খাল ও অন্যান্য শাখা খালের মধ্যে দিয়ে পরিব্যাপ্ত হয়। এমন কি ঐ জল মাঠে আসে। এভাবে বর্ষার সময় গোবিন্দপুরের মাঠটি নদীর জলে ডুবে যায়। ফলে সেখানে পলিমাটি ও মাছের আমদানী হয়।

সামতাবেড়ের দক্ষিণে সামতা গ্রামের পাশেই হচ্ছে ম্যাল্লক গ্রাম। উক্ত গ্রামের ধনী জমিদার মোহিনীমোহন ঘোষাল গোবিন্দপুরের জমিটা কিনলেন। কেনার পর তিনি মতলব আঁটলেন যে গোবিন্দপুরের মাঠের খালটা বিরামপুরের খালের সঙ্গে যেখানে মিশেছে ঐ দুই খালের সংযোগস্থলে বর্ষাকালে জমা জলের ওপর বেশ ভাল রকমের জলকর বিলি করা যায়। এই রকম ভাবার পর তিনি গোবিন্দপুরের দু'জন রাজবংশী প্রজাকে জলকর বিলি করে দেন। ঐ দু'জনের মধ্যে একজনের নাম কেষ্ট বাগ আর একজনের নাম দুর্লভ মণ্ডল।

এই জলকর বিলি করার ফলে গোবিন্দপুরের স্থানীয় লোকজন বড় অসুবিধের মধ্যে পড়লো। তারা এতদিন ধরে জমিদারের খাস খালে ইচ্ছেমত মাছ ধরে খেত। এখন নতুন জমিদারের এই নতুন ব্যবস্থার ফলে তাদের সে বাসনাকামনা অন্তর্হিত হলো।

কিন্তু তবু তারা নিজেদের দাবী সহজে ছাড়তে চাইলো না। একদিন তারা সকলে মিলে চলে এলো জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে। এসে বললে, আপনি আঁমাদের সে সুবিধে বন্ধ করলেন কেন ? আপনি এই জমিদারী নেবার

আগে যিনি এই জমির মালিক ছিলেন তিনি কিন্তু এমনভাবে জলকর বিলি করেন নি। আপনি কেন বিলি করলেন? তাছাড়া আপনি যেখানে জলকর বিলি করেছেন ওটা তো শিবোত্তর। জমিদারের খাসের ছাড়।

ওদের কথা শুনে জমিদার রেগে গিয়ে বলতে লাগলেন, আগে কে কি করতেন না করতেন তা জানিনা। আমি এখন এ জমি কিনেছি। আমাকে জমিদারীর আয় দেখতে হবে। সুতরাং ওখানে জলকর বিলি থাকবেই। ও আর বন্ধ হবে না।

জমিদারের মুখে ঐ কথা শোনার পর তারা ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে গেল। তবে তারা ঠিক করলে, আমরা কেউই জমিদারকে জলকর দেবো না। তাহলে জমিদার খানিকটা জব্দ হবেন। আর তিনি অন্য গ্রাম থেকে লোক আনিয়ে এখানকার জলকর বিলি করতে সাহস পাবেন না। আর তারাও আসতে চাইবে না ভিন্ গাঁ থেকে।

এরূপ ভেবে তারা চলে এলো কেষ্ট বাগ ও দুর্লভ মণ্ডলের কাছে। তারা ঐ দু'জন রাজবংশীকে অনেক করে বোঝালে যাতে তারা জমিদার মোহিনী ঘোষালকে জলকর না দেয়।

কিন্তু তারা শুনলো না এদের কথা। এদের সঙ্গে কেবল যে রাজবংশীরা ছিল তাই নয় গ্রামের অন্য জাতের মানুষও ছিল। এরা তো এই দু'জনের অনমনীয় মনোভাব দেখে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলো। তখন এরা রাগের বশে বলতে লাগলো, ভাখ, ঐ জায়গায় আমরা কিছুতেই জলকর বিলি হতে দেব না। তোরা জমিদারের ভরসায় কতটা শক্তি ধরিস একবার দেখা যাবে। আমরা এখুনি ওখানে গিয়ে তোদের ধুনি, মুগরি ইত্যাদি মাছ ধরার সরঞ্জামগুলি তুলে ফেলে দেবো।

এই বলে এরা খালের কাছে গিয়ে মাছ ধরা সরঞ্জামগুলি তুলে ফেললে।

তাই দেখে কেষ্ট ও দুর্লভ জমিদার মোহিনী ঘোষালের কাছে গেল। গিয়ে জমিদারের কাছে সমস্ত কাহিনী বললে। সেই সঙ্গে বললে, গ্রামের লোকেরা আমাদের ধরে খুব মেরেছে।

সব শুনে জমিদার রেগে গেলেন। পরে তাদের অভয় দিয়ে বললেন, আচ্ছা ওদের কত বাড় বেড়েছে তা একবার দেখছি। এখুনি সব ঠাণ্ডা করে দিচ্ছি। হাঙ্গামার সময় কে কে উপস্থিত ছিল বলতো? তোরা এখুনি আমার সঙ্গে উলুবেড়েয় চল। একধার থেকে সব কটাকে ফৌজদারীতে জুড়ে দিচ্ছি।

তাহলে সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এখন প্রায় এগারটা বেজেছে। এইতো ঠিক সময়।

এই কথা বলার পর মোহিনী ঘোষাল কেষ্ট আর দুর্লভকে নিয়ে তখনই উলুবেড়িয়ার কোর্টে রওনা হলেন। পরে ছাব্বিশ জনকে আসামী করে কেষ্ট আর দুর্লভকে দিয়ে উলুবেড়ের কোর্টে মামলা রুজু করিয়ে দেন। হাঙ্গামার সময় যাঁরা উপস্থিত ছিলেন না তাঁদের মধ্যে অনেককে বেছে বেছে ঐ মামলায় জড়িয়ে দেন। এই আসামীদের মধ্যে ১নং হলেন গ্রামের অন্যতম প্রধান পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায়। পাঁচকড়ি ছিলেন শরৎচন্দ্রের দিদি অনিলাদেবীর সেজ দেওর এবং গোবিন্দপুরের কাছাকাছি ওড়ফুলি এম. ই. স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

শরৎচন্দ্র প্রায়ই দিদির বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন। একদিন পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রকে এই মামলার কথা জানান। এছাড়া উক্ত মামলায় অন্যান্য আসামীরাও শরৎচন্দ্রকে জানালেন নিজেদের কথা।

দরদী শরৎচন্দ্র দরদ দিয়ে তাঁদের মুখ থেকে সবকিছু শুনলেন। তিনি কিছু বললেন না। নীরব রইলেন। পরে একদিন তিনি জমিদার মোহিনী ঘোষালের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে মামলাটি মিটিয়ে নিতে পরামর্শ দিলেন।

সব শুনে জমিদার মোহিনী ঘোষাল বললেন, আমি কারও উপদেশ শুনতে চাই না। যা ভাল বুঝবো তাই করবো। আমি মামলার দ্বারাই গোবিন্দপুরের লোককে শায়েস্তা করতে চাই। শুনেছি, আপনি ওদের বুদ্ধি দিয়ে সাহায্য করছেন। তা করুন। আমি তাতে ভয় করি না।

শরৎচন্দ্র আর কিছু না বলে ফিরে এলেন।

ওদিকে সমন পাবার পর আসামীরা যথাসময়ে আদালতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তাঁরা কেষ্ট ও দুর্লভকে মেরেছেন। তাঁরা সে অভিযোগ অস্বীকার করলেন। হাকিমকে সম্বোধন করে বলতে লাগলেন, হুজুর, আমরা এত লোক মিলে যদি ওদের দু'জনকে মারতুম তাহলে ওরা মরে যেত। তবে হ্যাঁ আমরা ওদের মাছ ধরার যন্ত্রপাতি তুলে ফেলে দিয়েছি। কেননা শিবোত্তর জায়গা। ওটা সকলের খাসের। ওদের জমিদারের কাছ থেকে জলকর বিলি নেওয়ার অধিকার নেই। আর জমিদারও ওখানে জলকর বিলি করতে পারেন না।

সব শুনে হাকিম বললেন, আপনারা এখন দেওয়ানী করুন। দেওয়ানীতেই ঠিক হবে এটা শিবোত্তর কিনা। তারপর ফৌজদারী হবে। ততদিন আমি

ঐ জায়গায় আইন জারি করে দিচ্ছি যাতে উভয় পক্ষের কেউই ওখানে যেতে না পারে।

এবার জমিদারের নামে গোবিন্দপুরের রাজবংশীরা ছাড়া অন্য সকলে মিলে দেওয়ানী মামলা রুজু করলেন। এভাবে গোবিন্দপুরের নিরীহ সাধারণ মানুষ দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলায় জড়িত হয়ে নাস্তানাবুদ হতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে চৈত্র মাসে শিবের গাজন উপলক্ষে কেষ্ট ও দুর্লভকে কেন্দ্র করে গোবিন্দপুরের অধিবাসীদের সঙ্গে জমিদার মোহিনী ঘোষালের মনোমালিন্য আরও জোরদার হয়ে উঠলো। ব্যাপারটা থানাপুলিশ পর্যন্ত গড়ালো। জমিদার ইংরেজ পুলিশ অফিসার ও উলুবেড়ের মহকুমা শাসককে হাত করে ভেতর ভেতর নানা কৌশল খাটিয়ে গোবিন্দপুরের মানুষজনকে নাজেহাল করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই ব্যাপারে গোবিন্দপুরের নিরীহ ও সৎ অধিবাসীদের বাঁচাবার জন্যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এগিয়ে এলেন। তাঁর একান্ত চেষ্টায় গোবিন্দপুরের উক্ত ফৌজদারী ও দেওয়ানী উভয় মামলাই মিটে গেল। পরিণামে গ্রামবাসীদেরই জয় হলো। স্থির হলো যে জলকর জায়গাটা শিবোত্তর এবং জমিদারের খাসরূপে বিলি না হয়ে আগের মতই পড়ে থাকবে।

চিঠিপত্রে মানুষের যথার্থ ব্যক্তিত্ব এবং আসল মানুষের পরিচয় পাওয়া যায়। শরৎচন্দ্রও বহু গ্রন্থ যেমন লিখেছেন তেমনি লিখেছেন একাধিক পত্র। পত্রের মারফৎ তাঁর চরিত্রের নানা দিক পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে তিনি যে কতবড় স্পষ্টবক্তা ছিলেন এবং নিজের মৌলিক মনোভাব প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন না তা আমরা জানতে পারি তাঁর ১৩৪০ সালের শ্রাবণ মাসে অতুলানন্দ রায়কে লেখা এক পত্রে। তিনি লিখেছেন :

'...'পরিচয়' পত্রিকায় শ্রীমান দিলীপকুমারকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের পত্র—সাহিত্যের মাত্রা—সম্বন্ধে তুমি আমার অভিমত জানতে চেয়েছো। এ চিঠি ব্যক্তিগত হলেও যখন সাধারণ্যে প্রকাশিত হয়েছে তখন এরূপ অনুরোধ হয়ত করা যায়, কিন্তু অনেক চার পাতা জোড়া চিঠির শেষ ছত্রের 'কিছু টাকা পাঠাইবার মতো এরও শেষ ক'লাইনের আসল বক্তব্য যদি এই হয় যে, ইয়োরোপ তার যন্ত্রপাতি ধনদৌলত কামান-বন্দুক মান-ইজ্জত সমেত অচিরে ডুববে, তবে অত্যন্ত পরিতাপের সঙ্গে এই কথাই মনে করবো যে, বয়েস ত অনেক হলো, ও-বস্তু কি আর চোখে দেখে যাবার সময় পাবো।

কিন্তু এদের ছাড়াও কবি আরও যাদের সম্বন্ধে হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তোমাদের সন্দেহ তার মধ্যে আমিও আছি। অসম্ভব নয়। এ প্রবন্ধে কবির অভিযোগের বিষয় হলো ওরা 'মত্ত হস্তী' 'ওরা বুলি আওড়ালে' 'পালোয়ানি করলে' 'কসরত কেরামত দেখালে' 'প্রব্লেম সলভ্ করলে' অতএব ওদের ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই কথাগুলো যাদেরকেই বলা হোক, সুন্দরও নয়, শ্রুতিসুখকরও নয়। শ্লেষ বিদ্রূপের আমেজ মনের মধ্যে একটা ইরিটেশান আনে। তাতে বক্তারও উদ্দেশ্য যায় ব্যর্থ হয়ে, শ্রোতারও মন যায় বিগড়ে। অথচ, ক্ষোভ প্রকাশও যেমন বাহুল্য, প্রতিবাদও তেমনি বিফল। কার তৈরী-করা বুলি পাখীর মতো আওড়ালুম, কোথায় পালোয়ানি করলুম, কি খেল দেখালুম, ক্রুদ্ধ কবির কাছে এ-সকল জিজ্ঞাসা অবান্তর। আমার ছেলেবেলাকার কথা মনে পড়ে। খেলার মাঠে কেউ রব তুলে দিলেই হলো অমুক গু মাড়িয়েছে। আর রক্ষে নেই,—কোথায় মাড়ালুম, কে বললে, কে দেখেচে, ওটা গু নয়, গোবর—সমস্ত বৃথা। বাড়ি এসে মায়েরা না নাইয়ে, মাথায় গঙ্গাজলের ছিটে না দিয়ে আর ঘরে ঢুকতে দিতেন না। কারণ, ও যে গু মাড়িয়েছে। এও আমার সেই দশা।

'সাহিত্যের মাত্রা'ই বা কি, আর অন্য প্রবন্ধই বা কি, এ কথা অস্বীকার করিনে যে, কবির এই ধরণের অধিকাংশ লেখাই বোঝবার মতো বুদ্ধি আমার নেই। তাঁর উপমা উদাহরণ আসে কলকব্জা, আসে হাট-বাজার, হাতী ঘোড়া, জন্তু-জানোয়ার—ভেবেই পাইনে, মানুষের সামাজিক সমস্যায় নরনারীর পরস্পরের সম্বন্ধ বিচারে ওরা সব আসেই বা কেন এবং এসেই বা কি প্রমাণ করে? শুনতে বেশ লাগসই হলেই ত তা যুক্তি হয়ে ওঠে না।......আধুনিক কালের কলকারখানাকে নানা কারণে অনেকেই আজকাল নিন্দে করেন, রবীন্দ্রনাথও করেছেন—তাতে দোষ নেই। বরঞ্চ, ওইটেই হয়েছে ফ্যাশান। এই বহু-নিন্দিত বস্তুটার সংস্পর্শে যে মানুষগুলো ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় এসে পড়েছে তাদের সুখ-দুঃখের কারণগুলোও হয়ে দাঁড়িয়েছে জটিল—জীবনযাত্রার প্রণালীও গেছে বদলে, গাঁয়ের চাষাদের সঙ্গে তাদের হুবহু মেলে না। এ নিয়ে আপশোষ করা যেতে পারে, কিন্তু তবু যদি কেউ এদেরই নানা বিচিত্র ঘটনা নিয়ে গল্প লেখে, তা সাহিত্য হবে না কেন? কবিও বলেন না যে হবে না। তাঁর আপত্তি শুধু সাহিত্যের মাত্রা লঙ্ঘনে। কিন্তু এই মাত্রা স্থির হবে কি দিয়ে? কলহ দিয়ে না কটু কথা দিয়ে? কবি বলেছেন—স্থির হবে সাহিত্যের চিরন্তন মূল নীতি

দিয়ে। কিন্তু এই 'মূর্ল-নীতি' লেখকের বুদ্ধির অভিজ্ঞতা ও স্বকীয় রসোপলব্ধির আদর্শ ছাড়া আর কোথাও আছে কি? চিরন্তনের দোহাই পাড়া যায় শুধু গায়ের জোরে আর কিছুতে নয়। ওটা মরীচিকা।'……

নিজের সৃষ্ট সাহিত্য প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মতামত ছিল বরাবরই সহজসরল এবং স্পষ্ট। সেখানে কোন ঢাকঢাক গুরগুর ছিল না। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন প্রমথনাথ ভট্টাচার্যকে এক পত্রে লিখেছেন '…দেবদাস' নিয়ো না, নেবার চেষ্টাও ক'রো না। শুধু যে ওটা আমার মাতাল হয়ে লেখা, তাই নয়, ওটার জন্যে আমি নিজেও লজ্জিত। ওটা immoral.'

অন্য এক পত্রে শরৎচন্দ্র প্রমথনাথকে লিখেছেন: '…দ্বিজুবাবু (দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ভারতবর্ষ সম্পাদক) আর নাই—আর আমিও অন্য সম্পাদকের কাছে নিজের লেখার যাচাই করিতে পারিব না। সেটা আমার পক্ষে অসাধ্য।'…

১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মে প্রমথনাথকে যে পত্র লেখেন শরৎচন্দ্র তার্তে সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁর স্বাধীন ও মৌলিক চিন্তার প্রকাশ ঘটেছে। '…পরিশ্রমের হিসাবে, রুচির হিসাবে, আর্টের হিসাবে 'পথ নির্দেশে-র কাছে' রামের সুমতি-র স্থান নীচে। অনেক নীচে। …'চরিত্রহীন' ফিরিয়া (registry) পাঠাইয়ো এ সম্বন্ধে ঋষি Tolstoyর resurrection (the greatest book) পড়িয়ো। অঙ্গ বিশেষ যে খুলিয়া লোকের গোচর করিতে নাই, তাহা জানি, কিন্তু ক্ষতস্থান মাত্রই যে দেখাতে নাই জানি না। ডাক্তারের উপমাটি ঠিক খাটে না।'……

আরও একটি পত্রে শরৎচন্দ্রের স্বাধীন মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে। এই পত্রখানি তিনি লিখেছেন ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই এপ্রিল তারিখে প্রমথনাথকে। তিনি লেখেন:'……আমি একজন Ethics-এর student-সত্য students Ethics বুঝি এবং কাহারো চেয়ে কম বুঝি বলিয়া মনে করি না। …ওটা (চরিত্রহীন) বটতলার এই নয়। রাঁড়ের বাড়ির গল্পও নয়। …আমি যা তা যেমন কলমের মুখে আসে লিখি না গোড়া থেকেই উদ্দেশ্য করে লিখি—এবং তাহা ঘটনাচক্রে বদলাইয়াও যায় না।'…

নীচ বা ছোট কাজে শরৎচন্দ্র কোনদিন রত থাকেন নি। নিজের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসংশয়। এই প্রসঙ্গে ১৩২৬ সালের ৭ই ভাদ্র তারিখে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে এক পত্রে লেখেন শরৎচন্দ্র:…'আমার এই জীবনটা আগাগোড়াই যেন একটা মস্ত উপন্যাস। এবং এই উপন্যাসে সব কাজই করেছি,

কেবল ছোট কাজ কখনো করি নি। যখন যাব—ফর্সা খাতা রেখে যাবো—যার মধ্যে কালির আঁচড় এক জায়গাও থাকবে না।'

সাধু বা মঠমন্দির সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের খুব ভাল ধারণা ছিল না। ইং ১০।৬।২৯ তারিখে সামতাবেড় থেকে দিলীপ কুমার রায়কে লিখেছেন শরৎচন্দ্র : 'তোমার নামে তো আর ওয়ারেণ্ট ছিল না যে সাধু হতে গেলে ?'

এই প্রসঙ্গে সামতাবেড় থেকে ১৩৩৭ সালের ৪ঠা ফাল্গুন তারিখে আর একখানি পত্র লেখেন শরৎচন্দ্র দিলীপ কুমার রায়কে। তাতে তিনি লিখেছেন : '...কোন আশ্রমের পরেই আমি প্রসন্ন নই, কিন্তু কোন একটা বিশেষ আশ্রমের পরেই আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ বা আক্রোশ নেই। আমি জানি সবই সমান, সবই ভুয়ো।'...

চিঠিপত্রের মারফৎ শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তার যে অভিব্যক্তি ঘটেছে তা আমরা জানতে পারি ১৩৩৮ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বেণু' পত্রিকায় সম্পাদক ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত-রায়কে লেখা এক পত্রে। তিনি লিখেছেন :

'...বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেচ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে ? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে ? বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে স্বাধীন দেশেই Govt-এর Form অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। তার কারণ কি জানো ? বিপ্লবের মাঝে আছে Classwar, বিপ্লবের মাঝে আছে Civilwar : আত্মকলহ আর গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।...'

শাস্ত্রকাররা যাকে সুনীতি-দুর্নীতি বলে চিহ্নিত করে গেছেন সাহিত্যের কাছে তা সম্পূর্ণ সত্য নাও হতে পারে। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র 'সাহিত্য ও নীতি' প্রসঙ্গে ১৩৩১ সালের ১০ আশ্বিন বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ নদীয়া শাখায় বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে যা বলেছেন তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'...এঁরা জানেন না, সংসারে অদ্ভুত কিছু একটা জানাই সাহিত্যিকের বড় উপকরণ নয়। আমি ত জানি কি করে আমার চরিত্রগুলি গড়ে ওঠে। বাস্তব অভিজ্ঞতাকে আমি উপেক্ষা করচি নে, কিন্তু বাস্তব ও অবাস্তবের সংমিশ্রণে কত

ব্যথা কত সহানুভূতি, কতখানি বুকের রক্ত দিয়ে এরা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফোটে, সে আর কেউ না জানে আমি ত জানি। সুনীতি দুর্নীতির স্থান এর মধ্যে আছে, কিন্তু বিবাদ করবার জায়গা এতে নেই—এ বস্তু এদের অনেক উচ্চে। ওদের গণ্ডগোল করতে দিলে যে গোলযোগ বাঁধে যে কাল তাকে ক্ষমা করে না। নীতি-পুস্তক হবে, কিন্তু সাহিত্য হবে না। পুণ্যের জয় এবং পাপের ক্ষয়, তাও হবে, কিন্তু কাব্যসৃষ্টি হবে না।'...

আমাদের দেশে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত শিক্ষার বিরোধ চিরকাল ধরে আছে। আগে অর্থাৎ বৃটিশ ভারতে যেমন ছিল আজ অর্থাৎ স্বাধীন ভারতে ঠিক তেমনি আছে। হয়ত সামান্য হেরফের ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র ১৩২৮ সালে 'গৌড়ীয় সর্ববিদ্যা আয়তনে' 'শিক্ষার বিরোধ' নামে যে ভাষণ দেন তা সর্বকালে সত্য ও শাশ্বত। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'...শিক্ষার বিরোধ আসলে এইখানে। সে শুধু দেহের গঠনে নয়, সে অন্তরের আত্মায়। এই যে শিক্ষার প্রণালী নিয়ে বিবাদ-বিসম্বাদ চলেছে—ওদের শিক্ষা অত্যন্ত মহার্ঘ, অত বড় বড় বাড়ী কি হবে? কি হবে টানা-পাখায়? কাজ কি আমার টেবিল চেয়ারে—দূর করে দাও মোটা মাইনের বিলিতি প্রফেসার—তার খরচ যোগাতেই যে দেশের বাপ-মা পাগল হয়ে গেল,—এমনি আরও কত শত। এর কোনটাই মিথ্যে নয়, কিন্তু এও আমার কাছে তুচ্ছ মনে হয়, যখন ভাবি পশ্চিম ও পূর্বের শিক্ষার সংঘর্ষ ঠিক কোনখানে? এদের সত্য মিলনের যথার্থ অন্তরায় কোথায়? এ কি কেবল গোটাকতক সাজগোজ বদলালেই হবে? টেবিল চেয়ারের বদলে লম্বা লম্বা মাদুর পেতে, ইলেকট্রিক ফ্যানের পরিবর্তে তালপাখা এনে, কিম্বা মোটা মাইনের প্রফেসারের বদলে রোগা মাইনের দেশী অধ্যাপক আমদানি করে কিংবা বড় জোর বিদেশী ভাষার মিডিয়মের স্থানে স্বদেশী ভাষায় লেকচারের আইন করলেই দুঃখ দূর হবে? দুঃখ কিছুতেই ঘুচবে না, যতক্ষণ না সেই শিক্ষার ব্যবস্থা করা যায়, যাতে দেশের বহির্মুখী বীতশ্রদ্ধ মন আর একবার অন্তর্মুখী ও আত্মস্থ হয়। মনের মিলনই বা কি, আর শিক্ষার মিলনই বা কি, সে কেবল হতে পারে সমানে সমানে শ্রদ্ধার আদান-প্রদানে। এমন কাঙালের মত, ভিক্ষুকের মত কিছুতেই হবে না। হলেও সে শুধু একটা গোঁজামিল হবে,—তাতে কল্যাণ নেই, দেশকে কেবল হীনতা ও লাঞ্ছনাই দেবে কোন দিন মনুষ্যত্ব দেবে না।...কোন বড় জিনিসই কখনো নিজের অতীতের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে নিজের শক্তির প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে হয় না—হবার যো-ই নেই।

তাদের যে বিভাটার প্রতি আমাদের এত লোভ, তা তাদের মাথায় হাত বুলিয়েই শিখে নিই, বা পায়ে তেল মাখিয়েই অর্জন করি—এর ফল অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, যদি না তা দেশের প্রতিভার ভিতর থেকে সৃষ্ট হয়ে ওঠে, এর মূল যদি না জাতির অতীতের মর্মস্থল বিদীর্ণ করে এসে থাকে। এই ফুলসমেত বৃক্ষশাখা, তা সে বর্ণে ও গন্ধে যত দামীই হোক, একদিন শুকোবেই শুকোবে, কোন কৌশলই তাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না।'...

মৃত্যুর পাঁচ দিন আগে শরৎচন্দ্র পার্ক নার্সিং হোমে অবস্থানের সময় একটি উইল করেন। উইলটি নিম্নরূপ :

'This is the Last will and testament of Mr. Sarat Chandra Chatterji of no. 24, Aswini Dutta Road within the municipal limits of Calcntta now lying at the Park Nursing Home at Victoria Terrace in the town of Calcutta I revoke all testamentary disposisions if any heretofore made by me.

I give devise and bequeath all my estate and effects to my wife Sm. Hiranmoyee Debi of No 24, Aswini Dutt Road to be held and enjoyed by her for the term of her natural life subject nevertheless to the right of my Brother to live in the premises no. 24, Aswini Dutta Road with his family as he is at present doing and after my death and my wife's death my brother Prokash's son or sons who shall survive her shall be the absolute Owner.

Not withstanding anything here in before contained my moneys in the Imperial Bank shall be spent only for the purpose of the marriage of my brother's daughter and if there shall be any surplus the same shall be spent for the use and benefit of my brother's children or of any of them.

In witness whereof I have set my hand to this as my last will and testament this the 11th day of January 1938.

Sarat Chandra Chatterji

Signed by the abovenamed
in our presence who at his
request and in his presence

and in the presence of each
other have signed as
attesting witness.
N. C. Chunder, Solicitor,
Calcutta.
Umaprasad Mookherjee,
advocate, Calcutta High court.
11th January, 1938.

কেওড়াতলার মহাশ্মশানের যে অংশে কথাশিল্পীর মরদেহ দাহ করা হয় সেখানে এযাবৎ একটি সামান্য বেদী শোভা পেয়ে আসছিল। এই বছর অর্থাৎ ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্রের শুভ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে শরৎ সমিতি কোলকাতার পৌরসভাকে অনুরোধ করেন যাতে তাঁরা উক্ত বেদীর ওপর একটি স্মৃতিমন্দির নির্মাণ করে দেন। কোলকাতার পৌরসভা শরৎ সমিতির সেই আবেদন রক্ষা করেছেন। সেখানে একটা শ্বেত পাথরের স্মৃতিমন্দির তৈরী হয়েছে। উক্ত মন্দিরের ভেতরে শরৎচন্দ্রের একটি মূর্তিও বসানো হবে। এই প্রসঙ্গে ১৩৮১ সালের ৫ই চৈত্র তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকা একটি সংবাদ পরিবেশন করেছে। তার অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মরদেহ কেওড়াতলা শ্মশানে যেখানে ভস্মীভূত হয়েছিল·সেখানে প্রায় চার দশক পরে আজ এই শুক্রবার একটি স্মৃতিমন্দির হল। এবার অন্তত: শরৎজন্মশতবার্ষিকীর বছরে ওই কাজটা করার জন্য শরৎ সমিতি কলকাতা পুরসভাকে অনুরোধ করেছিলেন। দশ হাজার টাকা ব্যয়ে পুরসভা সে কাজটা করে দিলেন ছোট একটি শ্বেতপাথরের মন্দির করে। এখনও এতে শরৎচন্দ্রের মূর্তি বসে নি। উদ্যোক্তা শরৎ সমিতি জানালেন, শিল্পী চিন্তামণি কর, মূর্তি গড়ার ভার নিয়েছেন। এ বছরেই সে মূর্তি সেখানে বসবে।'…
(আনন্দবাজার পত্রিকা—৫ই চৈত্র, ১৩৮১)

এ বছর শরৎ জন্মশতবার্ষিকী পালন করার জন্যে বেসরকারী ও সরকারী নানাপ্রকার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শরৎচন্দ্রের জীবন ও তাঁর লেখা তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করে একটি আলোকচিত্র তৈরী করতে উদ্যোগী হয়েছেন। তার জন্যে পশ্চিমবঙ্গের তিনজন প্রখ্যাত চিত্রপরিচালককে মনোনীত করেছেন।

এই সমাজসংসার মহা স্বার্থপর। কারও মন জুগিয়ে কথা না বললে, কাজ না করলে এক মহা কেলেঙ্কারী বা অনর্থ সৃষ্টি হয়। তখন একজন অপরজনের গায়ে কাদা ছিটোয়। নানারকম কুৎসা রটনা করে তাকে শেষ পর্যন্ত একঘরে করে রাখে। কথাশিল্পী এবং সমাজসংস্কারক বিপ্লবী শরৎচন্দ্র তাঁর যুক্তিগ্রাহ্য ও ক্ষুরধার লেখনী মারফৎ অচলঅটলায়তন এই দেশীয় সমাজের যে দোষগুণসম্বলিত চিত্র এঁকেছেন কথাশিল্পের মাধ্যমে তা অপূর্ব। তা অনেকের কাছে মন্দ লেগেছে যেমন তেমনি অনেকের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। যাদের কাছে মন্দ বোধ হয়েছিল তারা তাঁর রচনাকে অবজ্ঞাভরে দূরে সরিয়ে রেখেছিল, তাঁকে একঘরে করেছিল। এবং তাঁর নামে অযথা কুৎসা রটিয়েছিল। তাদের কথা শরৎচন্দ্র বেশ ভাল ভাবেই জানতেন। তিনি যে 'একঘরে'র মানুষ এটি তিনি চিঠিপত্রে উল্লেখও করেছেন। শরৎচন্দ্র তাঁর পুস্তকের প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে ২৭।৬।১৬ তারিখে এক পত্রে লিখেছেন—

'...জানেন বোধ হয় আমার ভাগ্নীর বিয়ে এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তাতে আমারই সমস্ত দায়। আবার আমি আপনার দায়। এতদিন কথাটা আপনাকে বলিনি যে দেশে আমি 'একঘরে', আমার কাজকর্মের বাড়ীতে যাওয়া ঠিক নয়। যাক্ সেজন্যেও ভাবিনি কিন্তু টাকা দেওয়া চাই, অথচ আমি না যাই, এই তাঁদের গোপন ইচ্ছা। আমার চারশ টাকার অকুলান। এটা আমার চাই।...

সেকালে শরৎচন্দ্র যেমন একশ্রেণীর লোকের কাছে অপাংক্তেয় ও 'একঘরে' হয়ে ছিলেন তেমনি একালেও তিনি কি একশ্রেণীর লোকের কাছে অপাংক্তেয় এবং 'একঘরে' নন? একালেও অনেকের মুখে শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে নানারকম কটূক্তি করতে শুনেছি। কেউ কেউ বলেছেন যে উনি ঔপন্যাসিকই নন। কেউ বলেছেন যে উনি কেবল সমস্যার কথা বলেছেন সমাধানের কথা বলেন নি। কেউ বলেছেন, উনি সাহিত্যের মধ্যে লম্বাচওড়া বক্তৃতা ঢুকিয়ে সাহিত্যরস থেকে বঞ্চিত করেছেন পাঠকসমাজকে। কেউ বলেছেন উনি ছিলেন এক নম্বরের পাঁড় মাতাল এবং নাড়ীসঙ্গলোভী। কেউ বলেছেন, উনি ছিলেন এক নম্বরের ডেঁপো এবং ইঁচড়ে পাকা। কেউ বলেছেন, উনি ইংরেজী ভাষা জানতেন না। কেউ বলেছেন উনি হচ্ছেন বকাটে মহাপুরুষ।

এমনিভাবে কত লোক কত কি বলেছেন। অথচ আমার মতে যাঁরা এসব মন্তব্য করেছেন তাঁরা আসলে সম্পূর্ণ শরৎসাহিত্য পাঠ ও অনুধ্যান করেছেন কিনা

সন্দেহ। তা যদি করতেন তাহলে তাঁদের মনে এমন অবাস্তব ও উদ্ভট কল্পনার জঞ্জাল এসে জমা হতে পারতো না।

স্বীকার করি যে শরৎসাহিত্যে সকল অংশই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় বা কাহিনী-বিন্যাসে কোথাও কোথাও দুর্বলতা এবং অসম্পূর্ণতা দোষ অনুপ্রবেশ করেছে। শরৎজীবনও নিখাদ সোনা ছিল না। তাই বলে এক কথায় শরৎসাহিত্যকে কোনঠাসা বা নস্যাৎ করা কি যুক্তিযুক্ত হবে? শরৎজীবনকে কলুষময় ভাবা ঠিক হবে? প্রতিটি মানুষের জীবন কি স্বয়ংসম্পূর্ণ, দোষমুক্ত এবং নিখুঁত হতে পারে? যাঁরা শরৎচন্দ্র প্রসঙ্গে কটুক্তি করেছেন বা করেন তাঁদের জীবন কি সম্পূর্ণ? আমাদের দেশের এক শ্রেণীর মানুষ মহামানব বা মনীষীদের বিরুদ্ধে নানারকম কুৎসা রটিয়ে আনন্দ পেয়ে থাকেন। এটা তাঁদের কিরূপ মনোবৃত্তি জানি না। এর দ্বারা তাঁরা নিজেরাই নিজেদের অপমান করেন বা ছোট করেন। যাঁদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটান তাঁরা আসলে ঠিকই থাকেন। তাঁদের মহানুভবতা বা মহামান্যতার এতটুকু অংশও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আমাদের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রকে পেয়ে আমরা সত্যিই ধন্য এবং গর্বিত। গর্বিত বঙ্গজননী শরৎচন্দ্রের মত সুসন্তানকে তাঁর কোলে স্থান দিয়ে। কারণ শরৎসাহিত্য বঙ্গজননীর প্রাণের কথা। সে কথা বোঝে বাংলার সর্বশ্রেণীর মানুষ। তাইতো শরৎচন্দ্র যুগ যুগ ধরে বাংলা ও বাঙ্গালীর মাঝে অমর হয়ে থাকবেন।

তাই বলি, হে আমার বঙ্গদেশবাসীগণ, আপনারা অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মত দুর্লভ দরদী সাহিত্যিককে পেয়ে সত্যিই ধন্য হয়েছেন এবং গর্ব বোধ করছেন। এই বছরে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হবে। তাই যাঁরা শরৎচন্দ্রকে এতদিন ভুল বুঝেছেন তাঁরা যেন এই পুণ্য লগ্নে তাঁর সমগ্র রচনাবলী পাঠ করে এবং তাঁর মহাজীবনের ক্রিয়াকলাপ উপলব্ধি করে তাঁর প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা জানিয়ে পিতৃঋণসম সাহিত্যিক ঋণ পরিশোধ করতে যত্নশীল হন।

শরৎচন্দ্রের গ্রন্থপঞ্জী

১৯১৩, ৩০শে সেপ্টেম্বর	...	বড়দিদি (উপন্যাস)
১৯১৪, ২রা মে	...	বিরাজ বৌ (উপন্যাস)
„ ৩রা জুলাই	...	বিন্দুর ছেলে ও অন্যান্য গল্প (গল্প সমষ্টি)
„ ১০ই আগস্ট	...	পরিনীতা (গল্প)
„ ১৫ই সেপ্টেম্বর	...	পণ্ডিতমশাই (উপন্যাস)
১৯১৫, ১২ই ডিসেম্বর	...	মেজদিদি ও অন্যান্য গল্প (গল্পসমষ্টি)
১৯১৬, ১৫ই জানুয়ারী	...	পল্লীসমাজ (উপন্যাস)
„ ১৬ই মার্চ	...	চন্দ্রনাথ (উপন্যাস)
„ ৫ই জুন	...	বৈকুণ্ঠের উইল (গল্প)
„ ২০শে নভেম্বর	...	অরক্ষণীয়া (গল্প)
১৯১৭, ১২ই ফেব্রুয়ারী	...	শ্রীকান্ত ১ম পর্ব (উপন্যাস)
„ ৩০শে জুন	...	দেবদাস (উপন্যাস)
„ ১লা জুলাই	...	নিষ্কৃতি (গল্প)
„ ১লা সেপ্টেম্বর	...	কাশীনাথ (গল্প সমষ্টি)
„ ১১ই নভেম্বর	...	চরিত্রহীন (উপন্যাস)
১৯১৮, ১৮ই ফেব্রুয়ারী	...	স্বামী (গল্প-সমষ্টি)
„ ২রা সেপ্টেম্বর	...	দত্তা (উপন্যাস)
„ ২৪শে সেপ্টেম্বর	...	শ্রীকান্ত ২য় পর্ব (উপন্যাস)
১৯২০, ১৬ই জানুয়ারী	...	ছবি (গল্প-সমষ্টি)
„ ২০শে মার্চ	...	গৃহদাহ (উপন্যাস)
„ অক্টোবর	...	বামুনের মেয়ে (উপন্যাস)
১৯২৩, এপ্রিল	...	নারীর মূল্য (প্রবন্ধ)
„ ১৪ই আগস্ট	...	দেনা-পাওনা (উপন্যাস)
১৯২৪, অক্টোবর	...	নববিধান (উপন্যাস)
১৯২৬, ১৩ই মার্চ	..	হরিলক্ষ্মী (গল্প-সমষ্টি)
„ ৩১শে আগস্ট	...	পথের দাবী (উপন্যাস)

১৯২৭, ১৮ই এপ্রিল	...	শ্রীকান্ত ৩য় পর্ব (উপন্যাস)
„ ১৩ই আগস্ট	...	ষোড়শী (দেনাপাওনার নাট্যরূপ)
১৯২৮, ৪ঠা আগস্ট	...	রমা (পল্লী সমাজের নাট্যরূপ)
১৯২৯, ১৮ই এপ্রিল	...	তরুণের বিদ্রোহ (প্রবন্ধ)
১৯৩১ ২রা মে	...	শেষ প্রশ্ন (উপন্যাস)
১৯৩২ আগস্ট	...	স্বদেশ ও সাহিত্য (প্রবন্ধ)
১৯৩৩, ১৩ই মার্চ	...	শ্রীকান্ত ৪র্থ পর্ব (উপন্যাস)
১৯৩৪, ১৮ই মার্চ	...	অনুরাধা, সতী ও পরেশ (গল্প-সমষ্টি)
„ ২৪শে ডিসেম্বর	...	বিজয়া (দত্তার নাট্যরূপ)
১৯৩৫, ১লা ফেব্রুয়ারী	...	বিপ্রদাস (উপন্যাস)

(মৃত্যুর পরে প্রকাশিত)

১৯৩৮ মার্চ	...	শরৎচন্দ্র ও ছাত্রসমাজ (ভাষণ সমষ্টি ; সম্পাদনা-মুরারি দে)
„ এপ্রিল	...	ছেলেবেলার গল্প (তরুণপাঠ্য গল্প-সমষ্টি)
১৯৩৮, ৫ই জুন	...	শুভদা (উপন্যাস)
১৯৩৯, ৭ই জুন	...	শেষের পরিচয় (উপন্যাস ; শেষাংশ রাধারাণী দেবীর লেখা)
১৯৪৮, ফেব্রুয়ারী	...	শরৎচন্দ্রের পত্রাবলী (সম্পাদনা-ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়)
১৯৫১, জুলাই	...	শরৎচন্দ্রের পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনাবলী (সম্পাদনা-ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)
১৯৫৪, নভেম্বর	...	শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র (সম্পাদনা-গোপাল চন্দ্র রায়)

শরৎচন্দ্রের জীবনপঞ্জী

১৮৭৬ : শরৎচন্দ্রের জন্ম (১৫ই সেপ্টেম্বর, ৩১শে ভাদ্র, ১২৮৩)

১৮৭৭-৮৩ : দেবানন্দপুরে বাল্যজীবন ; পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাস।

১৮৮৪ : পিতার সহিত তাঁর কর্মস্থল ডিহরীতে গমন।

১৮৮৬ : ভাগলপুরের মাতুলালয়ে আগমন।

১৮৮৭ : ভাগলপুরে দুর্গাচরণ বালক বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় পাস।

১৮৮৮ : ভাগলপুরে ইংরেজী-স্কুলে (জেলা-স্কুলে) প্রবেশ।

১৮৮৯ : পুনরায় দেবানন্দপুরে আগমন।

১৮৯০ : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে বিদ্যাভ্যাস।

১৮৯২ : মাতামহ কেদারনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাটপাড়ায় মৃত্যু।

১৮৯৩ : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র।

—সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত।

১৮৯৪ : হুগলী ব্রাঞ্চ স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে পাঠকালে ভাগলপুরে গমন ও টি. এন. জুবিলী স্কুলে প্রবেশ। সেখান থেকে এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে (ডিসেম্বর) দ্বিতীয় বিভাগে পাস।

১৮৯৫ : টি. এন. জুবিলী কলেজে এফ-এ ক্লাসে যোগদান।

—ভাগলপুরে সাহিত্য সভার সৃষ্টি ও নেতৃত্ব।

—মাতৃবিয়োগ (নভেম্বর)।

১৮৯৬ : মাতুলালয় ছেড়ে পিতার সঙ্গে ভাগলপুরের খঞ্জরপুর পল্লীতে বাস। দেনার দায়ে পিতা কর্তৃক দেবানন্দপুরের বসতবাটী বিক্রয়। অর্থাভাবে কলেজের পড়াশুনা ত্যাগ।

১৯০০ : খেলাধুলা, সাহিত্যচর্চা। আদমপুর ক্লাবে অভিনয়।—খঞ্জরপুরে প্রতিবেশী বিভূতিভূষণ ভট্টদের বাড়ীতে আস্তানা।

সেখানে সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—সকল সময়ে একাগ্রচিত্তে নানা গ্রন্থ অধ্যয়ন ও সাহিত্যচর্চা। সেখানেই সাহিত্যিক সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের (সৌরীনবাবু তখন টি, এন, জুবিলী কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ারের ছাত্র ও বিভূতিভূষণের সহপাঠী) সঙ্গে প্রথম পরিচয়।

—'বড়দিদি', 'দেবদাস', 'চন্দ্রনাথ' প্রভৃতি রচনা।

—বনেলী এষ্টেটে চাকুরী।

১৯০১ : সাহিত্য সভার মুখপত্র—হস্তলিখিত মাসিক পত্রিকা 'ছায়া'।

—অভিমানে নিরুদ্দেশ ; সন্ন্যাসীবেশে বিভিন্নস্থানে ভ্রমণ।

১৯০২ : নাগা সন্ন্যাসীর দলে মিশে মজঃফরপুরে আগমন। মজঃফরপুরে প্রমথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব। মজঃফরপুরে অনুরূপা দেবীর স্বামী শিখরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিথি। স্থানীয় জমিদার মহাদেব সাহুর কাছে গায়ক ও বাদকরূপে অবস্থিতি। —পিতার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ভাগলপুরে আগমন। পিতার শ্রাদ্ধের পর মাতুল লালমোহন গঙ্গোপাধ্যায়ের কলকাতায় ভবানীপুরের বাসায় আগমন।

১৯০৩ : ভাগ্যান্বেষণে বর্মা যাত্রা (জানুয়ারী) ও রেঙ্গুনে মেসোমশাই—উকিল অঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে অবস্থিতি। বর্মা যাবার কিছু আগে মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কুন্তলীন-পুরস্কার প্রতিযোগিতায় প্রেরিত গল্প 'মন্দির'।

১৯০৫ : মেসোমশাই অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু (৩০শে জানুয়ারী)। —পেগুতে ও পরে রেঙ্গুনে চাকরী।

১৯০৭ : 'ভারতী' পত্রিকায় (বৈশাখ-আষাঢ় ১৩১৪) সৌরীন্দ্র-মোহন মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ছেলেবেলার রচনা 'বড়দিদি' উপন্যাস প্রকাশ। মাসিক পত্রিকায় স্বনামাঙ্কিত প্রথম রচনা।—প্রথম রেঙ্গুন থেকে কোলকাতায় আগমন (ডিসেম্বর)। একটা অস্ত্রোপচারের জন্যে তিন মাস থেকে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারীতে রেঙ্গুনে গমন।

১৯১২ : অল্পদিনের জন্যে রেঙ্গুন থেকে কোলকাতায় আগমন (অক্টোবর-ডিসেম্বর)। যমুনা-সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পালের সঙ্গে পরিচয়। 'যমুনা'য় নিয়মিত রচনা দানে স্বীকৃতি।

১৯১৩ : 'যমুনা'য় (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩১৯) 'রামের সুমতি' গল্প প্রকাশ। মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত পরিণত বয়সের প্রথম রচনা।—যমুনার সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পাল কর্তৃক পুস্তকাকারে 'বড়দিদি' প্রকাশ, মুদ্রিত প্রথম পুস্তক।—'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় (পৌষ-মাঘ ১৩২০) মুদ্রিত প্রথম রচনা—'বিরাজ-বৌ' গল্প।

১৯১৪ : 'যমুনার অন্যতম সম্পাদক (জুন)। ছ'মাসের (জুন-ডিসেম্বর) ছুটি নিয়ে কোলকাতায় আগমন।

১৯১৫ : 'যমুনা'র সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ। 'ভারতবর্ষে'র নিয়মিত লেখক।

১৯১৬ : স্বাস্থ্যহানির জন্যে এক বছরের ছুটি নিয়ে বর্মা ত্যাগ (এপ্রিল)। —হাওড়া শহরে বাজে শিবপুরে অবস্থিতি।

১৯১৯ : 'বসুমতী' কর্তৃক গ্রন্থাবলী প্রকাশ আরম্ভ (অক্টোবর)।

১৯২১ : কংগ্রেসে যোগদান।

১৯২৩ : কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক' লাভ।—হাওড়ায় শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত সাহিত্য-সভায় সভাপতিত্ব (১৬ই আষাঢ়)।

১৯২৪ : নির্মলচন্দ্র চন্দ্রের সঙ্গে সচিত্র সাপ্তাহিক পত্র 'রূপ ও রঙ্গ' সম্পাদনা (৪ঠা অক্টোবর)। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ নদীয়া শাখার বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব (১০ই আশ্বিন)।

১৯২৫ : সরস্বতী পুজোর দিন কাশীতে বিশ্বনাথ লাইব্রেরীর নবম বার্ষিক সারস্বত সম্মিলনে সভাপতিত্ব (২৫শে জানুয়ারী)।—ঢাকা মুন্সীগঞ্জেও অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনে সাহিত্য-শাখার সভাপতি (১০-১১ই এপ্রিল)। —হাওড়ায় সামতাবেড় গ্রামে বড়দিদি অনিলাদেবীর বাড়ীর কাছে গৃহ-নির্মাণ।

১৯২৬ : সুরমা উপত্যকা ছাত্র-সম্মিলনের ৩য় বার্ষিক অধিবেশনে (আষাঢ়) সভাপতিত্ব; শিলচরের ছাত্রসংঘের কাছ থেকে মানপত্র লাভ।—মধ্যম ভ্রাতা স্বামী বেদানন্দের (প্রভাসচন্দ্র) মৃত্যু (১০ই কার্তিক)।

১৯২৭ : শিবপুর-সাহিত্য-সংসদের উদ্যোগে সম্বর্ধনা। সভাপতি—বিজয়চন্দ্র মজুমদার (১৩ই ফেব্রুয়ারী)।—১ম পর্ব 'শ্রীকান্তে'র ইতালীয় অনুবাদ পড়ে মনস্বী রঁম্যা রলঁ্যা কর্তৃক পৃথিবীর প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিকের সম্মান দান।

১৯২৮ : ১৩৩৫ সালের ৩১শে ভাদ্র ৫৩ তম জন্মদিন উপলক্ষে ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে দেশবাসী কর্তৃক সম্বর্ধনা।

১৯২৯ : মালিকান্দা অভয় আশ্রমে বিক্রমপুর যুবক ও ছাত্র সম্মিলনীতে সভাপতিত্ব (১৫ই ফেব্রুয়ারী)।—রংপুরে বঙ্গীয় যুব সম্মিলনীতে সভাপতি (৩০শে মার্চ)

১৯৩০ : লাহোর-প্রবাসী বাঙ্গালীগণ কর্তৃক অভিনন্দন।

১৯৩১ : রবীন্দ্র-জয়ন্তী উপলক্ষে মানপত্র রচনা ও সাহিত্য-সম্মিলনে সভাপতিত্ব (ডিসেম্বর)।

১৯৩২ : কোলকাতায় টাউন হলে নাগরিক ও সাহিত্যিকগণের পক্ষ থেকে অভিনন্দন লাভ (১৮ই সেপ্টেম্বর)।

১৯৩৪ : ফরিদপুর সাহিত্য-সম্মিলনে মূল সভাপতি (২৭শে জানুয়ারী)। —বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের 'বিশিষ্ট সদস্য' (জুলাই)।—কোলকাতায় ২৪ নং অশ্বিনী দত্ত রোডে নব-নির্মিত গৃহে প্রবেশ।

১৯৩৬ : সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদকল্পে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে কোলকাতার টাউন হলের সভায় উদ্বোধন-বক্তৃতা (১৫ই জুলাই)। কয়েকদিন পরে ঐ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় প্রতিবাদ কল্পেই এলবার্ট হলের সভায় সভাপতিত্ব।—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'ডি-লিট্' উপাধি লাভ।—ঢাকা মুসলিম সাহিত্য-সমাজে সভাপতিত্ব (৩১শে জুলাই)। —৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিনন্দিত (১৫ই আশ্বিন)।

১৯৩৮ : কোলকাতায় পার্ক নার্সিং হোমে ৬২ বছর বয়সে মৃত্যু (১৬ই জানুয়ারী, ২রা মাঘ, ১৩৪৪)।

কথাশিল্পীর স্বকীয় গ্রন্থাগার

শরৎচন্দ্র বহু গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা পাঠ করতেন। তিনি নিজে কিছু বই কিনেছেন আবার কিছু বই পেয়েছেন অন্যের নিকট হতে উপহার হিসেবে। সামতাবেড়ের বাড়ীতে তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে যে সকল পত্র পত্রিকা এবং পুস্তক রক্ষিত আছে তার একটি বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হলো। ওগুলির অধিকাংশে শরৎচন্দ্রের তারিখসহ স্বাক্ষর দেখা যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্র কতবড় একজন গ্রন্থ-অনুরাগী এবং বিচক্ষণ পাঠক ছিলেন।

গল্প উপন্যাস নাটক (ইংরেজী)

Benavente, Jacinto—plays, New york, 1923.
„ —2nd Series.
„ —3rd Series.
„ —4th Series.
Bajer, Johan—The great Hunger, London, 1922.
Brienx—Woman On Her Own, False Gods and the Red Hole ; Three plays, London, 1916.
Dickens, Charles—Sketches by Boz !
—The works of Charles Dickens, London, 1938.
„ Vol. II—The Posthumous papers of the pickwick club.
„ Vol. III—The adventures of Oliver Twist.
„ Vol. IV—The life and adventures of Nicholas Nickleby.
„ Vol. V—The old curiosity shop and master Humphrey's clock.
„ Vol. VI—Barnaby Rudge.
„ Vol. VII—The life and Adventures of Martin Chuzzleurt.
„ Vol. VIII—Dombey and Son.
„ Vol. IX—The personal History of David Copper field.
„ Vol. X—Christmas Books and Reprinted pieces.
„ Vol. XI—Bleak House.
„ Vol. XII—Little Dorrit.
„ Vol. XIII—A tale of two cities and the uncommercial Traveller.
„ XIV—Great Expectation and the Lazy tour of two Idle Apprentices.

„ XV—Our Mutual friend.

„ XVI—The Mystery of Edwin Drood and Hard times.

„ XVII—Christmas stories.

„ XVIII—American Notes, pictures from Italy. Contribntion to 'The Examiner.'

„ X X—Charles Dickens by George Gissing. Dickens land by J. A.Nicklin. Dictionary of characters, places etc. in the Novels and stories.

Dumas, Alexandre—The Black Tulip, London.

„ „ —The Lady with the camelias, London.

France Anatole—The Red Lily, London.

Gorki, Maxim—The Orloff Couple and Malva, London, 1901.

„ „ —A Nights Lodging, Boston, 1920.

„ „ —In the world, London.

Ham Sun, Knut—Growth of the Soil, London.

„ —Hunger, London.

Hutchinson, A. S. M.—If winter comes, London.

Ibanez, Vicente Blasco The May Elower—A Tale of the Valencian Sea shore, London.

Lagerlof, Selma The Outcast, London.

Maran, Rene—Baltouale A Negro Novel from the French, London, 1921.

Marrion, I—Tillers of the Ground, London, 1911.

Pope, Alexander—The Poetical works, London.

Sudermann, Hermann—The song of songs, New York, 1908.

Tagore, Rabindra Nath—Golden Book of Tagore,

Tolstoy—Crime and punishment, London.

Tolstoy's work—(a) The Cossaks, (b) Sevastopol,

(c) The Invaders and other stories.

„ —Resurrection, London, 1810.

„ —The complete works of Tolstoy.

„ —Anna Karenina Vol. I.

„ „ „ „ II,

,, —Master and Man. The Kreutzer Sonata. Dramas.
,, The long exile and other stories.
,, The life of Count Tolstoy.
,, A Russian proprietor. The Death of Ivan Tlyitch and other stories.
,, —My confessian. My Religion. The Gospel in Brief.
,, —Childhood, Boyhood, Youth.
,, —Resurrection. Vol. I & II.
,, What is to be done ? Life.
Wragge, Clement L. The Romance of the South Seas, London, 1906.

রাজনৈতিক প্রবন্ধ ও জীবনী

Blatchford, Robert,—Merrie England, London, 1895.
Bonomi, Ivanoc—from Socialism to fascism (a study of contemporary Italy) London, 1924.
Brookway, A Eenner—Non-co-operation in other Lands, Madras.
Carrere, Jean—Degenation in the Great french Masters.
Das. Rajanikanta—Factory Labour in India, London.
Dauglas, Sir Robert K.—China, London.
Keynes, Joho Maynard—A Tract on Monetary Reform, Landon, 1923.
Macswiney, Terence—Principles of Freedom, London, 1921.
'Madelin, Louis—The French Revolution, London.
Marcu, Valerin—Lenin, London 1928.
Mark Karl—The Civil War in France. (Preceded by the two Manifestoes of the General Council of the International on the franco-Russian War) London. 1921.
Mitra, H. N.—A Chronological Record of the phases of Developments in Indian Polity during 1918.
,,—Punjab Unrest before and after. (1921)

Morrison, Sir Theodor—The Economic Transition in India, London, 1916.
Nag. Hem Chandra—Lawless Laws or, Regulation III and Bengal Ordinance.
Por, Odon—Fascism, London, 1923.
Postgate, R. W.—The Bolshevik Theory London, 1920.
Rao, M. Ramachandra—The Development of Indian Polity.
Seely, J. R.—The Expansion of England, London, 1918.
Skelton, O. D.—Socialism, New York, 1911.
Trotsky—Lenin, London, 1925.
Webster, Nesta H.—Secret societies and subversive movement, London. 1924.
Williams, Robins, Ransome—Lenin, London, 1919.

বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থ

Berl Emmanuel—The Nature of Love, London, 1924.
Bhandarkar, D. R.—Asok, Calcutta, 1925.
Chanda, Ramaprasad—The Indo—Aryan Races, part 1—a study of the origin of Indo—Aryan people and Institutions, Varendra Research Society. Rajshahi 1916.
Cockton, Henry—Valentine Vox. The Ventriloquist, London.
Fick, Richard The Social Organisation in North-East India in Buddha's time. (Pub : University of Calcutta) 1920.
Frink, H. W.—Morbid fears and Compulsion,—their Psychology and Psychoanalytic treatment, London, 1918.
Haeckel, Ernst—The Wonders of life—a popular study of Biological Philosophy.
„ —The Riddle of universe—at the close of the nineteenth Century.
„ —The Evolution of Man—A popular Scientific study.
Hall, Stephen King—Western Civilisation and the Far East, London.
Hunter—Annals of Rural Bengal.

Henley, Thomas Henry—Ethical and political, London. 1903.

„ —Lectures and Essays, Londnn.

„ —Man's place in nature and a Supplementary Essay, London, 1908.

Keynes, John Maynard—The Economic consequences of the peace, London, 1920.

„ —Money, Banking and Exchange in India.

Kroptkin, P—Russian Literature—Ideals and Realities.

Kroptkin—The Russian Literature, London, 1916.

Merchant, Sir James—The control of Parenthood, London.

Mccabe, Joseph—Haeckel's Critics Answered.

Mercier, charles—Crime and Criminals being the Jurisprudence of Crime, London, 1918.

Mohindra, K. C.—India Currency and Exchange, Madras, 1922.

Russel, Bertrand—An outline of Philosophy, London.

Seth, James – A study of Ethical principles, London, 1897.

Spencer. Herbert—principles of Ethics, Vol—1. London 1904.

State, George—The Koran, London.

Stephen, Henry Elements of Analytical Psychology. Calcutta 1907.

Williams, L. F. Rushbrook—India in 1923-24-a statement prepared for presentation to parliament in accordance with the requirements of the 26th. Section of the Govt. of India Act., Govt. of India, 1924.

"Woman in all ages and in all countries" series :

„ Larus, John Rouse—Woman of America.

„ Thieme, Hugo. P.—Woman of Modern france.

„ Brittain, Rev Alfred—Roman women.

„ Schoeufield, Hermann—woman of the Teutonic Nations.

„ Carrol, Mitchell – Greek women.

„ Butler, Pierec—Women of Mediacval france.

„ Brittain, Rev. Alfred—Woman of Early Christianity, Philadelphia.

Origin of Species. London.

বিবিধ

Dem Ditcher—Bengalische Erzahlör—Der Sieg Det Seela, (Pub : Ausdemindischen in Deutsche)

Criminal procedure Codc, 1924. (Pub : M. C. Sarkar and Sons, Calcutta, 1924)

Pocket Criminal Hand Book (Pub : M. C. Sarkar and, Sons Calcutta, 1925)

Beeton's Medical Dictionary, London.

Marteen. J. T.—Census of India—Bengal, Part—1, 1921 (Govt. of India. 1921)

Nelson's Encyclopaedia. Vol—IV. London.

Thompson. W. H.—Census of India, Vol—1. 1921 (Govt. of India 1621.)

পত্র-পত্রিকা

The Indian Annual Register (being an annual chronical and digest of public affairs of India in matters—political, Educational, Economic etc. 4 Vols. (From 1920-1923),

The Indian Quarterly Register—Journal of Indian Public affairs in matters of political, Social and Economic etc. 8 Vols. (from 1924 to 1933)

The Round Table (Quarterly Review of the politics of the British empire.)

The Socialist (A magazine of International Socialism) Edited by S. A. Dange, Bombay. Vol.—1 and II, 1923

Young India, Edited by M. K. Gandhi. (weekly) Vol—III, 1921 IV, 1922.

বঙ্গবাণী—ভাদ্র—মাঘ, ১৩২৯, ১৩৩০

ভারতবর্ষ—১৩২৫—১৩২৮

গল্প, উপন্যাস, নাটক (বাংলা)

আলী, সেখ মোহাম্মদ ইস্লাম—মর্মবীণা (কবিতার বই) (ইসলামিক পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা ১৯২৫)

উত্তর ভারতীয় বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন, ২য় অধিবেশন, প্রয়াগ।

কালিদাস-এর গ্রন্থাবলী—রঘুবংশম্।
খাঁ, মোহাম্মদ আকরম—কোর আন শরীফ (১ম খণ্ড)
মোহাম্মদী পাবলিশিং কোং, কলিকাতা।
চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস গ্রন্থাবলী' (২য় খণ্ড) বসুমতী কার্য্যালয়।
চৌধুরী, প্রমথ—নানা কথা, (প্রকাশক : প্রমথ চৌধুরী কলিকাতা)।
চৌধুরী, প্রমথ—চার-ইয়ারী কথা।
ঠাকুর, বলেন্দ্রনাথ—বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী (শ্রীযুক্ত সতেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রকাশিত, ১৩১৪)
পরশুরাম—কজ্জলী (এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স, কলিকাতা)।
বন্দ্যোপাধ্যায়, রাখাল দাস—ময়ূখ (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়, ১৩২৩)
বেদব্যাস—মহাভারত—কাশীখণ্ড (অনুবাদ—নিবারণ চন্দ্র দাস)
মনুসংহিতা—
মুকুন্দরাম—কবিকঙ্কন চণ্ডী (প্রথম ভাগ) কলিকাতা, ১৩২৫। শ্রীদীনেশ চন্দ্র সেন, শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীহৃষীকেশ বসু সম্পাদিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
„ কবিকঙ্কন চন্ড্রী (২য় ভাগ) চণ্ডীমঙ্গল বোধিনী (চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত।
মুখোপাধ্যায়, হরিসাধন—রূপের বালাই (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)।
মল্লিক, রমনীমোহন,—চণ্ডীদাস (গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়)।
রায়চৌধুরী, বিভাস—অভিশাপ (দি বুক ষ্টল, কলিকাতা)
রায়, দিলীপকুমার—বহুবল্লভ, স্বপ্নভঙ্গ, দুধারা (অরবিন্দ আশ্রম)।
রায়, যোগেশচন্দ্র—বাঙ্গালা ভাষা (২য় ভাগ)
শর্মা, সোমেশ চন্দ্র—বৈদিক সন্ধ্যা—১ম খণ্ড (বৈদিকা)।
„ „ —২য় খণ্ড (ক্রিয়াংশ), ১৩৩৭।
সিদ্দিকী, মৌলভী চৌধুরী কাজেমদ্দিন্ আহমদ—শান্তি সোপান বা পান্থপ্রদীপ।
হোসেন, কাজী মোতাহার—সঞ্চরণ, ঢাকা, ১৯৩৭।

শরৎচন্দ্রের অনুবাদ পুস্তক (হিন্দী)

চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র—মঝলী দিদি (অনুবাদক, রূপনারায়ণ পাণ্ডেয়) (ইণ্ডিয়ান প্রেস লিমিটেড, প্রয়াগ)।

„ নববিধান।

„ পণ্ডিতজী।

হিন্দী বই

গিবন্স, এডোয়ার্ড এডমণ্ডস—বর্তমান এশিয়া—অনুবাদক শ্রীরামচন্দ্র বর্মা—
(প্রকাশক, হিন্দী গ্রন্থ রত্নাকর কার্যালয়, বোম্বাই)

প্রেমচন্দ্র—প্রেম পূর্ণিমা (হিন্দী পুস্তক এজেন্সী, কলিকাতা)

স্টো, হ্যারিয়েট এলিজাবেথ—টাম কাকা কী কুঠিয়া (অনুবাদক মহাবীর প্রসাদ পোদ্দার—প্রকাশক, ইণ্ডিয়ান প্রেস, প্রয়াগ)।

আত্মকথা

—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ভাগলপুরে আমাদের সাহিত্য সভা যখন স্থাপিত হয় তখন আমাদের সঙ্গে শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্ট বা তাঁর দাদাদের কিছুমাত্র পরিচয় ছিল না। বোধ হয় একটা কারণ এই যে তাঁরা ছিলেন বিদেশী এবং বড়লোক।...স্বর্গীয় নফর ভট্ট ছিলেন সেখানকার সবজজ। তার পরে কি করিয়া এই পরিবারের সঙ্গে আমাদের ক্রমশঃ জানাশুনা এবং ঘনিষ্টতা হয়, সে-সব কথা আমার ভাল মনে নাই। বোধ হয় এই জন্যই যে, ধনী হইলেও ইহাদের ধনের উগ্রতা বা দাম্ভিকতা কিছুমাত্র ছিল না। এবং আমি আকৃষ্ট হইয়াছিলাম বোধ হয় এই জন্য বেশীই যে, ইহাদের গৃহে দাবা-খেলার অতি পরিপাটি আয়োজন ছিল। দাবা-খেলার পরিপাটি আয়োজন অর্থে বুঝিতে হইবে—খেলোয়াড়, চা, পান ও মুহুর্মুহু তামাক।

সম্ভবতঃ এই সময়েই...শ্রীমান বিভূতিভূষণ আমাদের সাহিত্য-সভার সভ্য শ্রেণীভুক্ত হন। আমি ছিলাম সভাপতি, কিন্তু আমাদের সাহিত্য-সভায়...গুরু গিরি করিবার অবসর অথবা প্রয়োজন আমার কোন কালেই ঘটে নাই। সপ্তাহে একদিন করিয়া সভা বসিত এবং অভিভাবক গুরুজনদের চোখ এড়াইয়া কোন একটা নির্জন মাঠের মধ্যেই বসিত। জানা আবশ্যক যে সে-সময়ে সে দেশে সাহিত্য-চর্চা একটা গুরুতর অপরাধের মধ্যেই গণ্য ছিল। এই সভায় মাঝে মাঝে...কবিতা পাঠ করা হইত। গিরীন পড়িতে পারিত সব চেয়ে ভাল, সুতরাং এ-ভার তাহার উপরেই ছিল, আমার উপরে নয়। কবিতার দোষগুণ বিচার হইত এবং উপযুক্ত বিবেচিত হইলে সাহিত্য-সভার মাসিক-পত্র 'ছায়া'-য় প্রকাশিত হইত। গিরীন ছিলেন একাধারে সাহিত্য-সভার সম্পাদক, 'ছায়া'-র সম্পাদক ও 'অঙ্গুলী-যন্ত্রে' অধিকাংশ লেখার মুদ্রাকর। এ সম্বন্ধে এই আমার মোটামুটি মনে পড়ে।

সাহিত্য-সভার সভ্যগণের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ছিলেন...বিভূতি। যেমন ছিল তাঁর পড়াশুনা বেশী, তেমনি ছিলেন তিনি ভদ্র এবং বন্ধুবৎসল। সমঝদার সমালোচকও তেমনি।...

ছেলেবেলার লেখা কয়েকটা বই আমার নানা কারণে হারাইয়া গেছে। সব গুলার নাম আমার মনে নাই। শুধু...দুখানা বইয়ের নষ্ট হওয়ার বিবরণ জানি। একখানা—'অভিমান' মস্ত মোটা খাতায় স্পষ্ট করিয়া লেখা, অনেক বন্ধুবান্ধবের হাতে হাতে ফিরিয়া অবশেষে গিয়া পড়িল বাল্যকালের সহপাঠী কেদার সিংহের হাতে। কেদার অনেক দিন ধরিয়া অনেক কথা বলিলেন, কিন্তু ফিরিয়া পাওয়া আর গেল না।...

দ্বিতীয় বই 'শুভদা'। প্রথম যুগের লেখা ওটা ছিল আমার শেষ বই, অর্থাৎ 'বড়দিদি', 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', প্রভৃতির পরে।

আমার শৈশব ও যৌবন ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। অর্থের অভাবেই আমার শিক্ষালাভের সৌভাগ্য ঘটে নি। পিতার নিকট হতে অস্থির স্বভাব ও গভীর সাহিত্যানুরাগ ব্যতীত আমি উত্তরাধিকার সূত্রে আর কিছুই পাই নি। পিতৃদত্ত প্রথম গুণটি আমাকে ঘরছাড়া করেছিল—আমি অল্প বয়সেই সারা ভারত ঘুরে এলাম। আর পিতার দ্বিতীয় গুণের ফলে জীবন ভরে আমি কেবল স্বপ্ন দেখেই গেলাম। আমার পিতার পাণ্ডিত্য ছিল অগাধ। ছোট গল্প, উপন্যাস, নাটক, কবিতা—এক কথায় সাহিত্যের সকল বিভাগেই তিনি হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু কোনটাই তিনি শেষ করতে পারেন নি। তাঁর লেখাগুলি আজ আমার কাছে নেই—কবে কেমন করে হারিয়ে গেছে সে কথা আজ মনে পড়ে না। কিন্তু এখনও স্পষ্ট মনে আছে, ছোটবেলায় কত বার তাঁর অসমাপ্ত লেখাগুলি নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দিয়েছি। কেন তিনি এগুলি শেষ করে যান নি এই বলে কত দুঃখই না করেছি।

অসমাপ্ত অংশগুলি কি হতে পারে ভাবতে ভাবতে আমার অনেক বিনিদ্র রজনী কেটে গেছে। এই কারণেই বোধ হয় সতের বৎসর বয়সের সময় আমি গল্প লিখতে শুরু করি। কিন্তু কিছুদিন বাদে গল্প রচনা অ-কেজোর কাজ মনে করে আমি অভ্যাস ছেড়ে দিলাম। তারপর অনেক বৎসর চলে গেল। আমি যে কোন কালে একটি লাইনও লিখেছি সে কথাও ভুলে গেলাম।

আটার বৎসর পরে একদিন লিখতে আরম্ভ করলাম। কারণটা দৈব দুর্ঘটনারই মত। আমার গুটিকয়েক পুরাতন বন্ধু একটি ছোট মাসিকপত্র বের করতে উদ্যোগী হলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠাবান লেখকদের কেউই এই সামান্য পত্রিকায় লেখা দিতে রাজী হলেন না। নিরুপায় হয়ে কেউ কেউ আমাকে স্মরণ করলেন। বিস্তর চেষ্টায় তাঁরা আমার কাছ থেকে লেখা পাঠাবার কথা আদায় করে নিলেন।

এটা ১৯১৩ সনের কথা। আমি নিমরাজী হয়েছিলাম। কোন রকমে তাঁদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যেই আমি লেখা দিতেও স্বীকৃত হয়েছিলাম। উদ্দেশ্য কোন রকমে একবার রেঙ্গুন পৌঁছতে পারলেই হয়। কিন্তু চিঠির পর চিঠি আর টেলিগ্রামের তাড়া আমাকে অবশেষে সত্য সত্যই আবার কলম ধরতে প্ররোচিত করল। আমি তাঁদের নব প্রকাশিত 'যমুনার' জন্য একটি গল্প পাঠালাম। এই গল্পটি প্রকাশ হতে না হতেই বাংলার পাঠকসমাজে সমাদর লাভ করল। আমিও একদিনেই নাম করে বসলাম। তারপর আমি অদ্যাবধি নিয়মিত-ভাবে লিখে আসছি। বাঙ্গালাদেশে বোধ হয় আমিই একমাত্র সৌভাগ্যবান লেখক যাকে কোন দিন বাধার দুর্ভোগ ভোগ করতে হয় নি।

ছেলেবেলার কথা মনে আছে, পাড়াগাঁয়ে মাছ ধরে, ডোঙা ঠেলে, নৌকা বেয়ে দিন কাটে, বৈচিত্রের লোভে মাঝে মাঝে যাত্রার দলে সাগরেদি করে, তার আনন্দ ও আরাম পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখন গামছা কাঁধে নিরুদ্দেশ-যাত্রায় বা'র হই, ঠিক বিশ্ব-কবির কাব্যের নিরুদ্দেশ-যাত্রা নয়, একটু আলাদা। সেটা শেষ হলে আবার একদিন ক্ষতবিক্ষত পায়ে নির্জীব দেহে ঘরে ফিরে আসি। আদর অভ্যর্থনার পালা শেষ হলে অভিভাবকেরা পুনরায় বিদ্যালয়ে চালান করে দেন। সেখানে আর এক দফা সংবর্ধনা লাভের পর আবার বোধোদয়, পদ্যপাঠে মনোনিবেশ করি। আবার একদিন প্রতিজ্ঞা ভুলি, আবার দুষ্ট সরস্বতী কাঁধে চাপে, আবার সাগরেদি শুরু করি, আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা করে ফিরে আসা, আবার তেমনি তাদের আপ্যায়ন সংবর্ধনার ঘটা—এমনি করে বোধোদয়, পদ্যপাঠ ও বাল্যজীবনের এক অধ্যায় সমাপ্ত হল।

এলাম শহরে, একমাত্র বোধোদয়ের নজিরে গুরুজনেরা ভরতি করে দিলেন ছাত্রবৃত্তি ক্লাসে। তার পাঠ্য—সীতার বনবাস, চারুপাঠ, সদ্ভাবশতক ও মস্ত মোটা ব্যাকরণ। এ শুধু পড়ে যাওয়া নয় মাসিকে সাপ্তাহিকে সমালোচনা লেখা নয়, এ পণ্ডিতের কাছে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রতিদিন পরীক্ষা দেওয়া। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা চলে, যে, সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটলো চোখের জলে। তার পরে বড় দুঃখে আর একদিন সে মিয়াদও কাটলো। তখন ধারণাও ছিল না যে, মানুষকে দুঃখ দেওয়া ছাড়া সাহিত্যের আর কোন উদ্দেশ্য আছে।

যে পরিবারে আমি মানুষ, সেখানে কাব্য উপন্যাস দুর্নীতির নামান্তর, সংগীত অস্পৃশ্য; সেখানে সবাই চায় পাস করতে এবং উকিল হতে, এরি মাঝখানে

আমার দিন কেটে চলে। কিন্তু হঠাৎ একদিন এর মাঝেও বিপর্যয় ঘটলো। আমার এক আত্মীয় তখন বিদেশে থেকে কলেজে পড়তেন, তিনি এলেন বাড়ি। তাঁর ছিল সংগীতে অনুরাগ ; কাব্যে আসক্তি ; বাড়ির মেয়েদের জড় করে তিনি একদিন পড়ে শুনালেন রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। কে কতটা বুঝলে জানিনে, কিন্তু যিনি পড়ছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার চোখেও জল এলো। কিন্তু পাছে দুর্বলতা প্রকাশ পায়, এই লজ্জায় তাড়াতাড়ি বাইরে চলে এলাম। কিন্তু কাব্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বার পরিচয় ঘটলো এবং বেশ মনে পড়ে এইবারে পেলাম তার প্রথম সত্য পরিচয়।

এর পরে এ বাড়ির উকিল হবার কঠোর নিয়ম-সংযম আর ধাতে সইল না ; আবার ফিরতে হলো আমাদের সেই পুরনো পল্লীভবনে। কিন্তু এবার আর বোধোদয় নয়, বাবার ভাঙা দেরাজ থেকে খুঁজে বের করলাম 'হরিদাসের গুপ্ত কথা', আর বেরোলো 'ভবানী পাঠক'। গুরুজনদের দোষ দিতে পারিনে, স্কুলের পাঠ্য তো নয়, ওগুলো বদছেলের অপাঠ্য পুস্তক। তাই পড়বার ঠাঁই করে নিতে হলো আমাকে বাড়ির গোয়ালঘরে। সেখানে আমি পড়ি, তারা শোনে। এখন আর পড়িনে, লিখি। সেগুলো কারা পড়ে জানিনে। একই স্কুলে বেশীদিন পড়লে বিদ্যা হয় না, মাষ্টারমশাই স্নেহবশে একদিন এই ইঙ্গিতটুকু দিলেন। অতএব আবার ফিরতে হলো শহরে। বলা ভাল, এর পরে আর স্কুল বদলাবার প্রয়োজন হয় নি। এইবার খবর পেলাম বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর। উপন্যাস-সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে তখন ভাবতেও পারতাম না, পড়ে পড়ে বইগুলো যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধহয়, এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়, লেখার দিক্ দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে ; কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।

তারপরে এল বঙ্গদর্শনের নবপর্যায়ের যুগ, রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' তখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছে। ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর একটা নূতন আলো এসে যেন চোখে পড়ল। সে দিনের সে গভীর ও সুতীক্ষ্ণ আনন্দের স্মৃতি আমি কোন দিন ভুলব না। কোন কিছু যে এমন করে বলা যায়, অপরের কল্পনায় ছবিতে নিজের মনটাকে যে পাঠক এমন চোখ দিয়ে দেখতে পায়, এর পূর্বে কখন স্বপ্নেও ভাবি নি। এত দিনে শুধু কেবল সাহিত্যের নয়, নিজেরও যেন একটা পরিচয় পেলাম। অনেক পড়লেই যে তবে অনেক পাওয়া যায়, এ কথা সত্য নয়। ওইতো খানকয়েক পাতা, তার মধ্য দিয়ে যিনি এত

বড় সম্পদ সে দিন আমাদের হাতে পৌঁছে দিলেন, তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা পাওয়া যাবে কোথায় ?

এর পরেই সাহিত্যের সঙ্গে হলো আমার ছাড়াছাড়ি। ভুলেই গেলাম যে, জীবনে একটা ছত্রও কোন দিন লিখেছি। দীর্ঘকাল কাটলো প্রবাসে,—ইতি-মধ্যে কবিকে কেন্দ্র করে কিকরে নবীন বাঙলা সাহিত্য দ্রুতবেগে সমৃদ্ধিতে ভরে উঠলো, আমি তার কোন খবরই জানিনে। কবির সঙ্গে কোন দিন ঘনিষ্ঠ হবারও সৌভাগ্য ঘটে নি। তাঁর কাছে বসে সাহিত্যের শিক্ষা গ্রহণেরও সুযোগ পাই নি, আমি ছিলাম একেবারেই বিচ্ছিন্ন; এইটা হলো বাইরের সত্য, কিন্তু অন্তরের সত্য সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই বিদেশে আমার সঙ্গে ছিল কবির খানকয়েক বই—কাব্য ও সাহিত্য ; এবং মনের মধ্যে ছিল পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। তখন ঘুরে ঘুরে ওই ক'খানা বই-ই বার বার করে পড়েছি,—কি তার ছন্দ, কটা তার অক্ষর, কাকে বলে আর্ট, কি তার সংজ্ঞা, ওজন মিলিয়ে কোথাও কোন ত্রুটি ঘটেছে কিনা,—এসব বড় কথা কখনো চিন্তাও করিনি—ওসব ছিল আমার কাছে বাহুল্য। শুধু সুদৃঢ় প্রত্যয়ের আকারে মনের মধ্যে এইটুকু ছিল যে, এর চেয়ে পূর্ণতর সৃষ্টি আর কিছু হতেই পারে না। কি কাব্যে, কি কথা-সাহিত্যে, আমার ছিল এই পুঁজি।

একদিন অপ্রত্যাশিতভাবে হঠাৎ যখন সাহিত্য সেবার ডাক এলো, তখন যৌবনের দাবি শেষ করে প্রৌঢ়ত্বের এলাকায় পা দিয়েছি। দেহ শ্রান্ত উদ্যম সীমাবদ্ধ—শেখবার বয়স পার হয়ে গেছে। থাকি প্রবাসে, সব থেকে বিচ্ছিন্ন, সকলের কাছে অপরিচিত, কিন্তু আহ্বানে সাড়া দিলাম,—ভয়ের কথা মনেই হল না। আর কোথাও না হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি।

...নানা অবস্থা বিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন দেখা যাদের পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতিই আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটুকু রেখে গেছে, ত্রুটি, বিচ্যুতি, অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব, সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি। হেতু যত বড়ই হোক মানুষের প্রতি মানুষের ঘৃণা জন্মে যায়, আমার লেখা কোনদিন যেন না এত বড় প্রশ্রয় পায়।'

শরৎচন্দ্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নর্মাল স্কুলে সীতার বনবাস পড়া শেষ হলো। সমাসদর্পণ ও লোহারামের ব্যাকরণের যোগে তার পরীক্ষাও দিয়েছি। পাস করে থাকব কিন্তু পারিতোষিক পাই নি। যাঁরা পেয়েছিলেন তাঁরা সওদাগরী আপিস পার হ'য়ে আজ পেন্‌সন ভোগ ক'রচেন।

এমন সময় বঙ্গদর্শন বাহির হোলো। তা'তে নানা বিষয়ে নানা প্রবন্ধ বেরিয়ে ছিল—তখনকার মননশীল পাঠকেরা আশা করি তা'র মর্য্যাদা বুঝেছিলেন। তাঁদের সংখ্যা এখনকার চেয়ে তখন যে বেশি ছিল তা নয় কিন্তু প্রভেদ এই যে তখনকার পাঠকেরা এখনকার মতো এত বেশি প্রশ্রয় পান নি। মাসিক পত্রিকা, বলতে গেলে, ঐ একখানিই ছিল। কাজেই সাধারণ পাঠকের মুখরোচক সামগ্রীর বরাদ্দ অপরিমিত ছিল না। তাই পড়বার মনটা অতিমাত্র বিলাসী হ'য়ে যায়নি। সামনে পাত সাজিয়ে যা কিছু দেওয়া যেত তা'র কিছুই প্রায় ফেলা যেত না। পাঠকদের আপন করমাসের জোর তখন ছিল না ব'ললেই হয়।

কিন্তু রসের এই তৃপ্তি রসদের বিরলতা বশতই এটা বেশি বলা হলো। বঙ্গদর্শনের প্রাঙ্গণে পাঠকেরা যে এত বেশি ভিড় ক'রে এল তা'র প্রধান কারণ, ওর ভাষাতে তাদের ডাক দিয়েছিল। আধুনিক বাংলা ভাষার প্রথম আবির্ভাব ঐ পত্রিকায়। এর পূর্বে বাঙ্গালীর আপন মনের ভাষা সাহিত্যে স্থান পায় নি। অর্থাৎ ভাষার দিক থেকে দেখলে তখন সাহিত্য ছিল ভাসুরের বৈঠক, ভাদ্র বৌ ঘোমটা টেনে তাকে দূরে বাঁচিয়ে চলত, তা'র জায়গা ছিল অন্দরমহলে। বাংলা-দেশে স্ত্রী স্বাধীনতা যেমন ঘেরাটোপ ঢাকা পাল্কী থেকে অল্পে অল্পে বেরিয়ে আসচে, ভাষার স্বাধীনতাও তেমনি। বঙ্গদর্শনে সব প্রথম ঘেড়াটোপটা তোলা হয়েছিল। তখনকার সাহিত্যিক স্মার্ত্ত পণ্ডিতরা সেই দুঃসাহসকে গঞ্জনা দিয়ে গুরুচণ্ডালী ব'লে জাতে ঠেলবার চেষ্টায় ছিলেন। কিন্তু পাল্কীর দরজার ফাঁক দিয়ে সেই যে বাংলা ভাষার সহাস্য মুখ প্রথম একটুখানি দেখা গেল তাতে

ধিক্কার যতই উঠুক এক মুহূর্তেই বাঙ্গালী পাঠকের মন ভুলেছিল। তা'র পর থেকে দরজা ফাঁক হয়েই চ'লেছে।

প্রবন্ধের কথা যাক্। বঙ্গদর্শনে যে জিনিসটা সেদিন বাংলা দেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী মৃণালিনী কপাল-কুণ্ডলা লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী। ইংরাজিতে যাকে বলে রোম্যান্স্। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ। যেমন দূর দিগন্তের নীলিমায় অরণ্য পর্বতকে একটা অস্পষ্টতার অপ্রাকৃত সৌন্দর্য দেয় এও তেমনি। সেই দৃশ্য ছবির প্রধান গুণ হচ্ছে তা'র রেখার সুষমা, অন্য পরিচয় নয়, কেবল তা'র সমগ্র ছন্দের ভঙ্গিমা। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলায় সেই রূপের কুহক আছে। তা যদি রঙীন কুহেলিকায় রচিত হয় তবুও তা'র রস আছে।

কিন্তু নদী গ্রাম প্রান্তরের ছবি আর সূর্যাস্তকালের রঙীন মেঘের ছবি এক দামের জিনিস নয়। সৌন্দর্যলোক থেকে এদের কাউকেই বর্জন করা চলে না, তবু বলতে হবে ঐ জনপদের চেহারায় আমাদের তৃপ্তির পূর্ণতা বেশি। উপন্যাসে কাহিনী ও কথা উভয়ের সামঞ্জস্য থাকলে ভালো—নাও যদি থাকে তবে বস্তু পদার্থটার অভাবে দুধ খেতে গিয়ে শুধু ফেনাটাই মুখে ঠেকে, তার উচ্ছ্বাসটা দেখতে মানায় কিন্তু সেটা ভোগে লাগে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের গোড়ার দিকের তিনটে কাহিনী যেন দৃঢ় অবলম্বন পায়নি—তাদের সাজ সজ্জা আছে কিন্তু পরিচয় পত্র নেই। তা'রা ইতিহাসের ভাঙা ভেলা আঁকড়ে ভেসে এসেছে। তাদের বিনা তর্কে মেনে নিতে হয়, কেননা তা'রা বর্তমানের সামগ্রী নয়, তা'রা যে-অতীতে বিরাজ করে, সে-অতীতকে ইতিহাসের আদর্শেও সওয়াল জবাব করা চলে না, আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার আদর্শেও নয়। সেখানে বিমলা আয়েষা জগৎ-সিংহ কপালকুণ্ডলা নবকুমার প্রভৃতি যা খুশি তাই করতে পারে কেবল তাদের এইটুকু বাঁচিয়ে চ'লতে হয় যে পাঠকের মনোরঞ্জনে ত্রুটি না ঘটে।

আরব্য উপন্যাসও কাহিনী, কিন্তু সে হোলো বিশুদ্ধ কাহিনী। সম্ভবপরতার জবাবদিহী তা'র একেবারেই নেই। জাদুকর গোড়া থেকে স্পষ্ট করেই ব'লচে, এ আমার অসম্ভবের ইন্দ্রজাল, সত্য মিথ্যা যাচাই করার দায় সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের খুসি করব—যেখানে সবই ঘটতে পারে সেখানে এমন কিছু

ঘটায়, যাতে তোমরা শাহারজাদীকে বলবে, থেমো না, রাত্রির পর রাত্রি যাবে কেটে।

কিন্তু যে সব কাহিনীর কথা পূর্বে ব'লেচি সেগুলি দো-আঁসলা, তা'রা খুসি ক'রতে চায়, সেই সঙ্গে খানিকটা বিশ্বাস করাতেও চায়। বিশ্বাস করতে পারলে মন যে-নির্ভর পায় তা'র একটি আরাম আছে। কিন্তু যে-গল্পগুলি বিশুদ্ধ কাহিনী নয়, কাহিনী প্রায়, তাদের মধ্যে মনটা ডুব জলে সঞ্চরণ করে, তলায় কোথাও মাটি আছে কি নেই সে কথাটা স্পষ্ট হয় না, ধ'রে নিই যে মাটি আছে বৈ কি।

বিষবৃক্ষ কাহিনী এসে পৌঁছল আখ্যানে। যে-পরিচয় নিয়ে সে এল তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে। সাহিত্য থেকে অস্পষ্টতার আবরণ এক পর্দা উঠে গেল—ক্লাসিক্যাল অস্পষ্টতা বা রোম্যানটিক অস্পষ্টতা, অর্থাৎ ধ্রুপদী দূরত্ব বা খেয়ালী দূরত্ব, সীতার বনবাসের ছাঁদ বা রাজপুত কাহিনীর ছাঁদ। মনে পড়ে আমার অল্প বয়সের কথা। তখন চোখে কম দেখতুম অথচ জানতুম না কম দেখি। ঐ কম দেখাটাকেই স্বাভাবিক ব'লে জানতুম, কোনো নালিশ ছিল না। এমন সময় হঠাৎ চশমা পরে জগৎটা যখন স্পষ্টতর হোলো তখন ভারি আনন্দ পেলুম। বিজয় বসন্তে ও একদিন বাঙ্গালী পাঠক সন্তুষ্ট ছিল, তখন সে জানত না গল্পে এর চেয়ে স্পষ্টতর জগৎ আছে। তা'র পরে দুর্গেশনন্দিনীতে চমক লাগল, এটা তার কাছে অভূতপূর্ব দান। কিন্তু তখনো ঠিক চশমাটি সে পায় নি, তবু দুঃখ ছিল না, কেননা জানত না যে সে পায় নি। এমন সময়েই বিষবৃক্ষ দেখা দিল। কৃষ্ণকান্তের উইল সেই জাতেরই, সে যেন আরো স্পষ্ট।

তার পরে এলেন প্রচারক বঙ্কিম। আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণি, সীতারাম একে একে আসরে এসে উপস্থিত, গল্প বলবার জন্য নয়, উপদেশ দেবার জন্যে। আবার অস্পষ্টতা সাধু অভিপ্রায়ের গৌরব গর্বে সাহিত্যে উচ্চ আসন অধিকার ক'রে বসল।

আনন্দমঠ আদর পেয়েছিল, কিন্তু সাহিত্য রসের আদর সে নয়, দেশাভিমানের। এক এক সময়ে জনসাধারণের মন যখন রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক বা ধর্মসাম্প্রদায়িক উত্তেজনায় বিচলিত হ'য়ে থাকে সেই সময়টা সাহিত্যের পক্ষে দুর্যোগের সময়। তখন পাঠকের মন অল্পেই ভোলানো চলে। শুঁটকি মাছের প্রতি আসক্তি যদি অত্যন্ত বেশি হয় তাহ'লে রাঁধবার নৈপুণ্য অনাবশ্যক হয়ে ওঠে। ঐ জিনিসটার গন্ধ থাকলেই তরকারির আর অনাদর ঘটে না। সাময়িক সমস্যা এবং চলতি সেন্টিমেন্ট ত সাহিত্যের পক্ষে কচুরিপানার মতোই, তাদের

জন্যে আবাদের প্রয়োজন হয় না, রসের স্রোতকে আপন জোরেই আচ্ছন্ন করে দেয়।

আধুনিক য়ুরোপে এই দশা ঘটেচে,—সেখানে আর্থিক সমস্যা, স্ত্রীপুরুষের সমস্যা, বিজ্ঞান ও ধর্মের দ্বন্দ্ব সমস্যায় সমাজে একটা বিপর্যয় কাণ্ড চলচে। লোকের মন তাতে এত বেশি প্রবলভাবে ব্যাপৃত যে, সাহিত্যে তাদের অনধিকার প্রবেশ ঠেকিয়ে রাখা দায়, নভেলগুলি গল্পের মশলা মাখানো প্রবন্ধ হয়ে উঠল। এতে করে সাহিত্যে যে স্তূপাকার আবর্জনা জমে উঠেছে সেটা আজকের পাঠকদের উপলব্ধিতে পৌঁচচ্ছে না, কেননা আজ সাহিত্যের বাহিরের মাল নিয়ে তাদের মন ষোল আনা ভীত হয়ে রয়েচে। আরেক যুগে এই সব আবর্জনা বিদায় করবার জন্যে গাড়ীতে যমের বাহন মহিষ অনেকগুলি জুৎতে হবে।

আমার বক্তব্য এই যে আর্টিষ্টের, সাহিত্যিকের প্রধান কাজ হ'চ্চে দেখানো, বিশ্বরসের পরিচয়ে আবরণ যত কিছু আছে তাকে অপসারণ করা। রসের জগৎকে স্পষ্ট ক'রে মানুষের কাছে এনে দেওয়া, মানুষের একান্ত আপন ক'রে তোলা।

সীতার বনবাস ইস্কুলে পড়েছিলেম। সেটা ইস্কুলেরই সামগ্রী। বিষবৃক্ষ পড়েছিলুম ঘরে, সেটা ঘরেরই জিনিস। সাহিত্যটা ইস্কুলের নয়, ওটা ঘরের। বিশ্বের আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ করবার জন্যেই সাহিত্য।

বিষবৃক্ষের পর কৃষ্ণকান্তের উইলে অনেকদিন কেটে গেল। আবার দেখি গল্প সাহিত্যে আরেকটা যুগ এসেছে। অর্থাৎ আরও একটা পর্দা উঠল। সেদিন যেমন ভীড় ক'রে রবাহুতের দল জুটেছিল সাহিত্যের প্রাঙ্গণে আজও তেমনি জুটেছে। তেমনি উৎসাহ তেমনি আনন্দ, তেমনি জনতা। এবারে নিমন্ত্রণকর্তা শরৎচন্দ্র। তাঁর গল্পে যে-রসকে তিনি নিবিড় করে জাগিয়েছেন সে হচ্চে সুপরিচয়ের রস। তাঁর সৃষ্টি পাঠকের আরো অনেক কাছে এসে পৌঁছল। তিনি নিজে দেখেচেন বিস্তৃত করে স্পষ্ট করে, দেখিয়েচেন তেমনি সুগোচর ক'রে। তিনি রঙ্গমঞ্চের পট উঠিয়ে দিয়ে বাঙালী সংসারের যে আলোকিত দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত ক'রেচেন সেইখানে আধুনিক লেখকদের প্রবেশ সহজ হ'ল। তাদের আনাগোনাও চ'লচে। একদিন তা'রা হয়তো সে কথা ভুলবে এবং তাঁকে স্বীকার করতে চাইবে না। কিন্তু আশাকরি পাঠকেরা ভুলবে না। যদি ভুলে তবে সেটা তাদের অকৃতজ্ঞতা হবে। তাও যদি হয় তাতে দুঃখ নেই; কাজ সমাপ্ত হ'য়ে গেলে সেইটেই যথেষ্ট। কৃতজ্ঞতাটা উপরি পাওনা মাত্রই; না জুটলেও নালিশ না করাই ভাল। নালিশের সময়ও বেশি থাকে না, কারণ সবশেষে যার পালা তিনি যদি বা দলিল-গুলোকে রক্ষা করেন স্বত্বাধিকারীকে পার ক'রে দেন বৈতরণীর ওপারে।

যুগ-প্রকাশক শরৎচন্দ্র

বিপিন চন্দ্র পাল

শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের বিশেষত্ব এই যে, তাহা এক অর্থে বস্তুতন্ত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব সৃষ্টিতে একটা আদর্শের প্রাণোন্মাদিনী উদ্দীপনা প্রাপ্ত হই। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের যে যুগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনি সে যুগের স্রষ্টা। তিনি ভবিষ্যতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—যাহা হইবে এবং যাহা হওয়াই বিহিত তাহাই দেখিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কালের যবনিকা তুলিয়া সেই আদর্শের অনুসরণে আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রসসৃষ্টিতে সমাজে তখনও যাহা ফুটিয়া উঠে নাই, কিন্তু যাহা ফোটা সমাজের কল্যাণের জন্য প্রয়োজন এবং যাহা ফোটা অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী; তাহাই আমরা দেখিয়াছিলাম। এই জন্যই তাঁহাকে যুগস্রষ্টা বলি। শরৎচন্দ্র যুগস্রষ্টা নহেন, কিন্তু যুগ-প্রকাশক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সমসাময়িক লোকেরা যাহা দেখিতে পায় নাই তাহাই আঁকিয়াছিলেন। সেই অদৃষ্ট আদর্শকে চিত্তলুব্ধকর বর্ণবিন্যাসের দ্বারা সাজাইয়া আমাদের সম্মুখে ধরিয়াছিলেন। এই রূপেই তিনি বাঙলাসাহিত্যে এবং শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে এক নূতন যুগের সৃষ্টি করেন। বঙ্কিমের রসসৃষ্টিতে সমাজে যাহা ছিল, ঠিক তাহা ততটা দেখিতে পাই নাই, যতটা সমাজের গতি কোন্ দিকে চলিয়াছে, কোন্ পরিণামকে অজ্ঞাতসারে লক্ষ্য করিয়া তাহার সমসাময়িক সমাজ ছুটিয়াছিল, তাহার সন্ধান পাইয়াছিলাম। বঙ্কিম-সাহিত্য বস্তুতন্ত্রহীন ছিল এমন কথা বলা যায় না। তবে তাঁহার সৃষ্টির উপাদানবস্তু ছিল—বাহিরের সমাজের বিধিব্যবস্থা তত নহে, যত সেকালের লোকের অন্তরের আদর্শ ও আকাঙক্ষা। শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির উপাদান, যাহা হইবে বা হইতে পারে তাহা নহে, কিন্তু যাহা আছে তাহাই। এই জন্য শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে এমন একটা বস্তুতন্ত্রতা দেখিতে পাই যাহা এক অর্থে বঙ্কিমচন্দ্রেও দেখিতে পাই নাই। বঙ্কিমযুগে কেবল একখানি মাত্র উপন্যাস ছিল সমাজচিত্র হিসাবে যাহা বাস্তবিক বস্তুতন্ত্র ছিল। সে খানি স্বর্গীয় তারকনাথ গাঙ্গুলীর "স্বর্ণলতা"। কিন্তু স্বর্ণলতা প্রকৃতপক্ষে সমাজের একটা বিশেষ চিত্রকেই ফুটাইয়া তুলিয়াছিল, সে চিত্র বাঙালী হিন্দুর একান্নবর্ত্তী পরিবারের তখনকার চিত্র। এ ছাড়া এ অর্থে সে যুগে আর একখানিও বস্তুতন্ত্র বাঙলা উপন্যাস ছিল না বলিলেও হয়।

শরৎচন্দ্রের আমি যতটুকু পরিচয় পাইয়াছি, তাহাতে মনে হয় তিনি বাঙ্গালার

বর্ত্তমান সমাজচিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। তাঁহার "পল্লীসমাজ" ইহার প্রথম পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁকে চিত্রকর বলিতেছি, ফটোগ্রাফার নহে। ফটোগ্রাফ উঠে কলে; ফটোগ্রাফারের দক্ষতা যন্ত্র ব্যবহারে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বস্তুর উপরে বাহিরের আলোকপাতের নিপুণতায়। কিন্তু চিত্র কলে উঠে না, চিত্রকরের মনে। চিত্রকর চোখে যাহা দেখেন, তাহার উপর রসের আলোক ফেলিয়া, দৃষ্টের সঙ্গে অদৃষ্টের মাথামাখি করাইয়া চিত্র সৃষ্টি করেন। শরৎচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস এই জন্য ফটোগ্রাফ নহে, চিত্র। আমি যতটা দেখিয়াছি, তাহাতে শরৎচন্দ্রের বড় সৃষ্টি আমার মনে হয়, "শ্রীকান্ত" এবং শ্রীকান্তেব সখা, গুরু, সুহৃদ. ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালা সাহিত্যে অপূর্ব্ব সৃষ্টি। ইন্দ্রনাথের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গালার নবযৌবন মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। বহু শতাব্দীব্যাপী বন্ধনের বেদনায় নিষ্পিষ্ট বাঙ্গালাব যৌবন আজ সকল বন্ধন ছিঁড়িয়া কাটিয়া অদম্য বেগে আপনার অন্তরের উল্লাসে অজ্ঞাত পথে ছুটিয়াছে। ছোট বড় কোন বন্ধন সে মানে না, জানিতে চাহে না। কোন ভয়ের ধার সে ধারে না; কোন ফলাফল চিন্তা সে করে না। আপনার যৌবনকে পরিপূর্ণরূপে সার্থক করিবার জন্য চারিদিকে সে ছটফট করিতেছে; ইন্দ্রনাথের মধ্যে শরৎচন্দ্র সমাজেরও আবার আবেষ্টনের ভিতর দিয়া বাঙ্গালার নবযুগের বিদ্রোহী যৌবনকে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলিয়াছেন। এ চিত্র বাঙ্গালী ধুতিচাদরে সজ্জিত বটে, কিন্তু বিশ্বজনীন যৌবনের চিত্র। গ্রীকশিল্পী যেমন পাথরে Apollo velvedere এপোলো ভেলভিডিয়ারের ছবি খুদিয়া বিশ্ব যৌবনের দেহকে চিরদিনের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, আমাদের শরৎচন্দ্র সেইরূপ বিশ্ব যৌবনের মনকে বাঙ্গালা ভাষায় ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। আমার মনে হয় ইহাই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির সর্ব্বশ্রেষ্ট বস্তু; তাঁহার সকল বই পড়ি নাই, কিন্তু একটু আধটু উপরে উপরে যাহা দেখিয়াছি তাহাতে মনে হয় এই উদ্দাম যৌবনই তাঁহার শ্রেষ্ট সৃষ্টি।

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে শরৎচন্দ্রের এই উদ্দাম যৌবন চিত্রে অসংযত যৌবনপ্রবৃত্তি বা ইন্দ্রিয়লালসা ফুটিয়া উঠে নাই। তাঁহার যতটুকু আমি দেখিয়াছি, তাহাতে আদিরসের প্রকট মূর্ত্তি দেখিতে পাই নাই; আনন্দমঠেও যেটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে, সন্ন্যাসীর আশ্রমে শান্তি ও জীবানন্দের হুড়োহুড়ি জড়াজড়িতে—ততটুকু পর্যন্তও—আমি যতটুকু শরৎচন্দ্রের রসসৃষ্টি দেখিয়াছি—ইহাতে ফুটিয়া উঠে নাই। যাঁহারা শরৎচন্দ্রের অধিকাংশ গ্রন্থ অভিনিবেশ সহকারে পড়িয়াছেন, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি যে শরৎচন্দ্রের নারীচিত্র অপূর্ব্ব বস্তু; শরৎচন্দ্রের

নায়িকারা নিজেরা অতিশয় সংযমী। আপনার প্রকৃতিতে রমণী সর্ব্বত্রই সংযমী; যে মা হইয়া মানুষের সৃষ্টিপ্রবাহ রক্ষা করিবে, বিধাতা তাহাকে সংযমী করিয়াই গড়িয়াছেন। আজ শরৎচন্দ্র নারী প্রকৃতির এই বিশ্বজননী ধর্ম্মকে তাঁহার নায়িকাদের মধ্যে ফুটাইয়া, কি গৃহে, কি সমাজে, কি তাঁহার "পথের দাবীতে" বিদ্রোহী বিপ্লবপন্থীদের দলে, সর্ব্বত্র পুরুষদিগের উপরে নারীর অসাধারণ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আদিরস যে শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে নাই, এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু বহুদিন হইতে বাঙ্গালী রসসৃষ্টি করিতে যাইয়া যে আদিরসের "হোলি" খেলিয়াছে, শরৎচন্দ্র আমি যতটুকু দেখিয়াছি—তাহা করেন নাই। তাঁহার সৃষ্টিতে কাম অপেক্ষা প্রেম বেশী ফুটিয়াছে; "পথের দাবীতে এই প্রেম শানিত ক্ষুরধারের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। সুমিত্রা এবং ভারতীর চিত্র এ বিষয়ে অপূর্ব সৃষ্টি।

শরৎচন্দ্রের "পথের দাবী" শুনিয়াছি এত বিক্রী হইয়াছিল, যাহা নাকি তাঁহার বা অন্য কোন বাঙ্গালা ঔপন্যাসিকের বই এত অল্প সময়ের মধ্যে হয় নাই। ইহার কারণ বুঝা কঠিন নহে। "আনন্দমঠ" এবং "পথের দাবী" একদিক দিয়া দেখিলে হঠাৎ একই জাতীয় বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে; "আনন্দমঠ" একটা উচ্চ আদর্শ দিয়াছে। সে আদর্শ বিদ্রোহ নহে, সে আদর্শ বিপ্লব নহে, সে আদর্শ অরাজকতা নহে। বিদ্রোহ জাগাইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র বজ্রনির্ঘোষে কহিয়াছেন—"বিদ্রোহী আত্মঘাতী"; "আনন্দমঠ" মুসলমানের অরাজকতাকে নষ্ট করিবার জন্য নামাবশিষ্ট মাত্র রাজশক্তিকে ধ্বংস করিয়াছিল; কিন্তু অরাজকতাকে লক্ষ্য বলিয়া অনুসরণ করে নাই। "আনন্দমঠ" স্বদেশপূজার শাস্ত্র, কিন্তু যে স্বদেশপ্রীতি পরজাতি বিদ্বেষের দ্বারা প্রণোদিত, তাহাকে হেয় ও ঘৃণ্য বলিয়া প্রচার করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই সকল কারণেই "আনন্দমঠ" প্রকৃতপক্ষে মুমুক্ষুর তীব্র বন্ধনবেদনাপ্রসূত সান্নিপাতবিকারের চিহ্নমাত্র। "পথের দাবী" পথের মাঝখানেই শেষ হইয়াছে, গন্তব্যে কেবল পৌঁছায় নাই তাহা নহে, গন্তব্যের সঙ্কেত পর্য্যন্ত দেয় নাই। শরৎচন্দ্র যদি একটা ফ্যান্সি চিত্র আঁকিতেন তাহা হইলে তিনি সহজেই "পথের দাবী" কে ঠেলিয়া নিয়া আপনার লক্ষ্যস্থলে তুলিতে পারিতেন। কিন্তু তাহা অন্যদিকে যতই মনোহর বা সমীচীন হউক না কেন, যে কালের ও সমাজের চিত্র আঁকিতে বসিয়াছিলেন, তাহার সম্বন্ধে বস্তুতন্ত্র হইত না। আর এইজন্যই আমার মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন যুগস্রষ্টা, শরৎচন্দ্র হইয়াছেন যুগ-প্রকাশক।

বৌদ্ধ শূন্যবাদ ও শরৎচন্দ্র

কবি নরেন্দ্র দেব

শরৎচন্দ্রের তিরোভাবের কিছুদিন পরেই কোনও এক সাহিত্য সভায় "উপন্যাসের ক্রমবিকাশ" সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাহিত্যবন্ধু শ্রীবুদ্ধদেব বলেছিলেন, শরৎচন্দ্রের ভাল রচনা উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। আকারে দীর্ঘ হলেও সেগুলি ছোট গল্পের পর্যায়-ভুক্ত। উপন্যাসে বহু চরিত্র, বিচিত্র ঘটনা ও জটিলতার সমাবেশ চাই।" সেই বক্তৃতারই অন্যত্র তিনি বলেছেন, "২।১ খানি ছাড়া ৫০০ পৃষ্ঠার কম য়ুরোপে উপন্যাসই নাই।"

বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুযায়ী যদি পৃষ্ঠা সংখ্যা গ্রন্থের আয়তনই হয় উপন্যাসের একটি বিশেষ লক্ষণ তাহলে আমরা তাঁকে পৃষ্ঠা গণনা করে দেখতে বলি যে শরৎচন্দ্রের "শ্রীকান্ত" উপন্যাসখানি আয়তনে ৮২৯ পৃষ্ঠা, এবং যেহেতু শ্রীবিষ্ণুদের মতেও শরৎচন্দ্রের ভাল রচনার মধ্যে 'শ্রীকান্ত' অন্যতম, সুতরাং এখন বিচার করে দেখা যাক্ এটি উপন্যাসের পর্য্যায় পড়ে কিনা অথবা "ছোট-গল্পের পর্যায়ভুক্ত!"

বৌদ্ধ শাস্ত্র অনুযায়ী "উপন্যাসে বহু চরিত্র, বিচিত্র ঘটনা, ও জটিলতার সমাবেশ থাকা চাই।"

শ্রীকান্তের পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন যে শ্রীবুদ্ধদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত উপন্যাসের লক্ষণগুলি—অর্থাৎ 'বহুচরিত্র' 'বিচিত্র ঘটনা ও জটিলতার সমাবেশ' শ্রীকান্তের মধ্যে প্রচুর আছে। দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করি।

উপন্যাসের আঙ্গিক নির্ধারণে শ্রীবুদ্ধদেব বলেছেন, "মানুষের প্রত্যক্ষ সুখদুঃখ নিয়া ইহা কারবার করে।" শ্রীকান্তের মধ্যে বিবিধ শ্রেণীর নরনারীর প্রত্যক্ষ সুখ-দুঃখ নিয়ে কারবার এত বেশী যে শ্রীবুদ্ধদেবের উপন্যাস জাতক অনুযায়ী সেটাকে পাইকারী কারবারও বলা চলে। সুতরাং শ্রীকান্ত তাঁর কথা মতো ছোট গল্পের জাতেও উঠতে পারছে না।

বড় ঔপন্যাসিক বলে শ্রীবুদ্ধদেব তাকেই স্বীকার করতে প্রস্তুত, "যাহার লেখায় খটকা লাগিবে না।" 'শ্রীকান্ত' বইখানির মধ্যে 'বিচিত্র-ঘটনা' ও জটিলতর সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও পাঠক পাঠিকাদের কোথাও 'খটকা লাগে' বলে এ পর্যন্ত

কোনো অভিযোগ শোনা যায় নি। শ্রীবুদ্ধদেবের শ্রীমুখ থেকেও নয়। সুতরাং শরৎচন্দ্রকে একজন বড় ঔপন্যাসিক বলে স্বীকার করে নিতে সাহিত্যের তথাগত শ্রীবুদ্ধদেবের আপত্তির ভিত্তি কোথায়? স্বাভিরুচির প্রতি দুর্বলতা সমালোচকের পক্ষে নিন্দনীয় বলেই মনে করি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর যাই থাক, যথেচ্ছাচারের স্থান নেই। বিচারে প্রমাণিত হচ্ছে যে শরৎচন্দ্রের 'শ্রীকান্ত' আকারে দীর্ঘ হলেও 'ছোট গল্পের পর্যায়ভুক্ত' এরূপ হাস্যকর উক্তি 'শ্রীকান্ত' যিনি পড়েন নি বা ছোট গল্প ও উপন্যাসের লক্ষণ সম্বন্ধে যাঁর সুস্পষ্ট ও সম্যক জ্ঞানের একান্ত অভাব; একমাত্র তিনিই বলতে সাহস করবেন। তবে, হ্যাঁ, একথা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে 'শ্রীকান্ত' বৈদেশিক দৃষ্টিভঙ্গীর চশমা এঁটে ও 'কন্টিনেন্টাল' মনোবৃত্তির অনুকরণে, বিদেশের ধারকরা মালমশলা নিয়ে লেখা তথাকথিত ব্যর্থ বাংলা উপন্যাস নয়। নিজের দেশের মাটী ও জল হাওয়ার মধ্যে জাতীয় চরিত্র ও তার সুখ-দুঃখ, ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা, শ্রীকান্তের মধ্যে নিরপেক্ষ নৈপুণ্যে মূর্ত্ত। এই সুখ-দুঃখের চিত্র, আনন্দ বেদনার অনুভূতি স্বদেশ ও স্বজাতির সীমা উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্বমানবের আবেদ্য হয়ে উঠতে পেরেছে।

'বিঘে খানেক সবুজ ঘাস' (An Acre of green grass) নামে বাংলা ভাষা অনভিজ্ঞ পাঠকদের জন্য তিনি ইংরেজী ভাষায় সম্প্রতি যে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের এক অতি অক্ষম সমালোচনা লিখে বিদেশী প্রকাশকদের প্রবঞ্চিত করেছেন সে বইখানি যাঁরা পড়বেন তাঁরা শুধু এই কথাটুকুই জানতে পারবেন যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্য উল্লেখযোগ্য লেখক বলতে বিশেষ কারুর নাম করা যায় না এবং উল্লেখযোগ্য সাহিত্যও কিছু নেই। কারণ কারুর রচনাই নাকি বৌদ্ধাবদান কল্পলতিকানুযায়ী সাহিত্য পদবাচ্য নয়। শ্রীবুদ্ধদেবের মতে গদ্যে ও পদ্যে আদর্শ লেখক বলা চলে একমাত্র প্রিয়বন্ধু শ্রীসুধীন্দ্রনাথ দত্তকে এবং কথাশিল্পীদের মধ্যে প্রকৃত ঔপন্যাসিক যদি কেউ থাকেন তবে সে শুধু শ্রীমতী প্রতিভা বসু। তবু এই বইখানিতে দেখা গেল তিনি শরৎচন্দ্রের সাহিত্য নিয়ে নিতান্ত বাজে বকে চারটি পরিচ্ছদ অপব্যয় করেছেন। কারণ, তাঁর মতে "Sarat Chandra, it is true does not belong to that class of writers, whose works are gilt edged securities of Time, Yielding more and more as years pass, and centuries. Hardly a quarter of a century has passed since then and already it is becoming more and more clear that he if nothing if not a story-teller nothing tent

one." এখানেও তিনি বলতে চেয়েছেন শরৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক ছিলেন না। শুধু গল্পলেখক মাত্র। শ্রীবুদ্ধদেবের অভিযোগ এই যে কেন শরৎচন্দ্র 'পল্লীসমাজের' তরুণী বিধবাকে প্রেমের সার্থকতার জন্য তাহার বৈধব্য বিসর্জ্জন দেওয়াতে পারেন নি। বিরাজ বৌ কেন তার স্বামীর অপরাধে এবং অবৈধ প্রণয়ীর পাপের জন্য নিজে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হোলো, কেন কিরণময়ী তার প্রেমাস্পদের চিত্তজয়ে ব্যর্থ হয়ে তার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্য তারই এক স্নেহাস্পদ অনুজের সঙ্গে ব্যাভিচারে লিপ্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত পাগল হয়ে গেল, মরনোন্মুখ প্রেমাস্পদের পাশের ঘরেই শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে শুরু করলে, এ যেন অনেকটা ঠিক বঙ্কিমচন্দ্রের শৈবালিনীর সেই নরক দর্শনের বিভীষিকার একটু সংক্ষেপিত সংস্করণ মাত্র। শ্রীবুদ্ধদেব নিজেই এর উত্তর দেবার চেষ্টা করে বলেছেন—পাঠকদের কাজে তার জনপ্রিয়তা হারাতে হয় এই আশঙ্কায় তিনি সমাজ বিদ্রোহী কোনো চিত্র এঁকে সমাজকে আঘাত করতে সাহস করেন নি।

এই বিশেষজ্ঞের মুখোস পরা বিজ্ঞ অথচ অনভিজ্ঞ সমালোচকটিকে কে বুঝিয়ে দেবে যে, যেটা অন্য যে কোনও অক্ষম অযোগ্য লেখকের পক্ষে করা সহজ হত, শরৎচন্দ্র সেই সোজা পথটা, সেই সস্তায় কিস্তিমাৎ করাটা বেছে নেন নি বলেই তাঁর লেখনীর এই সংযম ও বলিষ্ঠতার জন্যই তিনি শ্রীবুদ্ধদেব না হয়ে শরৎচন্দ্র হতে পেরেছিলেন।

শ্রীবুদ্ধদেব আক্ষেপ করেছেন, "He has never depicted Passion nor life's enchantment or disenchantment and his sensibility is limited", শরৎসাহিত্য সম্বন্ধে এমন total ignorance ইতিপূর্ব্বে আর কোন সমালোচকের লেখায় প্রকাশ পায় নি। শরৎসাহিত্যে 'প্যাশন' খুঁজে পান না তাঁরাই, যাঁরা 'প্যাশন' বলতে শুধু 'কামলালসাই' বোঝেন। বোধ করি তাই তিনি বলেছেন—"Hardly one of his characters is really adult, the grown up men have typically addescent minds,"...উপীন, সতীশ, দেবদাস, কাশীনাথ, ইন্দ্রনাথ, শিবনাথ, শাহজী, পীতাম্বর, যাদব, গিরীশ কত নাম করবো? শ্রীবুদ্ধদেব যদি শরৎচন্দ্রের রচনাবলী মন দিয়ে পড়তেন তাহলে একাধিক বলিষ্ঠ পুরুষের পরিণত চরিত্রের পরিচয় পেতেন। বইয়ের দিকে না চেয়ে আয়নার দিকে চেয়ে সমালোচনা লিখতে বসলে এই রকম হেয় হাস্যকর ও অশ্রদ্ধেয় অভিমতই প্রকাশ হয়ে পড়ে।

শরৎচন্দ্রের নারীচরিত্র সম্বন্ধে শ্রীবুদ্ধদেব বলেছেন,—"Sarat Chandra's

women, whether child or elderly, mistress or Matron is really an adolescent engaged in comforting her male counterpart. For in growing up they threaten to outgrow their author, and he hardly knows how to deal with them. The grip is lost, the ring of truth is gone. The superb sweet heart becomes an unconvincing mistress the mad bad lovable boy, but a poor lover."

এখানে বিজ্ঞ সমালোচক প্রবরকে পেয়ারী, অভয়া, অন্নদাদিদি, পার্ব্বতী, মৃণাল, সাবিত্রী, রমা, কমল ও কমললতা, প্রভৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়, স্মরণ করিয়ে দিতে হয় সুরেশের কথা, রমেশের কথা, নরেনের কথা, সব্যসাচীর কথা এবং রাসবিহারীর কথা এবং আরো অনেকের। কিন্তু যিনি নিরীশ্বরবাদীর মত 'সব কিছু ঝুটা হ্যায়' বলবার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়ে নেমেছেন সে জেগে ঘুমন্ত। poor সমালোচকের চৈতন্যোদয়ের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

শরৎচন্দ্রের জীবনের বিপুল অভিজ্ঞতা, তাঁর দেশ বিদেশে নিয়ত ঘুরে বেড়ানোর ফলে অর্জ্জিত অসামান্য জ্ঞান, সংসার ও সংসারের বাইরে ইতর ভদ্র ধনী মধ্যবিত্ত দীন দরিদ্র সকল শ্রেণীর ও সকল সমাজের মানুষের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সুযোগ ; সমাজ বিজ্ঞান, মনস্তত্ব ও দর্শন বিষয়ে তাঁর বিপুল অধ্যয়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ যে কূপমণ্ডুক, কলেজের test বই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর মধ্যেই যার সৌখীন জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ এবং সেই দুষ্প্রাপ্য বিদ্যার ভোঁতা হাতিয়ার হাতে যিনি সাহিত্যের কমলবনে অর্ব্বাচীনের ন্যায় হাতীর অনুকরণে বিপুল দম্ভে ভেকের নৃত্য করেছেন, শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে এতবড় কথা বলবার সাহসও তাঁর পক্ষেই সম্ভব। সেই ক্ষুদ্র মানুষটীর এই নির্লজ্জ ধৃষ্টতা তাকে জনসাধারণের কাছে হাস্যাস্পদই করে তুলেছে। বিরাট শরৎসাহিত্যের অভ্রভেদী শৃঙ্গে নিষ্ঠীবন নিক্ষেপ করতে গিয়ে বেচারা বালখিল্য সমালোচকের যা শোচনীয় হাল হয়েছে বাংলাদেশের অধিকাংশ পত্রিকাতেই তার পরিচয় পেলুম।

ভালকে মন্দ বলা, জনপ্রিয় যা কিছুর নিন্দা করা নাম বাজাবার একটা সহজ রাস্তা বটে, কিন্তু বিদেশীদের কাছে নিজের দেশের সাহিত্যকে শূন্য ও ফাঁকা বলার মধ্যে ভাড়াটে গুণ্ডাদের ন্যায় একটা নগদ বিদায়লাভের ব্যবসায়ী বুদ্ধি হয়ত থাকতে পারে কিন্তু বাহাদুরী কিছু নেই। এক কথায় খারাপ বলা খুবই

সহজ ; কিন্তু ভাল বলতে গেলে নিবিড় রসবোধের ঐশ্বর্য্য থাকা প্রয়োজন, যেটার অভাবে এই শ্রেণীর fanatic সমালোচকেরা শুধু দেশশুদ্ধ সুলেখককে কামড়ে তাঁদের শুড়শুড়ি নিবারণ করেন মাত্র! এঁদের পক্ষে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে কিছু বলবার চেষ্টা করা 'ক্রিমিন্যাল অফেন্স' বলেই আমি মনে করি।

শরৎচন্দ্র

—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মানুষের ইতিহাসে এক একটা কাল এক একজন মানুষের প্রভাবে এমন প্রভাবান্বিত হয় যে, সেই কাল বা সেই নিরবচ্ছিন্ন কালের সেই খণ্ডাংশ সেই মানুষের নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে—মনে হয় কালের প্রভাব সেই মানুষের মধ্য দিয়ে রূপ গ্রহণ করেছিল। মনে হয়, মানুষের নামকে সগৌরবে নিজের আগে স্থান দিয়ে কাল স্বীকার করে যে আমাকে সে জেনেছিল—আমাকে সে চিনেছিল—তাই আমি তার মধ্য দিয়েই নিজেকে প্রকাশ করেছিলাম—তাই সে আমার সঙ্গে একাত্ম হবার গৌরব লাভ করেছে। মরণের মধ্যেও সে তাই অমৃতত্ব লাভ করেছে।

বাঙালীর বিগত দুশো বৎসরের জীবনক্ষেত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এইকালে বাঙালীর জীবন বিকাশ লাভ করেছে—সাহিত্যে, সমাজধর্মে এবং রাজনীতিতে। পরাধীন জাতির জীবনকে বন্দী-মানুষের জীবনের সঙ্গে তুলনা করলে বিন্দুমাত্র ভুল হবে না। গরাদে ঘেরা জানালা দিয়ে বাইরের পৃথিবীর দিকে মনকে দূরে সুদূরে প্রসারিত করে দিয়ে সে জীবনকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে, বাইরের মুক্ত পৃথিবীর কল্পনা করেছে, আকাশের নীলের বার্ত্তাকে সে সঙ্গীতে পরিণত করেছে, বৃহত্তর মহত্তর মুক্ত জীবন ভাবনায় ভাবিত হয়ে সে বদ্ধ জীবনেই তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্রের পক্ষীরাজের অভিযানের কাহিনী রচনা করেছে, আবার ক্রম উপলব্ধির ফলে—বন্দীশালায় নিজেদের জীবন-যাত্রার কথা নিয়ে গান কাহিনী রচনা করে সমগ্র বন্দীশালায় তুলেছে নূতন ভাবের আলোড়ন, সেই বাস্তব দুঃখের করুণ গানের আনন্দরসে জীবনের বেদনাকে সুধাস্বাদী সঞ্জীবনীতে পরিণত করতে চেয়েছে। এই বাঙালীর সাহিত্য। রাজনীতি সমাজধর্ম—এ দুটি ক্ষেত্রে বাঙালীর জীবন বিকাশের কথা আজ আমার আলোচ্য নয় তবুও একথা অবিসম্বাদীভাবে সত্য যে, এই দুই ক্ষেত্রের জীবনবিকাশের সঙ্গে সাহিত্যের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ—অতি ঘনিষ্ঠ।

বাঙালীর এই দুশো বৎসরের সাহিত্যের ইতিহাস এমনি কয়েকজন কালজয়ী

মানুষের দ্বারা চিহ্নিত ; তাঁদের মধ্যে দিয়েই বাঙালীর সাহিত্যের কালাংশ রূপ লাভ করেছে এবং তাঁদের নামেই এই কাল নিজেকে চিহ্নিত করে তাঁদের অমৃতত্ব লাভের কথা সগৌরবে ঘোষণা করছে।

আমরা এই দু'শো বৎসরের যুগ বিভাগ করে থাকি পাঁচটী নামে চিহ্নিত করে। বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র। এই সঙ্গে আরও একটি নাম যুক্ত হওয়া উচিত। পণ্ডিতজন এবং ঐতিহাসিকেরা তাঁর নাম যোগ করেও থাকেন। তিনি রামমোহন রায়। রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর বাঙালীর নব-জীবনের বীজ। দ্বিদল বীজের মত এই দুই মহাপুরুষের জীবন সাধনার পুষ্টিতে নয় জীবনের অঙ্কুরোদ্গম হয়েছিল। ইতিহাসে বাঙালীর জীবনবিকাশের রাজ-নৈতিক এবং সমাজ ও ধর্ম্মনৈতিক ক্ষেত্রের মত একথাও থাক। আমার আলোচ্য এই দু'শো বৎসরের সাহিত্যক্ষেত্রে বাঙালীর জীবনকাল যে কয়েকজন মানুষের দ্বারা চিহ্নিত—যাঁদের নাম পূর্ব্বে করেছি—তাঁদের শেষোক্ত জন শরৎচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়। বাঙালীর কাছে তাঁর উপাধি নিষ্প্রয়োজন—কুলপরিচয় বাহুল্য, তিনি বর্ত্তমান থাকতেই তাঁর নামের শ্রী বাদ দিয়েছিল বাঙালী—তিনি সর্ব্ববাহুল্য বর্জ্জিত আত্মশক্তির গরিমায় মণ্ডিত হয়ে শরৎচন্দ্র নামেই বাঙালীর হৃদয়ে আসন লাভ করেছিলেন। বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র একটা যুগ। একালের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল যেখান পর্যন্ত গণনা করি আমরা—তিনি সেই যুগ। শরৎচন্দ্রের তিরোধান হয়েছে—রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে,—তবুও বাঙালীর জীবনের সাহিত্যের ভাবধারায় শরৎচন্দ্রই আমাদের পূর্ববর্ত্তী ভাবধারা। কথাটা একটু স্পষ্ট করে বলার প্রয়োজন আছে। নতুবা কবিগুরুর প্রতি আমি অসম্মান প্রদর্শন করছি এমন ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়।

এ সম্পর্কে আমি বাঙলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচক এবং কবি শ্রীযুক্ত মোহিত-লাল মজুমদার মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে আমার বক্তব্য পরিষ্কার করবার চেষ্টা করব। তাঁর বহু মূল্যবান 'আধুনিক সাহিত্য' নামক প্রবন্ধের বইয়ে তিনি শরৎচন্দ্রের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন "বঙ্কিমচন্দ্রের পর আমরা রবীন্দ্রনাথকে এখন কতকটা বুঝিতে পারিতেছি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অব্যবহিত পরেই শরৎ-চন্দ্রের আবির্ভাব যেন একটু অতর্কিত, অপ্রত্যাশিত—আমাদের সাহিত্যের ধারাটী যেন একটি ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে—।

"আমাদের সাহিত্যের ধারাটী যেন একটী ভিন্ন মুখে প্রবাহিত হইতে চলিয়াছে," এই বাক্যটীর আমি পুনরুক্তি করছি, এবং শরৎচন্দ্রের ভাবনার ধারাই যে

আধুনিক সাহিত্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী ধারা এই কথাটাই আমি বলতে চাই! শরৎচন্দ্রকে তাঁর কোন একজন ভক্ত—রবীন্দ্রনাথ দুর্ব্বোধ্য—তাঁর রচনা অপেক্ষা আপনার রচনা শ্রেষ্ঠ— এই জাতীয় উক্তি করেছিলেন। তাতে তিনি হেসে বলেছিলেন—ও কথা উচ্চারণ ক'র না। রবীন্দ্রনাথ লেখেন আমাদের জন্য, আমরা লিখি তোমাদের জন্য। আমিও সেই কথাই বলি। রবীন্দ্রসাহিত্য স্বর্গলোকের ধারা; শরৎচন্দ্রে সে ধারা ধরিত্রীবক্ষোবাহিনী হয়েছে। মোহিত লাল বলেছেন—"রবীন্দ্রনাথের দুরারোহিনী কল্পনার উর্দ্ধশাখায় যে ফুল গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া উঠিল---তার সবটুকু শোভা সকলের চোখে ধরিল না বটে, কিন্তু সেই ফুলের বীজ নিম্নভূমিতে একটি নূতন রূপে অঙ্কুরিত হইল। তাই হঠাৎ যখন দেখা গেল, একেবারে পথের ধারেই লতাগুল্মের বেড়াগুলি এক নূতন ধরণের ফুলে ভরিয়া উঠিয়াছে। তার বর্ণ-গন্ধ যেমন চমকপ্রদ, তেমতি অতি সহজেই প্রাণমন অভিভূত করে, তখন আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না। এ যে চিরদিনের দেখা জিনিষ—অথচ এমন করিয়া কখনও তো দেখি নাই।

বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলার যে রূপ দেখে লিখেছিলেন—সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা মলয়জশীতলা, অমলা-কমলা-সরলা সুস্মিতা-ভুষিতা—বাঙলার সে রূপ তখনও বজায় ছিল। সাধারণ বাঙালীর জীবনে ভাঙন ধরলেও, পল্লীর অবস্থা শোচনীয় হলেও যে কুলে রবীন্দ্রনাথ জন্মলাভ করেছিলেন—যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে তিনি মানবিক পুষ্টিলাভ করেছিলেন—তাঁর কবিমনের উন্মেষ হয়েছিল—তাতে পৃথিবী তার অপরূপ সৌন্দর্য্যের দিক দেখিয়েই নিজে অবগুণ্ঠন উন্মোচন করেছিল; এবং সেই পরিচয়ের ক্ষণে যে মন্ত্র পঠিত হয়েছিল, সে মন্ত্র উপনিষদের বাণী! প্রাচীন ভারতীয় সাধনার ধারায় তাঁর কাব্যলক্ষ্মীর সঙ্গে সপ্তপদী যাত্রা লাজহোম সম্পন্ন হয়েছিল। তাছাড়া তাঁর লোকোত্তর প্রতিভা—সে জন্মজন্মান্তরের সাধনার পরিণতি বলুন—অথবা বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে বংশধারার মহাপরিণতি বলুন অথবা সাধারণ জীবন নিয়ম কারণ অনির্নীত বলুন সে যাই বলুন—রবীন্দ্র-সাহিত্যের সেই লোকোত্তর প্রতিভা এক মহাসত্য।

শরৎচন্দ্র মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। তাঁর প্রথম জীবন কেটেছে এককালের সমৃদ্ধ সপ্তগ্রামের ধ্বংসাবশেষে কয়েকখানি পল্লীর মধ্যে; মজে যাওয়া সরস্বতীর ক্ষীণ পঙ্কিল স্রোতের কূলে, ঘন জঙ্গলে ভরা চারিদিক, মহামারী ম্যালেরিয়া রূপে স্থায়ী বাসা গেড়েছে সেখানে, প্রাচীন সংস্কৃতির নামে অন্ধ সংস্কারে সমস্ত আচ্ছন্ন, দারিদ্র্যের কালিতে কালো হয়ে আসছে চারিদিক, মা যা হইয়াছেন অর্থাৎ হৃত

নগ্নিকার বেদীর সম্মুখে শরৎচন্দ্রের পরিচয় হয় পৃথিবীর সঙ্গে। ধরিত্রীর রূপের মধ্যে যে আকাশের নীলে, গ্রহতারকার দীপ্তিতে, সূর্য্য-চন্দ্রের রশ্মিজালে, ফুলের বর্ণসম্ভারের মধ্যে যে চিরন্তন অপরূপের বাস—তার সন্ধান তিনি পান নি। তাই শরৎসাহিত্য মাটির সাহিত্য।

বাঙলাদেশে ছেলে ঘুমপাড়ানী ছড়া আছে—

"আয় চাঁদ আয় আয়, গাই বিয়োলে দুধ দেব,
সোনা রূপোর বাটী দেব, তাইতে দুধ খাবি—
ঘুম দিয়ে যারে চাঁদ—পাখা দিয়ে বাতাস দেব—
আম-কাঁঠালের বাগান দেব ছাওয়ায় ছাওয়ায় যাবি।"

আবার এ ছড়াও আছে—

"আয়রে ঘুম যাইরে, বাউড়ী পাড়া দিয়ে।
বাউরীদের ছেলে ঘুমলো কাঁথা মুড়ি দিয়ে।"

একটীতে অপরূপ রূপের কাব্যশোভা। কিন্তু সে ছড়া রচনা সম্ভবপর হয়েছে—সেই করতে পেরেছে—যার গোয়ালে গাই আছে, সোনারূপার বাটী দেবার সামর্থ্য আছে, আম-কাঁঠালের বাগান রচনার জমি আছে, জমা আছে।

বাউরীর ছেলে-ঘুম-পাড়ানোর কালে বাউরী-মায়ের চাঁদের কথা মনে হয় নি, মনে হয়েছে কাঁথার কথা।

বাঙলার আদি কবি চণ্ডীদাসের পদাবলীর মধ্যে আমরা এক মহাকাব্যের সন্ধান পেয়েছিলাম। "সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই।"

এই যে মহামানবতার বাণী, এই বাণী শুধু বাঙলা সাহিত্যেরই বাণী নয়। সমগ্র পৃথিবীর মর্মবাণী—এই বাণী পৃথিবীর সকল সাহিত্যের আদি কথা।

আকাশের নীল, আলো, অন্ধকার জ্যোতির্লোক, ফুলের শোভা, পাখীর কলস্বর, বেণুবনের গান, সমুদ্রের কল্লোল, নদীর কলতান, গন্ধসম্ভার, সুকোমল স্পর্শ—জীবনময়ী ধরিত্রীতে থরে থরে বিকাশ লাভ করেছে, তারই মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে অব্যক্ত। এই বর্ণ-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ উপভোগ বা উপলব্ধির জন্য বহু কোষ মিলনের ফল। দৈব জীবন দেহ থেকে দেহান্তরের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করেছে মানব। মানবরূপের মধ্যেই জীব-জীবনে প্রকাশমান হয়েছে মননময় চেতনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৃষ্টিবৈচিত্র্যের সঙ্গে মানব-চৈতন্যের মিলনের ফলে যে আনন্দ সেই আনন্দের অকপট অভিব্যক্তিই প্রথম সাহিত্য। সেই আনন্দ থেকে মহানন্দে মানুষ উপনীত হল তার আত্মচৈতন্যকে উপলব্ধি করে। মানুষ আত্মাকে

চিনে—চিনলে সমগ্র সৃষ্টিকে, অনুভব করলে স্রষ্টাকে। এই মহানন্দময় উপলব্ধিই ভারতীয় সাধনার স্তরে স্তরে বিকাশ লাভ করেছে। মানুষ এই সাধনায় অপরূপ অরূপের গুণ্ঠন মোচন করে প্রমাণ করেছে—সবার উপরে মানুষ সত্য; কারণ সেই সত্যের অবিষ্কর্তা। রবীন্দ্রনাথ সেই সাধক। তাঁর জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে চেতনা বিলুপ্তির মধ্যেও তাঁর চৈতন্য বলেছিল শব্দহীন ভাষায়—

হে পূষণ সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল, এবার প্রকাশ কর তোমার কল্যাণ-তম রূপ!

ইশোপনিষদের

পূষন্নেকর্ষে যম সূর্য্য প্রাজাপত্য ব্যূহ রশ্মীন্।

সমূহ তেজো যন্তে রূপং কল্যাণতমং তত্তে পশ্চামি ॥

বাঙালীর নব জীবনে ভারতীয় সাধনার বাণী রবীন্দ্র-সাহিত্যে বোধ করি শেষ দীপ্তি লাভ করেছে, যার প্রতিফলনে সমস্ত মানবচৈতন্য এক ভিন্ন উপলব্ধির পথে যাত্রামুখে সচকিত হয়ে উঠেছে—সসম্ভ্রমে মাথা নত করে বলেছে--তুমি সত্য, তোমার বাণী মহাসত্য।

ভিন্ন উপলব্ধির পথে যাত্রা রবীন্দ্রনাথের জীবদ্দশাতেই আরম্ভ হয়েছে। ইউরোপে ব্যবহারিক বিজ্ঞান আবিষ্কারের ফলে সমগ্র পৃথিবীতেই হল মানব সভ্যতার নব পর্য্যায়। মন্ত্রশক্তির কাছে পরাভূত হ'ল মানুষের শ্রমশক্তি। অন্য-দিকে সৃষ্টির বাস্তব রূপের মধ্যে সৃষ্টি-রহস্যকে উদঘাটন করে বিজ্ঞানের পথে মানব সংস্কৃতি হল ধাবমান। একদা ষ্টিম-ইঞ্জিন-চালিত জলযানে বাহিত হয়ে ভারতবর্ষের উপকূলে যন্ত্রনির্মিত পণ্যের সঙ্গে এল সেই নূতন পথের বার্ত্তা। এদেশের মানুষ সে বার্ত্তা গ্রহণ করতে চায় নি; কিন্তু সে পণ্য গ্রহণ না করে পারেনি। পণ্য গ্রহণের সঙ্গে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরল।

রাজবংশের পর রাজবংশ ভেঙ্গে পড়েছে, রাষ্ট্রবিল্লবের পর রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে। ধর্ম্মবিপ্লবের পর ধর্ম্মবিপ্লব হয়েছে, জাতির পর জাতি এসেছে অভিযানে, হিন্দু, পাঠান, মোগল, মারাঠা শিখ—সর্ব্বশেষে এল ইংরেজ, তবুও এদেশের স্বয়ংসম্পূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা ভাঙেনি। এই ইংরেজ আমলেই ছিয়াত্তুরে মন্বন্তর হয়েছিল। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই মানুষ সামলে উঠেছিল—এই সমাজব্যবস্থার গুণে। সেই সমাজ ব্যবস্থা এবার ভেঙ্গে পড়ল ব্যবহারিক বিজ্ঞানের যন্ত্রশক্তির সংঘাতে। এত বড় যে শক্তি, কে তাকে বলবে মিথ্যা? ভারতীয় সাধনার সাধক রবীন্দ্রনাথও একে উপেক্ষা করতে পারেন নি। তাকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন—

দুই জীবনধারার সমন্বয় সাধন করতে চেয়েছিলেন। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা এই শেষোক্ত জীবনধারার আবেগে প্রবহমান হয়ে ওই রবীন্দ্রসাধনাসমৃদ্ধ বাঙলা সাহিত্য থেকেই নূতন খাত কেটে চলতে চেয়েছে। রবীন্দ্রসাহিত্যের উৎস থেকেই শরৎসাহিত্য বাঙলা সাহিত্যে বাস্তব রূপের প্রথম আবেগ—প্রথম স্রোত। আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে বাঙলা দেশের মানব-জীবনের ভাবপ্রবাহ বাস্তবমুখী। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানেই শরৎচন্দ্রের তিরোধান ঘটলেও শরৎসাহিত্যই বাঙালীর সাহিত্যের ভাবধারার অব্যবহিত-পূর্ব্ব ভাব-ধারা।

রবীন্দ্রনাথের ব্যঞ্জনা-সমৃদ্ধ ভাষা, রবীন্দ্রনাথের মহাচৈতন্য থেকে প্রকাশমান সুগভীর প্রেম, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি থেকেই লাভ করা রূপবোধ নিয়ে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করলেন—দুঃখ-প্রপীড়িত দুর্গতিদের পতিত জীবনের পটভূমিতে মানুষের সেই সত্য—যে সত্য সবার উপরে সত্য। প্রকৃত অতীন্দ্রিয় লোকের অস্তিত্ব শরৎ-সাহিত্যে একেবারে নাই তা নয়। তবু শরৎসাহিত্যে বাস্তব জীবন প্রধান। শ্রীকান্তে অমাবস্যার রাত্রিতে শ্মশানে অন্ধকারের রূপদর্শন অপূর্ব্ব কাব্য; সেখানে লেখকের অনুভূতির সঙ্গে আমরাও অনুভব করি অন্ধকারের এক অতীন্দ্রিয় রূপলোকের স্পর্শ, তবুও সে ভাবানুভূতি শ্রীকান্তে গৌণ।

পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনধারা থেকে নূতন কালের জীবনধারায় প্রয়াণের কালে যে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী, জাগতিক জীবন-ধারণ-ব্যবস্থার বিপর্য্যয়ের ফলে যা আমাদের মধ্যেও সঞ্চারমান হয়েছিল—অথচ স্পষ্টরূপে প্রকাশ পাচ্ছিল না, তার আবেগ এনেছেন রবীন্দ্রনাথ, কিন্তু তার প্রথম প্রকাশ হয়েছে শরৎসাহিত্যে।

পৃথিবীর নবভাবের সংঘাতে পুরাতন সমাজে ধ্বংসের কম্পন তখন সুরু হয়েছে, বাঙলা দেশের সমাজব্যবস্থার তিন কোণ ভেঙেছে—এক কোণ ঠেকে আছে বৈদেশিক শাসনশৃঙ্খলার ঠেকায়, অথচ শাসন এবং শোষণে মানুষ হয়েছে হৃত-সর্ব্বস্ব, ভ্রষ্টসর্ব্বস্ব, দীনতায়, হীনতায় মানুষ শীর্ণ, মানুষ কাঙাল, চোখে তার লুব্ধ দৃষ্টি,—তাদের কথাই শরৎ-সাহিত্যের মুখ্য।

রবীন্দ্রনাথের চোখের বালিতে এসেছিল বিনোদিনী। শরৎ-সাহিত্যে এসেছে সাবিত্রী, কিরণময়ী, রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখী।

বিনোদিনী বিদ্বেষবশে নিষ্ঠুরভাবে যে খেলা আরম্ভ করেছিল সে খেলা সে শেষ করেছে বৈরাগ্যের মধ্যে, সে তীর্থযাত্রা করেছে প্রশান্তমুখে ঊর্দ্ধলোকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, বিহারীর প্রেম নিবেদন তাঁর অন্তরকে যখন পরিপূর্ণ করেছিল, তখন সে চলে গেল রক্ত-মাংসের জীবনের ঊর্দ্ধলোকে। কিন্তু সাবিত্রী, কিরণময়ী'

রাজলক্ষ্মী, চন্দ্রমুখীর খেলা জীবন-মরণের খেলা,—সে খেলায় তাদের বিয়োগান্ত পরিণতিতে যে বেদনায় তাদের অন্তরে অশ্রুসাগর উছলে উঠেছে তাতেই তাদের মধ্যকার সেই সত্য প্রকাশিত হয়েছে যার বলে মানুষ সবার উপরে সত্য। সে সত্যও চিরন্তন সাহিত্যের প্রাণশক্তি, অথচ সে বাস্তব। এবং এই সত্য উপলব্ধির বেদনায় মানুষের চোখে নামল যে উত্তপ্ত অশ্রুর তরঙ্গ তার মধ্যে আছে বিপ্লবের আবেশ। শরৎ-সাহিত্যের নারীদের চোখেও সেই উত্তপ্ত অশ্রু। শুধু কি ওই চন্দ্রমুখীর জল? রমা, অন্নদাদিদি, বামুনের মেয়ে, অচলা, বিলাসী, একাদশী বৈরাগীর ভাইঝি—এদের অন্তরের যে সত্যরূপকে সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে শরৎচন্দ্র পাঠকের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তার মধ্যেও বিপ্লবের ধ্বনি জেগে উঠেছে। সমাজের বিধিবিধানের অনুশাসনকে অতিক্রম করে দেহের গণ্ডী ছাড়িয়ে নারীর আত্মিকমূল্য ঘোষিত হয়েছে, তার সত্তা স্বীকৃত হয়েছে। এ স্বীকৃতি তুচ্ছ নয়। এ এক বিপ্লবাত্মক স্বীকৃতি। সতীদাহ নিবারণে আইনের প্রয়োজন হয়েছিল, আইনের সমর্থন লাভ করেও বিধবা-বিবাহ সমাজ-স্বীকৃতি লাভ করেনি। সেই দীর্ঘকালের সংস্কার আন্দোলনের মঞ্চে দাঁড়িয়ে শরৎচন্দ্র সাহিত্যের বাণীর মধ্য দিয়ে যখন বিপ্লবাত্মক ঘোষণা উচ্চারণ করলেন তখন তা স্বীকৃত হ'ল। বিগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে বাঙলার নারী-সমাজে যে বিস্ময়কর পরিবর্তন দেখা দিয়েছে, তার বীজও দ্বিদল বীজের মত। তার একটি দল হ'ল শরৎ-সাহিত্যে নারীর আত্মিক রূপ মহিমার প্রকাশ, অপরটি হ'ল ১৯২১ সালে রাজনৈতিক গণ-আন্দোলনে নারীশক্তিকে গণশক্তির অংশ স্বীকার করে স্বেচ্ছা-সেবিকা-বাহিনী গঠন।

শুধু নারী-জীবন সম্বন্ধেই শরৎ-সাহিত্য বিপ্লবাত্মক নয়। তাঁর দৃষ্টি এই দেশের বিপর্যস্ত সমাজজীবনের সর্বত্র প্রসারিত হয়েছিল—সর্ব্বত্রই তিনি ঘোষণা করতে চেয়েছিলেন বিপ্লবী ভাবধারার বাণী। অজ্ঞান তমসায় আচ্ছন্ন দেশ, কোটী কোটী মানুষ ভাষাহীন মূক, অন্নহীন—অর্দ্ধনগ্ন, জীর্ণ শতছিদ্র আশ্রয়ের তলদেশে তারা জলে ভেজে, রোদে পোড়ে, শীতে কাঁপে, একমাত্র সম্পত্তি গরু—সে গরুর খাবার ঘাস নাই, জল নাই; সমস্ত হারিয়ে সে চলে কন্যার হাত ধরে কলের পথে —সেই গফুরের কথা শরৎচন্দ্র বলেছেন। মহেশের প্রতি ভালবাসা, তার নিজের কর্মকে উপেক্ষা করে মহেশের কষ্ট বড় করে দেখার মধ্যে নিরক্ষর দরিদ্র চাষীর অন্তরের সে সত্য সর্ব্বোত্তম সত্য, তাকে তিনি প্রকাশ করেছেন। তার মধ্যে ছিল যে মহাবিপ্লবের বীজ, সে বৈদেশিক ভাবধারা থেকে সংগৃহীত নয়—সে তার অন্তরোদ্ভূত সত্য। যে বিপ্লবের বীজ আজ অঙ্কুরিত।

নিষ্ঠুর সত্যকে কোনদিন অপ্রিয় বলে গোপন করেন নি, তাই শরৎচন্দ্র নিজে বিপ্লবী, তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।

বর্ত্তমানকে একমাত্র ব্যক্তিগত আক্রোশে ভাঙবার প্রেরণায় তিনি কিছুই করেন নি। মানুষকে ভালোবেসে বর্ত্তমানের জীর্ণতাকে নিরাসক্তভাবে বর্জ্জন করে নব কল্যাণে যাবার কামনার আবেগ, শরৎচন্দ্রের মধ্যে সে আবেগে উদ্বুদ্ধ তাঁর সাহিত্যে—তাই তিনি বিপ্লবী, তাঁর সাহিত্য বিপ্লবাত্মক।

সে দিনের বাঙালীর জীবনের অন্তর্গূঢ় বিপ্লবের আবেগ—যার সম্পর্কে সে দিন বাঙালীর স্পষ্ট ধারণা ছিল না, তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে রূপ নিতে চেয়েছে শরৎ সাহিত্যে, তাই শরৎ-সাহিত্য সত্য এবং সেই কারণেই শরৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্যের একটা যুগ। তাই রবীন্দ্রনাথ বর্ত্তমানে তাঁর তিরোধান ঘটলেও তিনিই আধুনিক যুগের অব্যবহিত-পূর্ব্ববর্ত্তী যুগ। কারণ বাঙলা সাহিত্যে সমগ্র ধারা আজ সমগ্র পৃথিবীর সঙ্গে জীবন-বিপ্লবের খাতে প্রবাহমান।

মানুষের জীবন এই বিপ্লবের খাত খনন করে সার্থকতার সাগর-সঙ্গমে যাবার স্বপ্ন দেখেছে, বাঙালী পরাধীন দরিদ্র হলেও রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-সমৃদ্ধ বঙ্গসাহিত্যের সেবকদের চিত্তে পৃথিবীর সে স্বপ্ন ছায়াপাত করেছে; শরৎচন্দ্র কালো কালির তুলিতে প্রথম এঁকেছেন সে ছবি। সে ছবি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এবং উঠবে বাঙলা সাহিত্যে। মনে হয়, সে বিপ্লব দীর্ঘকাল-সাপেক্ষ হলেও সার্থক হবে, তারই সঙ্গে উত্তরোত্তর শরৎচন্দ্র সার্থকতর হয়ে উঠবেন।

সর্বসাধারণের শরৎচন্দ্র

ভবানী মুখোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত জনপ্রিয়তা খুব কম লেখকই অর্জন করতে পেরেছেন। আজো তাঁর গ্রন্থ যে হারে পাঠকরা সংগ্রহ করেন তা বাংলা দেশের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। শরৎচন্দ্র বাঙ্গালীর অন্তরের ধন। তাঁকে তাই বাঙালী পাঠক গ্রহণ করেছে আপনজন হিসাবে।

যখন শিশির ভাদুড়ী মহাশয় শরৎচন্দ্রের নাটক মঞ্চস্থ করতে সুরু করলেন তখন নাট্যমন্দিরের "ষোড়শী" নাটকের পোষ্টারে লিখিত হয় "অপরাজেয় কথাশিল্পী"—এই বিশেষণটি সম্ভবতঃ হেমেন্দ্র কুমার রায় মহাশয়ের দেওয়া নয়ত এর কৃতিত্ব শিশিরকুমারের। কিন্তু যিনিই এই কথাটি সেদিন ব্যবহার করুন তাঁর কাছেও বাঙালী ঋণী। সত্যই শরৎচন্দ্র আজও অপরাজেয় হয়ে আছেন। তিনি কি শুধু কথাশিল্পী হিসাবেই অপরাজেয়? মানুষ ও সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের যথাযথ মূল্যায়ন আজো হয়নি। মোহিতলাল মজুমদারের "শ্রীকান্তের শরৎচন্দ্র" এবং ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের 'শরৎচন্দ্রের নারী চরিত্র" জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় বিরল। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের নব মূল্যায়ন প্রয়োজন। আর দরদী শরৎচন্দ্রের জীবন ও কর্মের পূর্ণবিচার প্রয়োজন।

শরৎচন্দ্র গরীব ঘরের সন্তান। পরানুগ্রহে কৈশোর কেটেছে। ১৮৯৪-এ আঠারো বছর বয়সে এনট্রানস পরীক্ষা পাশ, ১৮৯৫-এ এফ-এ ক্লাসে ভর্তি হওয়া এবং ১৮৯৬-এ পড়াশোনা ত্যাগ এবং তারপরই বনালী ষ্টেটে চাকরী গ্রহণ—এই ত যুবক শরৎচন্দ্রের জীবনেতিহাসের প্রথম পর্ব। আনুষ্ঠানিক ভাবে যথাযোগ্য বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ তিনি পাননি, বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর কাছে খোলা দরজা ছিল না। তাই তাঁকে পাঠ নিতে হয়েছে বিশ্ব রঙ্গশালার বিচিত্র যাদুঘরে। তাঁর বিশ্ব-বিদ্যালয় বিশ্বজগৎ। এই বিশ্বজগতের সাধারণ মানুষ—

"সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্ব্বল, উৎপীড়িত, মানুষ হয়েও মানুষে যাদের চোখের জলের কখনও হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনদিন ভেবেই পেলে না সমস্ত থেকেও কেন

তাদের কিছুতেই অধিকার নেই—এদের কাছেও কি ঋণ আমার কম ? এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে। এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে নালিশ জানাতে। তাদের প্রতি কত দেখেছি অবিচার কত দেখেছি কু-বিচার কত দেখেছি নির্বিচারে দুঃসহ-সুবিচার। তাই আমার কারবার শুধু এদের নিয়ে।......"

এরাই শরৎচন্দ্রকে পথনির্দেশ করেছেন। যদিও বলেছেন "অন্তরে যাকে পাইনি, শ্রুতিমধুর শব্দরাশির অর্থহীন মালা গেঁথে তাকেই পেয়েছি বলে প্রকাশ করবার ধৃষ্টতাও আমি করিনি—" তবু শরৎচন্দ্র যেটুকু করেছেন তা তুলনাবিহীন। এই যে তাঁর হাতে কলমে শিক্ষা তার মূল্য অপরিমেয়।

সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কাছে শিক্ষা নিয়ে যে সমাজে সাহিত্যিক এবং মানব-দরদী হিসাবে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছিলেন সেই সমাজ এদিনের সমাজ নয়। এ কালের পাদপহীন দেশে এরণ্ডকে মহাদ্রুম বলা হয়ে থাকে, কিন্তু শরৎচন্দ্রের কাল ছিল বিভিন্ন, রবীন্দ্রনাথ তখন মধ্যাহ্নগগনে, আর চিত্তরঞ্জন, প্রমথ চৌধুরী, অতুল প্রসাদ সেন, স্যার আশুতোষ, শিশির কুমার ভাদুড়ী, সুভাষ চন্দ্র বসু প্রভৃতি বাংলার সংস্কৃতি ও চিন্তার ক্ষেত্রে যাঁরা নায়ক সদৃশ তাঁরা সবাই পরিপূর্ণ গৌরবে বিরাজমান। এঁদের সকলের কাছে শরৎচন্দ্র স্বীয় প্রতিভা ও চরিত্র মাধুর্যে সম্মান ও শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছেন।

শরৎচন্দ্রের এই যে সম্মান লাভ, এই যে সামাজিক প্রতিষ্ঠা এর পিছনে আছে মুখ্যতঃ তাঁর সাহিত্য কর্ম আর পরোক্ষভাবে তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের দৃঢ়তা, সততার প্রতি অবিচল নিষ্ঠা। সত্য কথনের দুঃসাহস। শিশুর মত সারল্য আর প্রচণ্ড দেশ ভক্তি।

শরৎচন্দ্রের "অপ্রকাশিত রচনাবলী" নামক গ্রন্থের ভূমিকায় সাহিত্য গবেষক ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

"শরৎচন্দ্রের যুগ বৃহত্তর রবীন্দ্র-যুগেরই সম্পূর্ণ অন্তর্ভুক্ত। এতদ্‌সত্ত্বেও শরৎচন্দ্রের সাধারণ জনপ্রিয়তা রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়াইয়া গিয়াছিল। ইহার সাক্ষ্য স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ দিয়াছেন। শরৎচন্দ্রের গল্প বলার ভঙ্গীতে ও ভাষায় অপূর্ব যাদু ছিল। তিনি কথা-সাহিত্যের ঐন্দ্রজালিক ছিলেন।"

শরৎচন্দ্র ভাষার যাদুকর ছিলেন। ভাষাকে সহজ এবং সরস ভঙ্গীতে ব্যবহার করার কৌশল তাঁর আয়ত্ত ছিল। যে ব্যঙ্গপ্রবণতা শরৎচন্দ্রের রচনায় পরিস্ফুট সেই সরস ব্যঙ্গপ্রবণতা বাঙালী চরিত্রে বৈশিষ্ট্য। ইদানীং এই জাতীয়

রচনা ক্রমশঃ লুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু বাঙালীর সংলাপে রসিকতাটাই ছিল সর্বপ্রধান। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অনেক উপদেশের মধ্যে আছে এই স্বাভাবিক সরসতার পরিচয়। শরৎচন্দ্র বাঙালীর সেই বৈশিষ্ট্যটুকু তাঁর রচনার মধ্যে পরিবেশন করেছেন প্রায় সর্বত্র। পল্লীসমাজ, দত্তা, দেনা-পাওনা, চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন, পথেরদাবী, শ্রীকান্ত (সবকটি পর্ব্ব) প্রভৃতির মধ্যে শরৎচন্দ্রের এই ব্যঙ্গ প্রবণতার অজস্র দৃষ্টান্ত ছড়ানো আছে।

শরৎচন্দ্র সংখ্যায় কম হলেও মননশীল প্রবন্ধ কিছু কিছু লিখেছেন। তিনি যে কি শক্তিমান সাহিত্য সমালোচক ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর "নারীর লেখা", "কানকাটা", "সমাজ ধর্মের মূল্য" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলিতে। এই প্রবন্ধ কটি তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্য ও মননশীলতার পরিচায়ক। আবার শরৎচন্দ্রের রচনা-রীতির যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সেই শ্লেষ ও রসিকতার অজস্র পরিচয় এই সব প্রবন্ধে ছড়ানো।

কিন্তু শরৎচন্দ্রের স্বদেশ চিন্তা তাঁর ব্যক্তি মানসের একটি বিশিষ্ট পরিচয়। বিপ্লবীদের সমর্থনে তিনি অকাতরে অর্থব্যয় করতেন। অনেক সময় বিপদের ঝুকি নিয়ে এমন অনেক কাজ করে বসেছেন যার ফলে তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়েছে। মহাত্মাজীকে শ্রদ্ধা করতেন শরৎচন্দ্র কিন্তু তিনি যে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সে শুধু দেশবন্ধুর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার বশে। দেশবন্ধু সম্পর্কে লিখেছেন এক জায়গায়—

"বাঙ্গালার দেশবন্ধু দাশকে অতিশয় কাছে বসিয়া দেখিবার অবকাশ পাইয়াছিলাম। যতই দেখিয়াছি ততই অকপটে মনে হইয়াছে, এই ভারতবর্ষের এত দেশ, এত জাতির মানুষ দিয়া পরিপূর্ণ বিরাট বিপুল এই জনসঙ্ঘের মধ্যেও এত বড় মানুষ বোধকরি আর একটিও নাই। এমন একান্ত নির্ভীক, এমন শান্ত সমাহিত, দেশের কল্যাণে এমন করিয়া উৎসর্গ করা জীবন আর কই ?—

সেই সময় বাংলা দেশে দেশবন্ধুকে ছোট করার চেষ্টা চলছিল। শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—

"এই বাঙ্গালা দেশেরই কাগজে কাগজে যে তাঁহাকে ছোট বলিয়া লাঞ্ছিত করিয়া, পরের চক্ষে হীন করিয়া প্রতিপন্ন করিবার অবিশ্রাম চেষ্টা চলিয়াছে এত বড় ক্ষোভের বিষয় কি আর আছে ?"

শরৎচন্দ্র জানতেন দেশবন্ধুকে ছোট করার অর্থ, বাঙ্গালা দেশকে ছোট করা। এই সময় দিল্লী কংগ্রেসের সেই বিখ্যাত গোলমাল এবং দেশবন্ধুর পরাজয় ঘটে।

গান্ধিজী যখন সুভাষচন্দ্রের আয়োজিত পার্ক সার্কাস ময়দানের কংগ্রেস একজিবিশন ইত্যাদিকে ‘ফিলিপস্ সার্কাস” বলে পরিহাস করেন তখন শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—

“আরও একটা কথা ভাবি। এ ভালই হইয়াছে যে দেশবন্ধু স্বর্গে গিয়াছেন। ‘ফিলিপস সারকাসে’র বিবরণ আর Young India-র পাতায় তাঁহাকে চোখে দেখিতে হয় নাই।”

সুভাষচন্দ্রকে শরৎচন্দ্র যে বিশেষ স্নেহ করতেন তা নিশ্চয়ই সকলের জানা। সুভাষচন্দ্র অনেক দুঃখের দিনে শরৎচন্দ্রের কাছে আসতেন শান্তি ও সান্ত্বনার প্রয়োজনে।

বিপ্লবীদের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্তরের যোগ ছিল। বিপিন বিহারী গঙ্গোপাধ্যায় অনেক বার সামতাবেড়ে গিয়ে আত্মগোপন করেছেন, শরৎচন্দ্রের কাছ থেকে অনেক রকম সাহায্য নিয়েছেন। আরেকজন বিপ্লবী কাকোরী ষড়যন্ত্রের শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। হেমচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের সংগেও তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়।

‘বেণু’’ পত্রিকায় শরৎচন্দ্র নিয়মিত লিখতেন এবং নানা ভাবে সাহায্য করতেন। শরৎচন্দ্র বলতেন—জেল বাঁচিয়ে তোমরা দেশ গঠন করো, গড়াটাই কঠিন—। “বেণু” যখন ১৯৩২-এ বন্ধ হয়ে যায় পুলিশের অত্যাচারে, সেই সময় শরৎচন্দ্রের বন্দুক ও পিস্তল বাজেয়াপ্ত করে। পথের দাবীতে শরৎচন্দ্র বিনোদের মুখে বলেছেন—“...সকল দেশেই জনকতক লোক থাকে যাদের জাতই আলাদা। দেশের মাটি এদের গায়ের মাংস, দেশের জল এদের শিরের রক্ত। বোধহয় এদেরই কেউ কোন সত্যকালে জননী জন্মভূমি কথাটা প্রথম আবিষ্কার করেছিল এদের বেঁচে থাকা আর প্রাণ দেওয়ার মধ্যে একটুকু মাত্র প্রভেদ।”

শরৎচন্দ্রকে আমরা দেখেছি ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পর যখন একে একে অনেকে ধরা পড়ল, শরৎচন্দ্র তখন ছটফট করেছেন।

শরৎচন্দ্র বলতেন—আমার মৃতদেহ যেন বিপ্লবীরা বহন করে নিয়ে যায়। তাই হয়েছিল। অশ্বিনী দত্ত রোডের বাড়ি থেকে দেহটা নিয়ে শববাহকরা যখন বেরুল তখন অপরাহ্ণ বেলা, আর মুহূর্তে সেই শব-দেহ হাজার মানুষের জয়গানে মুখরিত হয়ে বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে চলল বাংলার বিপ্লবীদের কাঁধে কাঁধে।

শরৎচন্দ্র যেটুকু দান করতেন তা নীরবে, কোনদিন কাউকে কিছু বলতেন না।

আর কোনোরকম দুঃখ বেদনার কথা উঠলে তাঁর চোখ ছলছল করে উঠত। বলতেন—আমাকে আর তোমরা ওসব কথা বোলোনা। ওসব আমার সয় না।

মুসলমান সাহিত্য সমাজ সম্পর্কে শরৎচন্দ্র চিন্তা করেছেন অনেক। তাঁর তিনটি প্রবন্ধ "মুসলিম সাহিত্য সমাজ, মুসলমান সাহিত্যের আর এক দিক" প্রভৃতির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের অপর শরিক মুসলিম সমাজের সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান উক্তি আছে।

মুসলিম পাঠকরা অনুযোগ করলেন—

"—আপনারা আমাদের টেনে নিন। স্নেহের সঙ্গে সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের কথা বলুন।"

উত্তরে শরৎচন্দ্র বললেন—'একথা আমি জানি, কিন্তু অনুরাগের সঙ্গে বিরাগ, প্রশংসার সঙ্গে তিরস্কার, ভালকথার সঙ্গে মন্দকথাও যে গল্প-সাহিত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু এ ত তোমরা না করবে বিচার, না করবে ক্ষমা। হয়ত এমন দণ্ডের ব্যবস্থা করবে যা ভাবলে শরীর শিউরে ওঠে। তার চেয়ে যা আছে, সেই ত নিরাপদ।"

এঁর নাম শরৎচন্দ্র, তিনি যা ভাল বুঝতেন বলতেন। মন রাখা কথা নয়, নিজের ক্ষয়-ক্ষতির দিকে তাকিয়ে নয়। কোনো রকম প্রাপ্তির দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। তাই মহাত্মাজী, রবীন্দ্রনাথ, প্রভৃতি যাঁরা তাঁর শ্রদ্ধাভাজন তাঁদের সম্পর্কেও তিনি যা উচিত বিবেচনা করেছেন তা স্পষ্ট করে বলতে পেরেছেন।

শরৎচন্দ্র আজো অনাবিষ্কৃত। শরৎসাহিত্য এবং শরৎ জীবনী নতুন করে লিখিত হওয়ার কাল যে সমাগত এই বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন।

শরৎ-স্মৃতি

ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

বাংলা ১৩২০ সন, ইংরেজী ১৯১৩ সাল। আমি তখন ঢাকা ট্রেনিং কলেজের অধ্যাপক। পুজার ছুটিতে কলিকাতা আসিয়াছি। আমাদের বাসা তখন ভবানীপুরে চন্দ্রনাথ চাটার্জ্জী ষ্ট্রীটে। ইহার নিকটেই একটি ছোট অফিস হইতে যমুনা নামে ছোট একখানি মাসিক পত্র প্রকাশিত হইত। পাড়াপড়সী হিসাবে আমার দাদা ঐ পত্রিকাখানি রাখিতেন। আমি যেদিন কলিকাতা পৌঁছি সেই দিনই কথা প্রসঙ্গে দাদা বলিলেন যে যমুনা পত্রিকায় চন্দ্রনাথ নামে একটি বড় ধারাবাহিক উপন্যাস ও আরও কয়েকটি ছোট গল্প প্রকাশিত হইতেছে, পড়িয়া দেখিও। কাগজখানার চেহারা দেখিয়া খুব ভক্তি হইল না। যাহা হউক দুপুরে আহারাদি করিয়া পড়িব স্থির করিলাম। ছুটির দিনে দিবা নিদ্রার আরাম উপভোগ করা চিরকালের অভ্যাস। নিদ্রার উপকরণ হিসাবে শুইয়া শুইয়া গল্প কয়টি পড়িতে আরম্ভ করিলাম। পড়িতে পড়িতে তন্ময় হইয়া গেলাম। যখন সমুদয় গল্পগুলি শেষ করিলাম তখন মনে হইল অপূর্ব্ব, এমনটি বুঝি আর শীঘ্র চোখে পড়ে নাই। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় নামক অজ্ঞাত অখ্যাত লেখককে নীরবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলাম। অজ্ঞাতসারে দুইটি কবির দুইটি পংক্তি মনে পড়িয়া গেল। প্রথমটি একটি ইংরেজী কবিতার অংশ—"আমি প্রভাতে জাগিয়া দেখিলাম জগদ্বিখ্যাত হইয়াছি।" দ্বিতীয়টি হেমচন্দ্রের—"পর্ব্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ।" আমার ন্যায় অনেকেই যে প্রথম পরিচয়েই মনে মনে শরৎচন্দ্রের ললাটে রাজটীকা ও মস্তকে জয়মালা দিয়াছিলেন ইহা এখন সুপরিচিত সত্য।

তারপর শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনিলাম। আমার এক বিশিষ্ট বন্ধু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে শরৎচন্দ্রের জীবনীর যে চিত্র আমার নিকট ব্যক্ত করিলেন তাহা উপন্যাসের উপযুক্ত বটে। কিন্তু পরে জানিয়াছি ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের পক্ষে তাহার অধিকাংশই অমূলক। সাধারণত বড়লোকদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত আজগুবি কাহিনী রটে—ইংরেজীতে যাহাকে বলে myth বা

legend। শরৎচন্দ্রের খ্যাতি প্রতিপত্তির মতন ইহাও অকস্মাৎ শাখা প্রশাখায় পল্লবিত হইয়া উঠিল।

ইহার বহুদিন পরে শরৎচন্দ্রের সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয় স্বর্গীয় বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিমলা ষ্ট্রীটের বাটীতে। কিন্তু খুব অল্পক্ষণের জন্য—বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হয় নাই। তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সৌভাগ্য তারপরও বহুদিন হয় নাই। কিন্তু ১৩৩২ সালের প্রথমে (ইং ১৯২৫) মুন্সীগঞ্জে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন উপলক্ষে এই সুযোগ ঘটিল। এই সম্মেলনের সাহিত্য শাখার সভাপতি ছিলেন শরৎচন্দ্র আর ইতিহাস শাখার সভাপতি ছিলাম আমি। কর্ত্তৃপক্ষ একটি স্কুল বাড়ীর (অথবা ছাত্রাবাসের) এক কক্ষেই আমাদের উভয়ের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া ছিলেন। সুতরাং আলাপ পরিচয় বেশ জমিয়া উঠিল।

আহারাদির পর সভাস্থলে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি, শরৎবাবুও কাপড় চোপড় পরিয়াছেন এমন সময় এক গোলযোগ ঘটিল। শরৎবাবু সভাপতির অভিভাষণ লিখিয়া আনিয়াছিলেন কিন্তু এখন আর তাহা খুঁজিয়া পাইতেছেন না। প্রথমে বস্ত্র, বিছানা, পরে জামার পকেট প্রভৃতি তন্ন তন্ন করিয়া খোঁজা হইল, কোথাও তাহা মিলিল না। এদিকে সভার সময় অতীত হইয়া গিয়াছে, সম্মেলনের পক্ষ হইতে কয়েকজন আমাদিগকে নিতে আসিয়াছেন। শরৎবাবু সহসা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, এই একটু আগে আমি এই ঘাটে বসিয়া উহা পড়িয়াছি, কোথায় গেল? তখন আমার হঠাৎ মনে পড়িল যে কিছুক্ষণ পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র তামাক খাইবার সময় কলিকাটা গরম ছিল বলিয়াই হউক অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক খানিকটা কাগজ হাতের মধ্যে মুট করিয়া ধরিয়া ব্যবহার করিয়া ছিলেন, পরে তামাক খাওয়া হইলে তাহা দূরে ফেলিয়া দিয়াছিলেন। চাহিয়া দেখিলাম ঘরের এক কোণে বেণের পুঁটুলির মত সেই কাগজের মোড়কটি পড়িয়া আছে। আমি সেইটি কুড়াইয়া আনিয়া খুলিয়া দেখি, খুব ছোট ছোট অক্ষরে লেখা একটি সাহিত্যিক সন্দর্ভ। আমি শরৎ বাবুকে উহা দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটি কি? তিনি আমার হাত হইতে উহা লইয়া একবার চোখ বুলাইয়া দেখিয়াই বলিলেন, আরে এইত আমার অভিভাষণ! কোথায় পাইলে? আমি হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে সকল কথা বলিলাম। উপস্থিত সকলেই হাসিতে লাগিলেন, কিন্তু শরৎবাবু কিছুমাত্র অপ্রতিভ হইলেন না।

এই সময় শরৎবাবু দিনে কিছু খাইতেন না, ঘনঘন তামাক ও চা পাইলেই চলিত। রাত্রে আহারাদির পর পাশা-পাশি দুই খাটে দুই বিছানার উপর বসিয়া অনেক কথাবার্ত্তা হইল। সরস বাক্যালাপে শরৎচন্দ্রের অসাধারণ পটুতা এবং তাঁহার জ্ঞানের গভীরতা সেই দিনই প্রথম উপলব্ধি করিলাম। রাত্রি ১০টা কি ১১টার সময় শরৎচন্দ্র বলিলেন, চল বাহিরে যাই। আমার সঙ্গে আমার বালক পুত্র ছিল, সে ইতিমধ্যে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। তাহাকে দেখাইয়া শরৎচন্দ্র বলিলেন যে ওর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। বলিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং আমরা দুইজনে বাহিরে আসিলাম। চারিদিকে বিস্তীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। ঘাসের উপর একটা শুকনো কাঠের গুঁড়ি ছিল তাহাতেই দুজনে পাশাপাশি বসিলাম। সাহিত্য ইতিহাস প্রভৃতি নানা বিষয়ে তিনি কত কথা বলিলেন, মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। ক্রমে রাত্রি প্রায় একটা কি দুইটা বাজিল, কিন্তু ঘুমের কথা মনেও হইল না। এখন দুঃখ হয় যে সে সময়ে বা তাহার অব্যবহিত পরে এইসব কথাবার্ত্তার সার মর্ম্ম লিখিয়া রাখি নাই কেন? কারণ এখন আর তাহার প্রায় কিছুই মনে নাই। কেবল দুইটি কথা আমার মনে খুব গভীর রেখাপাত করিয়াছিল তাহা এখনও ভুলি নাই। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার উপন্যাসগুলির মধ্যে কোনখানা আপনি সবচেয়ে ভাল মনে করেন? শরৎবাবু কিছুমাত্র ইতস্তত না করিয়া তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—'গৃহদাহ, আর্টের দিক দিয়া এ একেবারে নিখুঁৎ। আমাকে চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া বলিলেন, জবাবটা বুঝি মনের মত হয় নাই? আমি স্বীকার করিয়া কহিলাম যে তাঁহার অনুমান সত্য। তারপর অনেকক্ষণ এ বিষয়ে আলাপ হইল।

আর একটি কথা মনে আছে। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলিলাম যে অনেকে মনে করে যে আপনার বিভিন্ন উপন্যাসের চরিত্রগুলি অনেকটা একই ধরণের এবং এই বৈচিত্রের অভাব আপনার উপন্যাসের অঙ্গহানি করিয়াছে। তিনি একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, সৈন্যরা যখন প্যারেড করে তখন দূর থেকে সকলকেএকই রকম দেখায় অথচ প্রত্যেকেরই স্বাতন্ত্র আছে। সাদৃশ্যের মধ্য দিয়া সেই স্বাতন্ত্র্য দেখানই আর্টের বৈশিষ্ট্য।

সেদিনকার সুদীর্ঘ আলাপের মধ্যে শরৎবাবুর এই দুইটি উক্তিই কেবল মাত্র আমার মনে আছে। পরবর্ত্তীকালে ইহার সম্বন্ধে অনেক ভাবিয়াছি কিন্তু সে আলোচনা বর্ত্তমান ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক।

মুন্সীগঞ্জের সম্মেলন শেষ হইলে আমি শরৎবাবুকে ঢাকা যাইবার জন্য আমন্ত্রণ করিলাম। তিনিও সম্মত হইলেন। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও 'জগন্নাথ হল' নামক ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ। পূর্ব্বেই আমি এই সংবাদ ঢাকায় পাঠাইয়া দিলাম যাহাতে শরৎবাবুর অভ্যর্থনার সমুচিত বন্দোবস্ত হয়। বলা বাহুল্য ছাত্রদল এই সংবাদে অত্যন্ত আনন্দিত হইল, এবং এই সময় গ্রীষ্মের ছুটি থাকা সত্ত্বেও শরৎবাবু ঢাকায় গেলে বিপুল সমারোহ সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা হইল। এই উপলক্ষে তাঁহার দরদী হৃদয়ের প্রথম পরিচয় পাইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি তিনি দিনে কিছু খাইতেন না। আমার বাটির মধ্যে একটি পুকুর ছিল। তাঁহার বাঁধান ঘাটের উপরে দুই রোয়াকে বসিয়া আমাদের মজলিস জমিত। আমার স্ত্রী শরৎবাবুর নিকট অতি অল্পকালের মধ্যেই চিরপরিচিত বান্ধবের ন্যায় হইয়া উঠিলেন। নিজের পান ও আহারাদি সম্বন্ধে শরৎবাবু অকপটে সমস্ত ফাইফরমাস সেখানেই পেশ করিতেন। ফলে দেখিতাম ঘাটের মজলিসে তিনি আসর জমাইয়া বসিতেন আর পেয়ালার পর পেয়ালা চা আসিত এবং ঘন ঘন হুকার কলিকা বদলি হইত। এক রাত্রে আহারাদির পর আমি, তিনি ও আমার স্ত্রী যখন এই তিনজন মাত্র ছিলাম তখন তিনি নিজের জীবনের অনেক কথা বলিলেন এবং অকপটে অনেক বিষয়ে যে সমুদয় মন্তব্য করিলেন তাহাতেই তাঁহার মনের গভীর অন্তর্দৃষ্টি, মনুষ্যচরিত্র সম্বন্ধে সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দীন, দরিদ্র, উৎপীড়িতের প্রতি গভীর দরদের পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইলাম। বুঝিতে পারিলাম কি গুণে তাঁহার সৃষ্ট চরিত্র এমন মর্ম্মস্পর্শী হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেই তাঁহার অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি ছিল সব চেয়ে বেশী। কয়েকটি কাহিনী বলিয়া আমার স্ত্রীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'দিদি, তোমাদের সম্বন্ধে কোন সমাজই কখনই সুবিচার করে নাই, আমার উপন্যাসের মধ্য দিয়ে আমি জীবন ভোর তারই প্রতিবাদ করব।' অনেক সময় এমনি আরও অনেক কথা বলিতেন—বলিতে বলিতে ভাবাবেগে উচ্ছ্বসিত হইতেন। এই প্রসঙ্গে একদিন গল্প করিয়াছিলেন যে বহু নারীর জীবনকথা সংগ্রহ করিয়া তিনি একখানি বৃহৎ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা পুড়িয়া গিয়াছে। ঢাকায় তিনি বেশীদিন ছিলেন না। তাঁর কয়েকটি পোষা কুকুর তাঁর শিবপুরের বাড়ীতে ছিল। খবর পাইলেন তার একটির কি অসুখ হইয়াছে। অমনি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইলেন। এই উপলক্ষে শুনিলাম কুকুরের প্রতি তাঁর অদ্ভুত অনুরাগের কথা। তাদের

খাবার শোবার যে বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছেন সে কথা সবিস্তারে বলিলেন। ফিরিয়া আসিবার পরে তাঁর একটি কুকুর মারা যায়—সে বিষয়ে দুঃখ করিয়া তিনি একখানি চিঠি লিখিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে আমার স্ত্রী একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কুকুর বিড়ালের প্রতি যার এত দরদ বাংলার পাঠক পাঠিকার প্রতি তিনি এত অকরুণ কেন? শরৎবাবু একটু অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিলেন। তিনি বলিলেন, "মাসিক পত্রে আপনার ক্রমশঃ প্রকাশ্য উপন্যাস যখন মাঝে মাঝে বন্ধ থাকে তখন আপনার পাঠক পাঠিকার কিরূপ কষ্ট হয় তাহা কি আপনি জানেন না?" শরৎবাবু শুনিয়া হাসিয়া উঠিলেন এবং খানিকক্ষণ বেশ জোরে জোরে হাসিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, তুমি তো আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিলে, না জানি কি গুরুতর অভিযোগই শুনতে হবে। আমার লেখা যে সব সময়ে নিয়মমত বার হয় না তার কারণ আমি বড় অলস লোক। আচ্ছা এবার থেকে ঠিক নিয়ম মতই বার হবে। তাঁর এ প্রতিশ্রুতি তিনি অনেকটা রক্ষা করিয়াছিলেন।

এর কয়েক বছর পরে যাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শরৎবাবুকে একটা অনারারী ডিগ্রী—ডি লিট দেওয়া হয় আমি সেজন্য চেষ্টা করি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এইরূপ সম্মান দিলেই সেটা সুশোভন হত, কিন্তু তা যখন হোল না তখন অন্তত বাংলার একটা বিশ্ববিদ্যালয় যাতে তাঁর গুণের উপযুক্ত সম্মান করে সেই জন্যই আমি এ বিষয়ে অগ্রণী হয়ে ছিলাম। ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা ও ও সৌজন্যের কথা ছেড়ে দিয়ে শরৎবাবুর সাহিত্যিক প্রতিভার সম্মানের জন্যই যে এরূপ ডিগ্রি দেওয়া উচিত ইহা আজ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করলেও সেদিন একথাটা প্রমাণ করতে আমাকে কম বেগ পেতে হয় নাই। কিন্তু আজ সে সকল কথার সবিস্তারে আলোচনা অনাবশ্যক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ এই প্রস্তাব গ্রহণ কল্লেন এবং এই উপলক্ষে কনভোকেশনের সময় শরৎবাবু আবার ঢাকায় এলেন।

প্রথমবার ঢাকায় আসবার পর ১০।১১ বৎসর কেটে গেছে। এই কয় বৎসরে শরৎবাবুর খ্যাতি ও প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে গেছে। সুতরাং তিনি ঢাকায় আসবেন শুনে নানা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে গেল। আমি ব্যবস্থা করেছিলাম যে তিনি যেদিন ঢাকায় পৌছবেন সেদিনই জগন্নাথ হলে ছাত্রগণের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করা হবে। শরৎবাবু এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে আমাকে চিঠি লিখেছিলেন এবং

আমার উপরেই সকল ব্যবস্থার ভার দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আসবার ঠিক আগের দিন সংবাদ এল যে নারায়ণগঞ্জের একদল সাহিত্যিক স্থির করেছেন যে স্টীমার থেকে নামলেই তাঁকে নিয়ে যেয়ে এক সভা করবেন। এর ফলে আমাদের ব্যবস্থা ও আয়োজন সবই গোলমাল হয়ে যাবে। শরৎবাবু নারায়ণ-গঞ্জ-আলাদের কাছে কোন কথা দেন নাই, কিন্তু তিনি যে তাদের অনুরোধ উপরোধ এড়াতে পারবেন না তা বেশ জানতাম। সুতরাং এটা বন্ধ করবার জন্য একদল বাছাই ছাত্র নিয়ে আমার সহযোগী অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী নারায়ণগঞ্জ গেলেন এবং ষ্টীমার থেকেই শরৎচন্দ্রের চারিদিকে ব্যূহ রচনা করে তাঁকে নামিয়ে মটরে করে একেবারে ঢাকায় নিয়ে এলেন। তিনি ঢাকায় এসেই আমার স্ত্রীকে বললেন, আজ থেকে তোমার স্বামীকে আমি বলব গুণ্ডা। কারণ ঠিক গুণ্ডার মতই আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। সত্য সত্যই তিনি এর পর থেকে আমাকে গুণ্ডা বলেই ডাকতেন।

জগন্নাথহলে যে বিপুল সমারোহ ও আন্তরিকতা সহকারে তাঁর অভ্যর্থনা হয়েছিল তা আজও মনে পড়ে। শরৎবাবু সম্বর্দ্ধনার উত্তরে অন্যান্য কথার মধ্যে বলেছিলেন যে শীঘ্রই তিনি মুসলমান সমাজ অবলম্বন করে একখানি উপন্যাস লিখবেন। কিন্তু তাঁর এ আশা পূর্ণ হয় নাই।

পূর্ব্ববারের ন্যায় এবারেও রাত্রে আহারাদির পর বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিরালা আলাপ পরিচয়ের সুযোগ হয়েছিল। তিনি ঢাকা থেকে চলে আসবার কয়দিন পরে, যে যে বিষয়ে তিনি বলেছিলেন আমি সে সম্বন্ধে একটু সংক্ষিপ্ত নোট করে রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম অবসরমত বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করে রাখব। দুর্ভাগ্যক্রমে তা আর হয়ে ওঠে নি। সুতরাং অনেক বিবরণই এখন আর মনে নেই। তবে সেই নোটের সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করে সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয়ে তাঁর মতামত যথাসাধ্য লিখছি।

(১) বিজয়া নাটকের প্রধান অভিনেত্রী সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মন্তব্য করেন। যতদূর স্মরণ হয় তাঁর মতে বিজয়ার প্রকৃত ভাবটি অভিনয়ে ফুটে ওঠে নাই বলে তিনি আক্ষেপ করেন। এই প্রসঙ্গে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে বিজয়া নাটকে বিলাসের চরিত্রের ভাল দিকটা তেমন দেখান হয় নি কেন? তিনি উত্তর দিলেন যে তিনি ইচ্ছা করেই এরূপ করেছেন। বিলাসের প্রতি দর্শকের মনে সহানুভূতি জাগলে নাটকের মূল প্রস্তাব থেকে তাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে নাটকের

উদ্দেশ্য বিফল হবার এবং নাটকের মধ্যে যে কেন্দ্রগত ঐক্য থাকা আবশ্যক তা নষ্ট হবার সম্ভাবনা।

(২) স্ত্রীলোকের সতীত্ব সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। তিনি বলেন আমরা মনে মনে এ বিষয়ে যে আদর্শ পোষণ করি বর্ত্তমান সমাজের সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় থাকলে বুঝতে পারব তা কতটা ভুয়ো। এটা প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি নামধাম সহকারে কয়েকটি কাহিনী বলেন। বাস্তব জগতে যে কিরণময়ীর অভাব নাই এগুলি তারই দৃষ্টান্ত। এবিষয়ে বিশদ বিবরণ নিষ্প্রয়োজন।

(৩) ব্রহ্মদেশীয় স্ত্রীলোকের বাঙ্গালী পতির প্রতি ভক্তি; এবং পক্ষান্তরে বাঙ্গালী স্বামীর কর্ম্মী স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের কয়েকটি কাহিনী (নামধাম সহকারে) বলেন। এক বাঙ্গালীর বর্ম্মাদেশীয় স্ত্রী তাহার বাঙ্গালী স্ত্রীকে ভরণ পোষণ করিতেছে এরূপ একটি দৃষ্টান্তেরও উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষে তিনি বলেন যে টীকেন্দ্রজিতের স্ত্রী জুতা সেলাই করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন, পরে গভর্ণমেণ্ট তাহাকে মাসিক ১০ টাকা করিয়া বৃত্তি দেন।

(৪) রামকৃষ্ণ মিশন সম্বন্ধে তিনি খুব বিরুদ্ধমত পোষণ করিতেন। তাঁহার ভ্রাতা প্রভাস এই মিশনে যোগদান করেন এবং (তাঁহার মতে) একপ্রকার চিনাচিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করেন। ইহা লইয়া শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ স্বামীর সহিত তাঁহার বাদানুবাদ হয়।

(৫) অর্থাভাবে পরীক্ষার ফি যোগাড় করিতে না পারায় তিনি এফ, এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই। (এইখানে আমার নোটে লেখা আছে পাঁচকড়ি বাবু তাঁহার শিক্ষক ছিলেন—ইনি নায়কের সম্পাদক পাঁচকড়িবাবু না আর কেহ সেই স্মরণ নাই।)

(৬) তাঁহার জীবনে এমন দিনও গিয়াছে যখন তিনি শনিবার হইতে বুধবার পর্যন্ত মদ্যপান করিতেন।

(৭) "পথের দাবী"র প্রচার যখন গবর্ণমেণ্ট বন্ধ করেন তখন তিনি এবিষয়ে প্রতিবাদ করিবার জন্য রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ করেন। রবীন্দ্রনাথ তাহা না করায় তিনি বিশেষ ক্ষুন্ন হইয়াছিলেন।

(৮) ব্রহ্মদেশে গোপনে কোকেনের ব্যবসা চালাইত এরূপ একটি দলের কথা তিনি শুনিয়াছিলেন। দলের কর্ত্রী ছিল একটি স্ত্রীলোক। ইহারা সুমাত্রা ও যবদ্বীপে ব্যবসা করিত। ইহা হইতে "পথের দাবী"র সুমিত্রার সৃষ্টি।

(৯) সিঙ্গাপুর হইতে দুইজন রাজদ্রোহী পলাইয়া বর্ম্মায় শরৎবাবুর আশ্রয়ে কিছুদিন থাকে। এইজন্যেই তিনি পুলিশের কোপদৃষ্টিতে পড়েন এবং তাঁহাকে ব্রহ্মদেশ ত্যাগ করিতে হয়। এই উপলক্ষে কলসন নামে এক পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তাঁহাকে অনেক জেরা করেন। "পথের দাবী" বাজেয়াপ্ত হইলেও গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে জেলে দেয় নাই কেন ইহার কারণ বলেন। একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীর সুপারিশেই গভর্ণমেণ্ট তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করে নাই। এই কর্ম্মচারীটী এখনও জীবিত। সন্ত্রাসবাদী (terrorist) দলের অনেকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। তাঁহাদের জীবনের ভিত্তির উপরই সব্যসাচীর সৃষ্টি।

(১০) মহাত্মা গান্ধীর মতামত তিনি নির্ভীকভাবে প্রতিবাদ করেন। পূর্ণ স্বাধীনতার সপক্ষে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ও অনেক মন্তব্য করিলেন। এই সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকটি উক্তি আমার নোটে লেখা আছে। কিন্তু বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে তাহার উল্লেখ সমীচীন নয়।

আমার সংক্ষিপ্ত নোটের সাহায্যে স্মৃতিশক্তির উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার কয়েকটি মাত্র কথা লিখিলাম। যে বিষয়ে তিনি নিজের মতামত কোনদিন প্রকাশ্যে কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া শুনি নাই সে সম্বন্ধে বর্ত্তমান অবস্থা বিবেচনা করিয়া অনেক স্থলেই বিস্তারিত আলোচনা সঙ্গত মনে করি নাই—সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি মাত্র।

ঢাকা হইতে ফিরিবার কিছুকাল পর তাঁহার শরীর অসুস্থ হয়। এই সম্বন্ধে তাঁহাকে পত্র লিখি। উত্তরে তিনি যে চিঠি লেখেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"ভাই ছায়েব, আমার অকৃত্রিম প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিবা। কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে নমস্কার দিবা ও চারুর (সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। ইনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার সহিত শরৎবাবুর বিশেষ সৌজন্য ছিল। ঢাকায় তাঁহার বাড়ীতেই শরৎবাবু থাকিতেন।) সহিত যদি দেখা হয় আমার কথা বলিবা।

এদিকে আমার জ্বর ত সারিল না। শ্রীবিধানাদি ডাক্তারের দল রোগ নির্ণয়ে অক্ষম।

'নানান ছাপের জমলো শিশি
নানা মাপের কৌটা হলো জড়ো

ব্যাধির চেয়ে আধি হয়ে বড় করলে যখন অস্থি জরজর,
ডাক্তারেরা বললে তখন হাওয়া বদল করো।'

অতএব, দুই তিন দিনেই স্থানত্যাগের বাসনা। নিজের নয় অন্যদের। আমি মনে মনে বলি, হে আমার সন্ধ্যাবেলার নিত্যসহচর ৯৯° জ্বর, তুমি আর একটুখানি প্রসন্ন হয়ে তোমার আরব্ধ কাজটুকু চটপট সেরে ফেলো, আমি অব্যাহতি পাই। ইতি ১১ই পৌষ ১৩৪৩

তোমাদের শুভাকাঙ্ক্ষী
শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ইহার পর আর মাত্র এক বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন। কিন্তু শরীর কখনও সুস্থ হয় নাই। ২রা মাঘ ১৩৪৪ তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শরৎচন্দ্রের সাহিত্যিক রচনা তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। আমার বিশ্বাস আছে যে বহুকাল পর্যন্ত "গৌড়জন তাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" কিন্তু তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, অকপট স্নেহ ও সৌহার্দ্দ্য সরস বাকপটুতা, আন্তরিক বন্ধুবৎসলতা ও শিশুসুলভ সরলতার কথা অচিরেই কালসাগরে বিলীন হইবে। ভবিষ্যদ্বংশীয়দের জন্য যাহাতে ইহার একটু ছবিও ধরিয়া রাখিতে পারা যায় এই উদ্দেশ্যেই এই স্মৃতিকথা লিখিলাম।

শরৎ-প্রসঙ্গ

কবিশেখর কালিদাস রায়

শরৎচন্দ্রের সমাদর দেশে যা হয়েছিল—তা আমাদের দেশে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া কোন বড় লেখকও জীবদ্দশায় পান নি। তাঁর বই বিক্রীর আয়ের দ্বারাও তিনি তা বুঝতেন। তাছাড়া দেশের লোক তাঁকে নানাভাবে অভিনন্দিত করেছে। সভাসমিতি তিনি এড়িয়ে চলতেন, কিন্তু কোন সাহিত্যকসভায় সভাপতিত্বের জন্য লোকে আগে তাঁর কাছেই যেত। কিন্তু তাঁর দুই একটা বিষয়ে ক্ষোভ ছিল। একটা ক্ষোভ, দেশের বিদ্বৎ প্রতিষ্ঠান তাঁকে সম্মানিত করে নি—এ ক্ষোভ তাঁর মিটে ছিল ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি-লিট উপাধি পেয়ে। আর একটা ক্ষোভ ছিল, রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্যক সমাদর করেন নি। এ বিষয়ে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা হয়—তাতে আমি বলেছিলাম—'তিনি ত আপনাকে একখানা বই উৎসর্গ করেছেন।" তাতে তিনি উত্তর দিয়েছিলেন—"যে বই তিনি আমাকে উৎসর্গ করেছেন—সে বই এতই নগণ্য যে সে বই-এর নামও লোক জানে না। একেবারে কোন বই উৎসর্গ না করলে আরও খুশী হতাম। যাই হোক সে দান আমি গুরুর আশীর্ব্বাদ ব'লে মাথায় তুলে নিয়েছি। কিন্তু তাতে আমার অভিমান ঘুচেনি।"

যাই হোক তাঁর শেষ পর্যান্ত অভিমান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্য্যন্ত শরৎচন্দ্রকে যে সমাদর করেছিলেন—শরৎচন্দ্র তাতে ধন্য হয়ে গিয়েছিলেন—সে প্রসঙ্গ আগেই বলেছি।

আর একটা ক্ষোভ তাঁর ছিল—দেশের কবিরা তাঁর যে সমাদর করেছেন—কথা সাহিত্যিকরা সেরূপ সমাদর করেন নি। কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধে লেখনী চালনাও করেছেন।—সেদিন একজন বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক একজন সাহিত্যিকের সঙ্গে এসেছিলেন। কথাসাহিত্যিকটি রাস্তায় মোটরে ব'সে থাকলেন—আমার বাড়ীতে এসে দেখাও করলেন না।

এর উত্তরে আমি বলেছিলাম—কথাসাহিত্যিকরা প্রকাশ্যভাবে আপনার সমাদর যা করেছেন তা হয়ত আশানুরূপ নয়। কিন্তু মনে মনে তাঁরা যে সমাদর

করেন—তার সিকিও আমরা করতে পারি না। বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকরা রবীন্দ্রনাথের অনুকারক ন'ন তাঁরা আপনারই অনুকারক। আপনি কথাসাহিত্যে যে রচনা-ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করেছেন—তারা সেই রচনাভঙ্গীরই অনুসরণ করে। তাদের রচনার বিষয়বস্তু অনেকস্থলেই হয়ত স্বতন্ত্র। কেউ গল্পের আবেষ্টনী গঙ্গা-তীর হতে পদ্মাতীরে বা অজয়-ময়ূরাক্ষীর তীরে নিয়ে গিয়েছেন—কেউ বা বাঙ্গালীর সাধারণ পারিবারিক ও সামাজিক গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বৃহত্তর সমাজে রচনার উপজীব্য খুঁজেছেন কেউ বা আপনার কল্পিত পাত্র-পাত্রী সমাজের যে স্তরের —সে স্তরের উর্দ্ধে আরো নিয়ে তাঁদের সাহিত্যের পাত্র-পাত্রী সংগ্রহ করেছেন—কেউবা সামাজিক ও রাষ্ট্রিয় জীবনের নানা তথ্য ও সমস্যার অবতারনা করেছেন —তাঁরা জ্ঞাতসারেই হোক আর অজ্ঞাতসারেই হোক, তারই অনুসরণ করেছে। যে দরদী দৃষ্টি দিয়ে আপনি বাংলার দুঃস্থ দুর্গত নরনারীদের দেখেছেন-এরাও সেই দরদী দৃষ্টিরই অনুসরণ করেছে, সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের যে উদার সংস্কারমুক্ত নৈতিক আদর্শের আপনি প্রতিষ্ঠা করেছেন এরাও তারই অনুসরণ করেছে। কেবল প্রকৃতি সম্বন্ধে attitudeটী পেয়েছে রবীন্দ্রনাথ হ'তে।

সংস্কৃত ভাষা হ'তে প্রাকৃত ভাষার সৃষ্টি—তাহতে হয়েছে বাংলা। বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার যে সম্বন্ধ এদের রচনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের রচনার সেই সম্বন্ধ। আর বাংলা ভাষার সঙ্গে মাগধী প্রাকৃত ভাষার যে সম্বন্ধ এদের রচনার সঙ্গে আপনার রচনার সেই সম্বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বের, আপনি বাংলার। বর্ত্তমান যুগের কথাসাহিত্যিকের দৃষ্টি কারো বিশ্বের পানে নয়, বাংলার পানেই—কাজেই রবীন্দ্রনাথ এদের গুরু আর আপনি এদের অগ্রজ। এরা যদি সর্ব্বপ্রকারে আপনারই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে থাকে—তবে তার চেয়ে সমাদর আর কে করেছে?

শরৎচন্দ্র বলিলেন—অনুজ কি শুধু অগ্রজের অনুসরণ করে—তাকে ভালবাসে না—শ্রদ্ধা করে না?

আমি বলিলাম—দেখুন, তাদের পক্ষ থেকেও ত অভিমানের কিছু থাকতে পারে। এ অভিমানও ত অস্বাভাবিক নয়—এ অভিমান অগ্রজের প্রতিই অনুজের থাকতে পারে।

শরৎচন্দ্র বলিলেন—কি অভিমান?

আমি বলিলাম—রবীন্দ্রনাথ আপনার যথাযোগ্য সমাদর করেন নি, ব'লে

আপনি অভিমান প্রকাশ করতেন, সেই অভিমান ত এরাও আপনার প্রতি পোষণ করতে পারে। আপনি ত তাদের শক্তি স্বীকার করে তাদের ডেকে বুকের কাছে টেনে নেন নি। আমি যদি বলি, অমুক বেশ ভাল গল্প লিখছে—আপনি বলেন অমুক—হ্যাঁ, ছোকরাটি বেশ ভদ্র বড় অমায়িক। এ-ত recognition নয়। তাদের কোন বই পড়েছেন কিনা যদি জিজ্ঞাসা করি—তাতে হয় বলেন—না, পড়িনি, নয় ত বলেন—কই সে বইত আমাকে দেয় নি। কাজেই তাদেরও ত অভিমান হতে পারে। কাউকে কাউকে আপনি যে Certificate দেন নি তা নয়, কিন্তু তা বই পড়ে দিয়েছেন বলে মনে হয় না। ওরকম certificate আমি নির্ব্বিচারে দিই ব'লে তিরস্কারই করেছেন।

শরৎচন্দ্র সত্যই সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন—তিনি এতে একটু লজ্জিতই হ'লেন। তিনি বললেন—দেখ, এদের বই নিয়ে আমি পড়তে গিয়ে কিছুদূর পড়েই যখন মনে হয়েছে এ লেখা আমিও অক্লেশে লিখতে পারতাম—তখনই আর আগাতে পারি নি। শেষ পর্যন্ত আর পড়া হয় নি। আমি বললাম—আপনি যদি ধৈর্য ধরে শেষ পর্যন্ত পড়ে দেখতেন—তাহলে এমন জিনিষ অনেক পেতেন যাতে মনে হ'তে পারত—বাঃ এটা ত নতুন কথা, এটা ত আমার মনে আসে নি—এটা ত আমি লিখতে পারতুম না। তা' ছাড়া যদি কিছুদূর আগিয়েই মনে হয়ে থাকে—এ লেখা আমিও লিখতে পারতাম তাহলেও সেটা ত উপেক্ষণীয় নয়—প্রশংসনীয়। আপনি যা লিখতে পারতেন—তাও যদি কেউ লিখে থাকে—তাকে উৎসাহ দেওয়া কি আপনার কর্ত্তব্য ছিল না?

মোট কথা নিজের রচনার সময় শরৎচন্দ্রের ধৈর্যের অভাব ছিল না, অধ্যবসায়ের অন্ত ছিল না। একই অংশ কতবার কেটে কেটে লিখতেন, সহজে তাঁর মনস্তুষ্টি হ'ত না। অনেক সময় আট-দশ পাতা নির্ম্মমভাবে কেটে ফেলে নতুন ক'রে লিখতেন।

কিন্তু অন্যের পুস্তকপাঠে তাঁর ধৈর্যের অভাব ঘটত। গোড়া হতেই খুব ভাল করে না জ'মে উঠলে তিনি কোন বই পড়ে উঠতে পারতেন না। Ivanhoe-র মত বই তিনি পড়তে পারেন নি। তিনি একদিন বলেছিলেন, "ওহে শুনেছি বঙ্কিমবাবু Ivanhoe হতে দুর্গেশনন্দিনীর আখ্যানবস্তু পেয়েছেন, তাই শুনে Ivanhoe পড়তে গেলাম—কয়েক পাতা পড়ে মনে হ'ল একথা কখনো সত্য নয়, বঙ্কিমবাবু কখনো Ivanhoe শেষ করে পড়তে পারেন নি।

শরৎচন্দ্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন উপাধি ছিল না। কিন্তু বিদ্যালয়ের

recognition-কে তিনি স্পৃহনীয় মনে করতেন। একদিন বলেছিলাম—"আপনার ডি-লিট পাওয়া উচিত। তাতে তিনি বলেছিলেন—''কি হবে ভাই ও উপাধি পেয়ে, দেশের লোক ত আমাকে তার চেয়ে বেশি সম্মান দিয়েছে।" একটু ভেবে শেষে বললেন—"বোধ হয়, সাহিত্য সেবার জন্য কোন উপাধি দেওয়ার প্রথাই নেই। সাহিত্য ছাড়া অন্যান্য বিষয়কে এরা recognise করে।"

আমি বলিলাম—"তাও নয়, thesis submit করলে এরা Doctorate দেয়। যারা thesis submit করে তারা এই উপাধির জন্যই করে। যারা উপাধি পাওয়ার উপলক্ষ না ক'রে স্বাধীনভাবে যে কোন ক্ষেত্রে সারস্বত সাধনা করে—আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় তাদের উপাধি দিয়ে recognise করে না। তা করলে—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রামেন্দ্রসুন্দর, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, রমাপ্রসাদ চন্দ, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইত্যাদি মণীষীরা Doctorate পেতেন। এরা জগতের যে কোন দেশের পক্ষে গৌরব। যে সব thesis-এ লোকে Doctorate পায় সে সব thesis-এর কাজের তুলনায় ঢের বেশি কাজ এঁরা করেছেন।"

শরৎচন্দ্র বললেন—National university যখন হবে তখন তা দেশের মনীষীদের গৌরবদান করবে। আমি আর তখন থাকব না—তোমরা পাবে।"

অল্পদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি-লিট উপাধিতে ভূষিত করলেন। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এর দু'বৎসর আগে আমাকে বলেছিলেন—"আমরা শরৎবাবুকে ডি-লিট দেওয়ার চেষ্টা করছি। কোন কোন পক্ষ হ'তে আপত্তি হচ্ছে। সে আপত্তি কাটিয়ে উঠতে পারা যাবে বলে মনে হচ্ছে।"

শরৎচন্দ্রের ডি-লিট উপাধি লাভের জন্য আমরা রসচক্র হ'তে উদ্যান সম্মিলনীর ব্যবস্থা করি—সেই সম্মেলনে নিম্নলিখিত অভিভাষণ পঠিত হয়েছিল।

"আপনারা সকলেই শুনিয়াছেন—গঙ্গাতীরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কথাশিল্পীকে বুড়ীগঙ্গাতীরে বিদ্বৎ-সমাজ ডি-লিট উপাধি দ্বারা ভূষিত করিয়াছেন। একদিন বঙ্গের রবিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই সম্মান দান করিয়া নিজের সম্মানই রক্ষা করিয়াছিল—আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্র—আমরা রবির প্রখর আলোকে বিলুপ্ত—সে সম্মানে আমরা নিজেদের সম্মানিত মনে করি নাই। শরৎচন্দ্রের এই সম্মানেই নক্ষত্রেরা আজ সম্মানিত।

শরৎচন্দ্রের প্রতি এই মর্যাদাদান রসসরস্বতীরই উপাসনা, রসের উদ্দেশ্যে

ত্রাণের অর্ঘদান,—শিল্পের বেদীতে তত্ত্বের প্রণিপাত। রসসরস্বতীকে যশোলক্ষী বহুদিন আগেই বরণ করিয়াছে—আজ ঐশর্য্যমদ—গর্ব্বিতা-ইন্দ্রাণী যে তাহার রত্ন-কিরীট অবনত করিয়াছে—তাহাতে রস-সরস্বতীর সেবক মাত্রই বিজয় গৌরব অনুভব করিবে। নগণ্য সেবক হইলেও আজ আমরাও গৌরব অনুভব করিতেছি। কাক যদি কোকিলতা প্রাপ্ত হয়—তবে কোন কোকিলের না আনন্দ হয়? কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

অরসজ্ঞ কাক চোষে জ্ঞান নিম্ব ফলে।
বসন্ত কোকিল বুলে প্রেমাম্র মুকুলে॥

কাক যদি জ্ঞাননিম্বফল ত্যাগ করিয়া একদিনের জন্যও প্রেমাম্র-মুকুলে বিলাস করে—তবে মুকুল কুঞ্জের কোন কোকিল আনন্দ অনুভব না করে? রসিক চিরদিনই রসের মর্যাদা বুঝে, তাহাতে নতুন করিয়া উল্লাসের কিছু নাই—কিন্তু যেখানে রসজ্ঞতার প্রত্যাশা করা যায় না—সেখান হইতে মর্যাদা আসিলেই উল্লাসের কারণ ঘটে। Old Testament-এর prodigal son-এর উপাখ্যানের কথা মনে পড়ে। অনুগত সন্তানের আনুগত্যের জন্য উৎসবের প্রয়োজন হয় নাই—prodigal son যেদিন ফিরিয়া আসিল সেইদিন হইল মহা মহোৎসব।

যাহারা সাহিত্যের খবর রাখে, সাহিত্যের জন্মকোষ্ঠী রচনা করে—যাহারা তাহার ঘটককারিকা ও কুলুজির ভাণ্ডারী—যাহারা সাহিত্যের ঘর সংসারের তদারক করে এবং শেষ পর্য্যন্ত তাহার আদ্যশ্রাদ্ধ সপিণ্ডীকরণ পর্য্যন্ত সমাপ্ত করে—আমাদের বিদ্বৎ সমাজ—চিরকাল তাহাদেরই সম্মানিত করে—কিন্তু যাহারা সাহিত্য সৃষ্টি করে তাহাদিগকে কোন সম্মান দেওয়া তাহার রীতিনীতি বিরুদ্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঐ রীতি না মানিয়া প্রীতির বশে যাহা করিয়া ফেলিল—তাহা ভারতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাসে ভাস্বর হইয়া থাকিবে।

বিজ্ঞানের অধ্যাপকের চেয়ে বৈজ্ঞানিক, দর্শনের শিক্ষকের চেয়ে দার্শনিক ও ইতিহাসের ব্যাখ্যাতার চেয়ে ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক যে বড়, এদেশের বিদ্বৎ-সমাজ—একথা স্বীকার করিলেও সাহিত্যের অধ্যাপকের চেয়ে যে সাহিত্য-স্রষ্টা ঢের বড় একথা স্বীকার করে না। এই কথা স্বীকার করাইতে হইলে সাহিত্য-স্রষ্টাকে মরিতে হয়—বাঁচিয়া থাকিয়া তাঁহার নমস্য বা বরেণ্য হইবার উপায় নাই। আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, যিনি খঞ্জ নহেন, অন্ধ নহেন, জরাজীর্ণ নহেন,

হাসপাতালে শয্যাগত নহেন—এমন একজন সুস্থ সবল জীবন্ত জলন্ত সাহিত্যিককে মর্য্যাদা দান করিয়া অসম্ভব সম্ভব করিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শরৎচন্দ্রকে এই মর্য্যাদা দান করিয়া নিজের মর্য্যাদাই বহুগুণে বৃদ্ধি করিল। শরৎচন্দ্রের গৌরবদ্যুতি নূতন করিয়া কি বাড়িবে জানি না। শরৎচন্দ্রের নামের সহিত যুক্ত হইয়া উপাধিই গৌরবান্বিত হইল, বলিয়া মনে করি।

আজিকার এই উদ্যান-সম্মিলনে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও আমাদের পরম ভক্তিভাজন শরৎচন্দ্রকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

আমরা কোন ঘটা সমারোহের ব্যবস্থা করি নাই—আমরা কোন মামুলি বচন বিলাপের আড়ম্বর করি নাই, আমরা সভাপতি ভাড়া করিয়া আনি নাই—আমরা অভিনন্দন পত্র রচনা করি নাই—আমরা ফুলের মালা পর্য্যন্ত পরাই নাই —আমরা আমাদের প্রাণের দাদাকে আমাদের অন্তরের গভীর আনন্দটুকু জানাইতেছি। রস-স্রষ্টা হইতে পারা বহু জন্মের সাধনার ফল—রসস্রষ্টা হইতে না পারি যেন রসের পরিপূর্ণ মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া রসচক্র নাম সার্থক করিতে পারি—এই আশীর্বাদ তাঁহার কাছে চাই।"

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র

শ্রীহিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের রচনার জনপ্রিয়তা সর্ববাদিস্বীকৃত। তার নানা বিক্ষিপ্ত পরিচয় নানা আকারে ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের সর্বগ্রাসী প্রতিভার উজ্জ্বলতা তাঁর প্রতিভাকে ম্লান করতে পারে নি। স্বকীয় গৌরবে ভাস্বর হয়ে তাঁর রচনা রবীন্দ্রযুগেও অনন্যসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সে জনপ্রিয়তা তাঁর মৃত্যুর পরও ক্ষুন্ন না হয়ে পরিবর্ধিত হয়েছে। তিনি যে অনন্যসাধারণ কথাশিল্পী তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রমাণ দু একটি প্রসঙ্গে তা উল্লেখ করা যেতে পারে।

কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সাধারণ মানুষ যে পদবী দিয়ে ভূষিত করে তা তাঁর বিশেষ গুণের একটি সঠিক পরিচয় দেবার ক্ষমতা রাখে। এইখানেই রাজশক্তি বা বিশেষ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি হতে তার পার্থক্য। এরা গুণী মানুষকে উপাধি দিয়ে একটি শ্রেণীভুক্ত করে। সাধারণ মানুষের প্রদত্ত উপাধি তাঁর ব্যক্তিগত গুণকে পরিস্ফুট ক'রে সকলের সামনে স্থাপন করে। সেকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে সাধারণ মানুষ নাম দিয়েছিল 'দয়ার সাগর'। তা সত্যই তাঁর মহত্তম গুণের পরিচায়ক। আমাদের কালে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে দেশের মানুষ 'মহাত্মা' নাম দিয়ে ভূষিত করেছিল। তাও সঠিকভাবে তার মৌলিক গুণের পরিচয় দেয়। শরৎচন্দ্রকে বাংলার সাধারণ সাহিত্যরসিক 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাও সমানই তাৎপর্যপূর্ণ। কথাশিল্পী হিসাবে তিনি সত্যই অপরাজেয়।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর অনন্যসাধারণ দক্ষতার পরোক্ষভাবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'শেষ সপ্তক' কাব্যসংকলনের এক কবিতায় তিনি শরৎচন্দ্রকে এক সাধারণ বাঙালী ঘরের মেয়ে হয়ে অনুরোধ জানিয়েছেন যে মেয়েটির প্রেমাস্পদের হৃদয় জয় করবার প্রতিযোগিতায় তাঁর অসামান্য রূপধারিণী বিদেশিনী প্রতিদ্বন্দ্বিনীকে হারিয়ে দিতে। এই অনুরোধের মধ্যে গভীর তাৎপর্য আছে অনুমান করা অসংগত হবে না। শরৎচন্দ্রই যেন জানেন চারিত্রিক গুণ দিয়ে কেমন ক'রে সাধারণ মেয়েও অসাধারণ মেয়েকে হারিয়ে দিতে পারে।

ঠিক বলতে তাঁর রচনার জনপ্রিয়তা অনেক সমালোচককে এমন আশ্চর্য্যান্বিত করে যে তাঁরা তার কারণ খুঁজে পান না এবং সেই কারণে তাঁর স্মৃতিসভায় এ বিষয়ে তাঁর প্রতি বিরূপ মন্তব্যও ক'রে বসেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে বলতে পারি, কোনও সভায় এমন অভিযোগও শুনেছি যে, তাঁর নাকি যতখানি জনপ্রিয় হওয়া উচিত ছিল তার থেকে তিনি অকারণে বেশী জনপ্রিয় হয়েছেন। এমনও দেখেছি যে কোনও কোনও সাহিত্যরসিক তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিকে যথোচিত মূল্য দিতে চান না। সাহিত্যসভায় এমন কথাও বলতে শুনেছি যে, তাঁর রচনায় তেমন কিছু গুণ নেই, তিনি কেবল একটি কৌশল আয়ত্ব করেছিলেন, তা হল নরম মনের সুযোগ নিয়ে তিনি শিখেছিলেন বাঙালীর চোখ জলের ধারায় কেমন ক'রে বহিয়ে দিতে হয়।

এই সব শুনে মনে প্রশ্ন ওঠে, এরা যা বলেন তা কি সত্য? সত্যই কি অসঙ্গত কারণে তিনি এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন? অথচ সোজাসুজি চোখের সামনেই তার বিরুদ্ধে স্পষ্ট সাক্ষ্য দেখা যায়। ইংরেজিতে একটি প্রচলিত কথা আছে যে পুডিং-এর পরিচয় তার আস্বাদনে। এই মানদণ্ড প্রয়োগ করলে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য যে সসম্মানে পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তা সর্বজনস্বীকৃত। দীর্ঘকাল ধরে যে রচনা জনপ্রিয় হয়ে থেকেছে, যার জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তা নিশ্চয় এমন গুণ ধারণ করে যা পাঠকের মনকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করতে পারে। বর্তমান প্রবন্ধে কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর এই অসাধারণ সাফল্য কোন্ কোন্ গুণের ওপর প্রতিষ্ঠিত তা বিশ্লেষণ ক'রে বাহির করবার চেষ্টা হবে।

প্রথমেই একটা জিনিস লক্ষ্য করা যেতে পারে যে, বাংলা সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের প্রবেশ ঘটেছিল অতি ধীরে সংকোচ-জড়িত পদক্ষেপে এবং একান্তই ভয়ে ভয়ে। সে কারণে তাঁর প্রবেশ দীর্ঘকাল বিলম্বিত হয়েছিল। মনে হয় তার একটা কারণ ছিল। তাঁর রচনার ভাগ্যে সাহিত্যিক খ্যাতি মিলবে কিনা সে বিষয়ে তাঁর একটা স্বাভাবিক আশংকা ছিল। অপরপক্ষে যখন তাঁর রচনার আত্মপ্রকাশের সময় এল তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভাগুণে বাংলা সাহিত্যের একচ্ছত্র অধিপতিরূপে বিরাজমান। ফলে তাঁর আশংকা রীতিমত সংকোচে পরিণত হল। রবীন্দ্রনাথের লেখনীর মোহিনীশক্তি যে মায়াজাল রচনা করেছিল তা যেমন বর্ণাঢ্য তেমন বৈচিত্র্যময়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকে তিনি বাংলাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর আসন অধিকার ক'রে বসেছেন।

আবার এমন বিষয় নেই যা নিয়ে তিনি লেখেননি। কবি-হিসাবে তো কথাই নেই, এমন কি কথা সাহিত্যেও তাঁর কীর্তি পরি-ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে তাঁর গল্পগুচ্ছের অধিকাংশ কাহিনী লেখা হয়ে গেছে। এমন কি উপন্যাস রচনারও তাঁর লেখনী প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে 'চোখের বালি' প্রকাশিত হয়ে কথাশিল্পী হিসাবে তাঁর খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

মনে হয় তাঁর মনের এই সংকোচ বোধ বাংলাসাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে পরোক্ষভাবে কাজ করে'ছল। তাঁর স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের মত অসামান্য শিল্পীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে তিনি সাহিত্য রচনাকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি যেন মনে মনে এই সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন যে, হয় উৎকৃষ্ট সাহিত্য রচনা করবেন না হয় একেবারে লিখবেন না। আসরে এক অনন্যসাধারণ শিল্পী ইতিমধ্যে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং তাঁর পাশে সসম্মানে স্থান পাবার অধিকার লাভ না ক'রে তিনি আত্মপ্রকাশ করতে চাই-ছিলেন না।

অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় তাঁর নিজের দুর্বলতা কোনখানে সে বিষয়েও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি জানতেন তাঁর কল্পনাশক্তির বিচরণ ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাঁর 'শ্রীকান্তে'র প্রথম পর্বের শুরুতেই যেন পরোক্ষভাবে বেশ কৌতুকপূর্ণ ভাষায় তার বর্ণনা দিয়েছেন। তার প্রাসঙ্গিক অংশ এখানে উদ্ধৃত কথা যেতে পারে। তিনি বলেছেন: "ভগবান আমার মধ্যে কল্পনা বা কবিত্বের বাষ্পটুকু দেন নাই।......আকাশ মেঘের পানে চোখ তুলিয়া রাখিয়া ঘাড়ে ব্যথা করিয়া ফেলিয়াছি, কিন্তু যে মেঘ সেই মেঘ। কাহারো সুমুখে তো নজরে পড়ে নাই।"

অবশ্য শরৎচন্দ্রের কল্পনাশক্তি যে একেবারেই ছিল না তা বলা চলে না। যিনি নিশীথের সৌন্দর্যের এমন চিত্তহারী বর্ণনা দিতে পারেন বা জাহাজে ঝড়ের আক্রমণে কি দুর্দশায় ভুগতে হয় তার এমন উজ্জ্বল বর্ণনা দিতে পারেন, তাঁর কল্পনাশক্তি অনস্বীকার্য। তবু রবীন্দ্রনাথের সহিত তুলনায় এ বিষয়ে যে তিনি নিতান্তই দুর্বল ছিলেন তা স্বীকার না ক'রে পারা যায় না।

মনে হয় তিনি অনুভব করেছিলেন এই দুর্বলতা সত্ত্বেও কথাসাহিত্যে নিজের আধিপত্য স্থাপন করতে হলে তাঁর নূতন অস্ত্র সংগ্রহ করতে হবে। ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও সাধনার গুণে তা তাঁর অধিগত হয়েছিল। কিন্তু তা সময়সাপেক্ষ এবং

সেই কারণেই সাহিত্যের আসরে তার প্রবেশ বিলম্বিত হয়েছিল। সম্ভবত বিলম্বিত হয়েছিল বলেই তিনি নিজেকে 'অপরাজেয় কথাশিল্পী'-রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

আমরা তাই দেখি তাঁর সাহিত্য চর্চা ভাগলপুরে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে শুরু হলেও তাঁর সে রচনা হস্তলিখিত পত্রিকায় স্থান পেয়ে একরকম পাঠক সমাজের সামনে স্থাপন করবার সাহস লেখকের হল না। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র যখন কুন্তলীন পুরস্কারের প্রতিযোগিতায় না গিয়ে পারলেন না, তখনও নিজের নামটি গোপন রাখলেন। ফলে তাঁর রচিত 'মন্দির' গল্প প্রতিযোগিতায় প্রথম হোল তাঁর মাতুল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বেনামীতে।

তারপর প্রতিষ্ঠিত 'সাহিত্য' পত্রিকাতে নিজের রচনা প্রকাশ করবার সাহস সঞ্চয় করতে তাঁর আরও পাঁচ বছর লেগেছিল। রবীন্দ্রনাথ-সম্পাদিত 'ভারতী' পত্রিকার ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বৈশাখ সংখ্যা হতে তাঁর 'বড়দিদি' উপন্যাসখানি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ হতে শুরু করল। কিন্তু সেখানেও জড়তা কাটেনি; তিন সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত এই উপন্যাসখানির লেখক কে তা প্রথম দুই সংখ্যায় অপ্রকাশ রয়ে গেল। এতে এক বিভ্রাট ঘটল। প্রথম প্রকাশেই তাঁর রচনা সাহিত্য-রসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে গেল; অথচ লেখকের নাম অপ্রকাশিত থাকায় কাহিনীর লেখক কে এই প্রশ্ন নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হল। এমন কি অনেকে মনে করলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই এই কাহিনীর লেখক। অনুমান মিথ্যা ক'রে দিয়ে যখন শেষ কিস্তির সঙ্গে লেখকের নাম প্রকাশ হল তখন সাহিত্যানুরাগীদের বিস্ময়ের অবধি ছিল না। সাহিত্যের আকাশে এক নূতন তারকার উদয়ের মতই তা বিস্ময়কর। শরৎচন্দ্রও সম্ভবত তাঁর লেখার সমাদর দেখে বিস্মিত হয়ে থাকবেন। তাঁর লেখাকে রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে পাঠক ভুল করেছে দেখেও সম্ভবত তিনি কিছু তৃপ্তি পেয়েছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি পত্রিকায় আবার লেখা দিতে সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠতে পারলেন না। আসরে সলজ্জ পদক্ষেপে একবার প্রবেশ করেই সরে গেলেন। ফলে তাঁর রচনার রস আস্বাদন হতে সাহিত্যরসিক দীর্ঘকাল বঞ্চিত হয়ে রয়ে গেল। যে তারকার উদয় ঘটেছিল তা ক্ষণিকের দ্যুতি ফুটিয়ে উল্কার মত মিলিয়ে গেল।

দ্বিতীয়বার তাঁকে আসরে প্রবেশ করতে সম্মত করাতে তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীদের রীতিমত সাধাসাধি করতে হয়েছিল। ফলে, দ্বিতীয় আত্মপ্রকাশ পাঁচ বছর বিলম্বিত হয়েছিল। 'যমুনা' পত্রিকার সম্পাদক ফনীন্দ্রনাথ পাল শেষে

তাঁকে তাঁর পত্রিকায় রচনা পাঠাতে সম্মত করতে পেরেছিলেন। এই ব্যবস্থা অনুসারে 'যমুনা'য় ধারাবাহিকভাবে 'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'পরিণীতা', 'চরিত্রহীন' প্রভৃতি উপন্যাস প্রকাশিত হয়েছিল। তাদের সমাদর দেখে শরৎ-চন্দ্রের সংকোচ কেটে গিয়েছিল। এরপর হতে আর তাঁর লেখনী বসে থাকে নি। সাহিত্য-গগনে যে নূতন তারকার উদয় হয়েছিল তা দ্যুতিমান্ নক্ষত্রের মত স্থায়ীভাবে শোভা পেয়েছিল।

এরপর তাঁর আর্থিক সংগতি আসতেও দেরি হল না। প্রথম ফসলেই তাঁর ঔপন্যাসিক হিসাবে খ্যাতি এমন ছড়িয়ে পড়ল যে, 'ভারতবর্ষ'-এর মালিক গুরু-দাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর জন্য স্থায়ী মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে দিয়ে তাঁকে তাঁর পত্রিকার নিয়মিত লেখক ক'রে নিলেন। ফলে শরৎচন্দ্রের ব্রহ্মদেশের চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে স্থায়ীভাবে কলিকাতার উপকণ্ঠে বাস করে সাহিত্য-সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল। তারপরের ইতিহাস সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের কালে বাস করেও তিনি স্বনির্বাচিত ক্ষেত্রে একচ্ছত্র অধিপতি হিসাবে আমৃত্যু বিরাজ করেছিলেন।

এখন আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে ফিরে আসতে পারি। শরৎচন্দ্রের এই বিস্ময়কর সাফল্যের কারণ কি? তাঁর রচনায় এমন কি গুণ আছে যা তাকে এমন চিত্তাকর্ষক করেছে?

টলস্টয়ের মতো আদর্শ রস সাহিত্যের অন্যতম মৌলিক গুণ হল পাঠকের মনকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা। সে গুণ শরৎচন্দ্রের রচনায় বিলক্ষণ বর্তমান আছে। তাঁর লেখনীর মানুষের মনকে স্পর্শ করবার ক্ষমতা অসাধারণ। তাঁর সর্বজনীন আবেদন সত্যই অনেক সাহিত্য-সমালোচকের বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর কাহিনীতে হৃদয়ের অনুভূতির যে বর্ণনা পাই তা সহজেই গ্রহণ করা যায় এবং ফলে রসাস্বাদ করা সহজ হয়। তাঁর ভাষা অলংকারবহুল নয়, তাঁর রচনা কল্পনা দ্বারা অতি-রঞ্জিত নয়। সুতরাং তাঁর লেখার আকর্ষণ শক্তি কোন কৃত্রিম উপায়ে অর্জিত হয় নি। কিন্তু ঠিক বলতে কি, পাঠকের হৃদয়কে স্পর্শ করবার শক্তি রচনার গুণ প্রকাশ করে না, তা রচনার সার্থকতার একটি লক্ষণ মাত্র। আমাদের আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে। কোন্ কোন্ গুণ তাকে এই শক্তি দিয়েছে তাকে খুঁজে বার করতে হবে। এই প্রতিপাদ্য টলষ্টয়ও স্বীকার করেন; কারণ দেখা যায় তিনি বলেছেন যে, রসিককে আকর্ষণ করবার শিল্পের এই ক্ষমতা কয়েকটি গুণের ওপর নির্ভর করে।

শরৎচন্দ্রের রচনার প্রথম গুণ যা নজরে পড়ে তা হল তার বাস্তবতা। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্ত' প্রথম পর্বের প্রারম্ভে তাঁর উক্তির প্রতি আমরা পুনরায় দৃষ্টি-ক্ষেপ করতে পারি। কাহিনীটির ওপর আত্মজীবনের প্রভাব লক্ষিত হয় বলে এটিকে তাঁর নিজের কথা বলে ধরে নেওয়া অসঙ্গত হবে না। সেখানে তিনি নিজের কল্পনাশক্তির দৈন্যের কথা উল্লেখ করে তাকেই যুক্তি হিসাবে ব্যবহার করে বলেছেন যে, সেই হেতু যা সত্য তাই লিখবেন, অর্থাৎ রচনার ভিত্তি হবে নিজস্ব অভিজ্ঞতা। এই নীতি তাঁর রচনায় মোটামুটি একনিষ্ঠভাবে প্রয়োগ করেছিলেন মনে হয়। তাই দেখি কল্পনার লীলা তাতে বড় একটা নজরে আসে না, সাধারণ মানুষকে ঘিরে মাটির পৃথিবীর বুকে দৈনন্দিন জীবন হতে তাঁর সাহিত্যের কাঁচামাল প্রধানত সংগৃহীত হয়েছে।

ঘটনাচক্রে সেটাই হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর রচনার বিশেষ গুণ। বাস্তব দৃষ্টি-ভঙ্গি যে রচনাকে সহজেই চিত্তাকর্ষক করেছিল তা নিঃসন্দেহ। উদাহরণস্বরূপ শ্রীকান্তের বিষয়ই আলোচনা করা যেতে পারে। এই গ্রন্থে দুটি বর্ণনা পাঠকের মনকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করে। প্রথমটি হল ইন্দ্রনাথের নিশীথ অভিযান এবং দ্বিতীয়টি হল শ্রীকান্তের গভীর রাত্রে শ্মশান-ভ্রমণের বর্ণনা। দুটিই নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল বলেই মনে হয় পাঠকের মনকে এমনভাবে মুগ্ধ করে।

শরৎচন্দ্র যে রচনাশৈলীর অঙ্গ হিসাবে বাস্তবতাকে রসসাহিত্য রচনার একটি মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন তার সমর্থন তাঁর রচনা হতে অন্যত্র ও পরোক্ষভাবে পাওয়া যায়। এই প্রশ্নটি 'চরিত্রহীন'-এ প্রসঙ্গত উঠেছে। দিবা-করকে একটি গল্প রচনায় নিযুক্ত দেখে কিরণময়ী সে গল্পটি পড়ে তরুণ সাহিত্য-শিল্পীকে কিছু উপদেশ দেওয়া প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে না লিখে যদি কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হয় তাহলে রচনা সার্থক হয় না। মনে হয় কিরণময়ীর মুখে শরৎচন্দ্র নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন

দ্বিতীয়ত আমরা দেখি, শরৎচন্দ্র তাঁর কাহিনীগুলিতে চরিত্রসৃষ্টির ওপর বিশেষ নজর দিয়েছেন। ডিকেন্স-এর চরিত্রগুলির মত তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি মনে বিশেষ দাগ টানে। যেমন নারী-চরিত্রে অভয়া, অন্নদাদি, কিরণময়ী প্রভৃতির কথা মনে আসে, তেমন পুরুষ-চরিত্রগুলি মধ্যে ইন্দ্রনাথ, সব্যসাচী, রমেশ, দেবদাস প্রভৃতি তাদের নিজ নিজ বিশিষ্টরূপ নিয়ে চোখের সামনে ভাসে।

তারা প্রত্যেকেই অনন্য-সাধারণ, নিজস্ব বিশিষ্টতা নিয়ে এককভাবে বিরাজ করে।

তার প্রধান কারণ হল শরৎচন্দ্র কাহিনী হতে চরিত্র পরিস্ফুটনের প্রতি বেশি নজর দিয়েছিলেন। কাহিনী তাঁর মতে গৌণ জিনিস, কথাসাহিত্যে চরিত্রই প্রধান। চরিত্রকে কোন মডেলের সাহায্যে মনে প্রথমে কল্পনা করে নিয়ে তারপর তাকে যে গুণগুলি বিশিষ্টতা দান করে তা পাঠকের কাছে স্থাপনের জন্য কাহিনী সৃষ্টি করা উচিৎ—মনে হয় এই ছিল তাঁর অভিমত। এই প্রসঙ্গে তাঁর নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যটি দেখা যেতে পারে।

"প্লট সম্বন্ধে আমাকে কোনদিন চিন্তা করিতে হয় নাই। কতকগুলি চরিত্র ঠিক করিয়া নিই; তাহাদিগকে ফোটাবার জন্য যাহা দরকার আপনি আসিয়া পড়ে।"

এই কথাগুলি তিনি বলেছিলেন ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রদত্ত এক ভাষণে। এক মহিলাকে উপদেশ দেওয়া প্রসঙ্গে তিনি এই কথাগুলি আরও বিস্তারিত ভাবে উল্লেখ করেছেন। তাও এখানে প্রনিধানযোগ্য। তিনি চিঠিতে মহিলাকে লিখেছেন:

"তারপর গল্প লিখিতে গিয়া প্রথমে যাহাকে প্লট বলে তাহার প্রতিই অতিরিক্ত মন দিবার দরকার নাই। যে যে লোক তোমার বইএ থাকিবে প্রথমে তাহাদের সমস্ত চরিত্রটা নিজের মধ্যে স্পষ্ট করিয়া লইতে হয়।......প্রথমেই প্লট লইয়া মাথা ঘামাইবার আবশ্যক হয় না।" (লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত ৭ ভাদ্র, ১৩২৫ তারিখের চিঠি)।

চরিত্রকে সজীব করবার উদ্দেশ্যে তিনি একটি বিশেষ রীতি অবলম্বন করতেন। তাঁর রচনায় দেখা যায় চরিত্রগুলির মধ্যে পরস্পর কথোপকথন কাহিনীর অনেকখানি জায়গা জুড়ে বসে আছে। শুধু তাই নয়, এই কথোপকথনগুলি এমন যত্নের সহিত রচিত যে তাঁর উপন্যাসের নাট্যরূপ দিতে গেলে দেখা যাবে যে সেই কথোপকথনের বিশেষ পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় না; উপন্যাসের ভাষা তুলে দিলেই বেশ চলে যায়। তার কারণ তিনি কাহিনীকে লেখকের ভাষায় প্রধানতঃ না বলে চরিত্রগুলির কথোপকথনের সাহায্যে ফুটিয়ে তোলা বেশি প্রয়োজন বোধ করতেন। তাঁর ধারণায় তাতে চরিত্রগুলি শুধু সজীব হয় না, কাহিনী ও পাঠকের কাছে বেশি চিত্তাকর্ষক হয়। এই প্রসঙ্গে তাঁর নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যটি আমাদের প্রতিপাদ্যের সমর্থন হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে:

"গ্রন্থকারের মুখে রচনার বিষয়টা চৌদ্দ আনা না দিয়া পাত্র-পাত্রীর মুখে দিতে হয়। শুধু যেখানে তাহা পারা যায় না সেইখানেই কেবল গ্রন্থকারের মুখের কথায় পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না।" (লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত ৫।৮।১৯১৯ তারিখের চিঠি)।

শরৎচন্দ্রের রচনার তৃতীয় গুণ তাঁর আন্তরিকতা। এখানেও টলস্টয়ের অভিমত প্রাসঙ্গিক হয়ে পড়ে। সার্থকশিল্পের তথা রসসাহিত্যের যে মৌলিক গুণগুলি তাঁর মতে একান্ত প্রয়োজনীয় তাদের মধ্যে আন্তরিকতা অন্যতম। শরৎচন্দ্রের রচনায় এই গুণ বিলক্ষণ বর্ত্তমান। এই প্রসঙ্গে তিনি কাহিনীর মধ্যে গ্রন্থকার হিসাবে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত যে মন্তব্যগুলি করেছেন সেগুলি লক্ষ্য করা যেতে পারে। তারা প্রমাণ করে, কাহিনীর মধ্যে যে ভাবটি তিনি ফোটাতে চেয়েছেন তা নিজের অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন। এর দৃষ্টান্ত তাঁর রচনায় অনেক মিলবে। এই প্রসঙ্গে তার দু' একটি উদাহরণ উল্লেখ করা যেতে পারে।

তাঁর রচিত ছোটগল্প 'মহেশ-এর কথা ধরা যেতে পারে। এই হতভাগ্য বলদটির জন্য তার মালিক গফুর অত্যাচারিত হয়ে শেষে প্রতিকূল পরিবেশের চাপে তাকে অন্তর দিয়ে ভালবেসেও তার হত্যাকারী হয়ে গেল। গফুরের মহেশের জন্য যে দরদ ছিল তার কণামাত্রও যদি তার হিন্দু জমিদারের থাকত, তাহলে বলদের মৃত্যুর কারণ হবার অনুশোচনার দাহে তাকে ভিটে ত্যাগ করতে হত না। এখানে তিনি যা বলেছেন তা অন্তর দিয়ে অনুভব করেই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে 'শ্রীকান্ত': ২য় পর্বে অভয়া ও রোহিণীর প্রেমের কাহিনীর কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। তাদের প্রণয় সমাজ ব্যবস্থায় অনুমোদিত না হলেও তার জন্য তিনি যে প্রশস্তি রচনা করেছেন তার মধ্যে কোথাও কৃত্রিমতা নেই। তার মূল্য তিনি অন্তর দিয়ে অনুভব করেছিলেন বলেই সে প্রশস্তি এমন দরদ দিয়ে তিনি লিখতে পেরেছিলেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরৎচন্দ্রের রচনায় পাঠকের মনকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা আছে। একবার তাঁর রচিত কোনও কাহিনী পড়তে শুরু করলে শেষ না করা পর্যন্ত পাঠক মনকে ছিনিয়ে নিতে পারে না। মনে হয় এই গুণ অর্জিত হয়েছিল দীর্ঘ সাধনার ফলে এবং পাঠকের মনকে অনর্থক পীড়া না দিয়ে তাকে আকৃষ্ট করবার জন্য বিশেষ ইচ্ছা হতে। এই ইচ্ছা প্রণোদিত হয়ে শরৎচন্দ্র তাঁর উপন্যাস রচনার কতকগুলি নীতিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতেন। সেই নীতিগুলির

প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তিনি যে বিশেষ সচেতন ছিলেন তাও তাঁর বিভিন্ন মন্তব্য হতে প্রমাণিত হয়। এই নীতিগুলির এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রথম নীতি হল, লেখকের বক্তব্য এমনভাবে বলতে হবে যাতে পাঠকের মন অনর্থক ভারাক্রান্ত বা পীড়িত না হয়। অর্থাৎ যা বলতে হবে তা বাঁকা পথে বিলম্বিত ক'রে বলতে নেই, বলতে হয় সোজাসুজি। কারণ পাঠকের মন অনর্থক পরিশ্রম করতে প্রস্তুত নয়, যেটা মূল কথা সেটা সোজাসুজি শুনতে পারলেই খুশি। তাঁর মতে পাঠকের মন সামনে রেখে তার যাতে সহজে গ্রহণ-যোগ্য হয় এমন ভাবে রচনা করাই প্রকৃত সাহিত্যিক পটুতা। এই প্রসঙ্গে তাঁর একটি পত্রে লিখিত উপদেশের ভঙ্গিতে দেওয়া মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তিনি সেখানে বলেছেন :

"কেবল লেখাই ত নয়, লেখার বিস্তেটাও যে শিখতে হয়। তখন উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে যে কথা শতমুখে বলতে চাই তাই শান্ত সংযত হয়ে একটুখানি গম্ভীর ইঙ্গিতেই সম্পূর্ণ হয়ে আসে। পাঠকেরা হল এমনি কুঁড়ে যে তারা শতযোজন সিঁড়ি ভেঙ্গে স্বর্গে যেতেও চায় না যদি একটুখানি মাত্রও ডিগবাজি খেয়ে নরকে গিয়েও পৌঁছতে পারে। এই হদিসটুকু মনে রাখা রচনার সব থেকে বড় কৌশল।" (পত্র, ব্রজেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'শরৎ পরিচয়', ২য় সংস্করণ, পৃঃ ৬২)

উপরের উক্তি হতেই দেখা যাবে পাঠকের মনকে পীড়া না দিয়ে তা সহজগ্রাহ্য ক'রে কাহিনী স্থাপন করাকেই তিনি মূল কৌশল হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই মূলনীতি হতেই আরও দুটি নীতি এসে পড়ে যাদের তিনি স্বীকৃতি দিয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম কথা হল অকারণ বাহুল্য বর্জন করতে হবে। কাজেই গ্রন্থকারের নিজের বিদ্যা জাহির করবার লোভটি দৃঢ়চিত্তে দমন করতে হবে। কেবল কাহিনীর পূর্ণতা সম্পাদনের জন্য যেটুকু বলা একান্ত প্রয়োজন সেইটুকুই বলতে হবে। অর্থাৎ এমন বস্তুর অবতারণা করা চাই যা প্রসঙ্গত সহজেই আসে। এই সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

"ছত্রে ছত্রে গ্রন্থকারের এই মনোভাবটি ধরা পড়ে—ত্যাখো তোমরা আমি কি বিদুষী। কি পড়াটাই পড়েছি, কি জানাটাই জেনেছি। এই আতিশয্য যেন কোন মতেই না লেখার মধ্যে ধরা পড়ে। এদের এমনি সহজে আসা চাই যেন না এলেই নয়। এই না এলেই নয় জিনিসটাই লেখার বড় কৌশল।" (দিলীপকুমার রায়কে লিখিত ৪ঠা ফাল্গুন ১৩৩১ তারিখের চিঠি)

একই কারণে তিনি রচনায় অলংকার ব্যবহারের বাহুল্য বর্জন করতে উপদেশ দিয়েছেন। কথাটি তিনি তাঁর মন্তব্যে বোঝাতে চেয়েছেন একটি উপমা প্রয়োগ ক'রে। নারীর ভূষণ অলংকার, কিন্তু তার ভূষণ হিসাবে সার্থকতা তার স্বাভাবিক লাবণ্যকে পরিস্ফুট করবার জন্য, তাকে ঢাকবার জন্য নয়। অবশ্য গয়নার দোকানে প্রচুর অলংকার একত্র স্থাপনা বাধা নেই; কারণ সেখানে গয়নাকেই অলংকার হিসাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়, শিল্পের উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয় না। এখন তাঁর নিজস্ব মন্তব্যটি স্থাপন করা যেতে পারে:

"মানুষকে অলংকার দিয়ে সাজানোর রুচি এবং স্যাকরার দোকানে অলংকার দিয়ে শোকেস্ সাজানোর রুচি ত এক নয়। একথা সর্বদাই মনে রাখা চাই। অলংকৃত বাক্যের বাহুল্য যে কত পীড়াদায়ক সে কথা শুধু পাঠকেই জানে।" (ঐ চিঠি)

এই প্রসঙ্গে নজর করা যেতে পারে যে, নিজের রচনায় তিনি প্রধানতঃ অলংকার বর্জন ক'রে যেতেন। শব্দালংকার হিসাবে যমক বা অনুপ্রাসের প্রয়োগ তার রচনায় বড় একটা দেখা যায় না। অর্থালংকারে উপমার প্রয়োগ আছে তবে তার যথেচ্ছ ব্যবহার তিনি করেন নি। এমন সংযতভাবে প্রয়োগ করেছেন বলে তা অনেক জায়গায় বিশেষভাবে সার্থক হয়ে উঠেছে। মোট কথা, তিনি ভাষার আড়ম্বর বা ভাবের চমকপ্রদ ব্যবহার দুটোকেই বর্জনীয় বিষয় বলে বিবেচনা করতেন এবং রচনাকে এমন রূপ দিতে চাইতেন যা সহজেই পাঠকের রসানুভূতি ফুটিয়ে সহানুভূতি আকর্ষণ করে। এই প্রসঙ্গে তাঁর নীচে উদ্ধৃত মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য:

"গল্পেই হোক আর যাতেই হোক যদি দেখতে পাও তার আসল কথাগুলি লেখকের আপন সহানুভূতির রসে সত্য এবং বিশুদ্ধ হয়ে রচনায় আসেনি, তখন মনে কোর তার ভাব ও ভাষার আড়ম্বর যত চমকপ্রদ হয়েই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুক সে অন্তঃসারশূন্য, সে টিকবে না।" (কৃষ্ণেন্দু-নারায়ণ ভৌমিককে লেখা ২৪ ভাদ্র ১৩৪০ তারিখের চিঠি)।

শরৎচন্দ্রের রচনার আর একটি বড় গুণ হল ঘটনার সংঘাত বা বৈচিত্র্য হতে চারিত্রিক গুণের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ। তাঁর সন্ধানী দৃষ্টি অতি সাধারণ মানুষের প্রতিদিনকার আচরণ হতে কোথায় কোন চারিত্রিক গুণ ধরা পড়েছে তা নজর করবার ক্ষমতা রাখত। এমন কি যারা আপাত-দৃষ্টিতে হেয় বা সমাজের নিন্দিত তাদের আচরণের মধ্যেও তা আবিষ্কার করবার ক্ষমতা তিনি

রাখতেন। মানুষের চরিত্র দোষে-গুণে মিশ্রিত, কাজেই আদর্শ চরিত্রের মধ্যে যেমন সদ্‌গুণ পাওয়া যায়, তথাকথিত ঘৃণিত চরিত্রের মধ্যেও তাকে পাওয়া যায়। বরং দোষের সঙ্গে মিশ্রিতভাবে তার যে অবস্থিতি তার সাহিত্যিক মূল্য বেশি। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে বিশেষ বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হেতু তাঁর কাহিনীগুলির রসবত্তা বর্ধিত হয়েছে মনে হয়। তাই তাঁর কাহিনীগুলিতে আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর বিরোধী গুণের সমাবেশে গঠিত চরিত্রের অনেক উদাহরণ পাই। "পোড়াকাঠের" মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার সন্ধান তাঁর সন্ধানী-দৃষ্টিও পেতে জানত। ফলে তাঁর রচনায় সাধারণ মানুষ হয়ে দাঁড়ায় অসাধারণ গুণের অধিকারী। যার অনেক দোষ তার মধ্যে আকস্মিক ভাবে মহৎ গুণের পরিচয় পেয়ে আমরা মুগ্ধ হই।

নৈতিকগুণের নিজস্ব সাহিত্যিক মূল্য একটা নিশ্চয় আছে। নৈতিকগুণ কল্যাণধর্মী, গোষ্ঠীর সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করে। অবশ্য সুন্দরের সঙ্গে মঙ্গলের সোজাসুজি কোন যোগ নেই সে কথা অনস্বীকার্য। তবু তারা এক হিসাবে সমধর্মী। শিল্পে সামগ্রিকভাবে সমাজের কল্যাণ সাধন করে। এই কারণে কাহিনীতে দয়া, মায়া, আত্মভাষা, অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাহসিকতার আচরণের বর্ণনা আমাদের হৃদয়কে মুগ্ধ করে। সেই কারণেই রামায়ণের মুখ্য চরিত্রগুলি আবহমান কাল আমাদের মুগ্ধ ক'রে এসেছে। এবং যুগে যুগে সাহিত্যের বিষয়রূপে নির্বাচিত হয়েছে। চারিত্রিক গুণের আবেদন সর্বজনীন এবং সর্বকালের। সুন্দর ফুলের মত, মধুর গন্ধের মত তারাও সাহিত্যশিল্পীর আকর্ষণের বস্তু। কোন চরিত্রকে যে সকলপ্রকার গুণেই ভূষিত করে গড়তে হবে তারও প্রয়োজন নেই। দোষেগুণে মিশিয়ে সাধারণ মানুষ গড়ে ওঠে। বরং নানা দোষের প্রচ্ছদপটে একটি মহৎ গুণের আকস্মিক আবির্ভাব কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের দীপ্তির মতই মনকে মুগ্ধ করে।

এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের কাহিনী হতে দু একটি উদাহরণ সংগ্রহ করে স্থাপন করা যেতে পারে। 'শ্রীকান্ত:' ১ম পর্বের ইন্দ্রনাথের চরিত্রই ধরা যাক। এই বালকটির চরিত্র পাঠকের মনকে সহজেই জয় করে, তার কারণ বোধ হয় তার চরিত্রে ভাল-মন্দের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটেছে। সাধারণ মাপকাঠিতে যাকে অনায়াসে বলা হয় খারাপ ছেলে তার পর্যায়ে তাকে ফেলা যায়; কারণ সে পড়াশোনা করে না, বিড়ি খায় ইত্যাদি। অথচ দেখা যায় নিশীথ অভিযানে শ্রীকান্ত তার চরিত্রের এমন কতকগুলি কল্যাণধর্মী গুণ আবিষ্কার করে,

যার ফলে এই তথাকথিত খারাপ ছেলেটির প্রতি শ্রদ্ধায় তার মন ভরিয়ে দেয়।

নৌকায় যেতে কোথায় গ্রামের শ্মশান এল। সেখানে এমন কলেরার মড়ক লেগেছে যে মানুষ শবকে দাহ ক'রে উঠতে পারে না, এমনি ফেলে দিয়ে যায়। সেখানে হঠাৎ ইন্দ্রনাথের নজরে পড়ে গেল একটি শিশুর শব। তার অন্তর বেদনায় ভরে গেল। পাছে শেয়ালে তার নরম দেহ ছিঁড়ে খায় তাই তাকে সমাধি করবার কাজে লেগে গেল। শ্রীকান্তের সংস্কারমুক্ত মন এই কাজের সমর্থন করতে পারল না। সে আপত্তি জানালো এই বলে যে কোন্ জাতের মড়া জানা নেই, না ছোঁয়া ভাল। ইন্দ্রনাথ অবলীলাক্রমে সে আপত্তি খণ্ডন করল এই বলে যে মড়ার কি জাত থাকে? তার কথা প্রমাণ করতে দৃষ্টান্ত দিয়ে সে বলল যে, যে-নৌকায় তারা বসে আছে তা নির্মিত হয়েছে কত বিভিন্ন গাছের কাঠ দিয়ে। এখন গাছগুলি নেই, তাদের মৃতদেহের অংশ এই নৌকায় পরিণত হয়েছে। এখন তো আমরা বিচার করি না তার কোন কাঠটা শাল গাছের, কোনটা আমগাছের, কোনটা কাঁঠাল গাছের। তাই ইন্দ্রনাথ বখাটে ছেলে হয়েও চারিত্রিক গুণে সুন্দর। তার নির্ভীকতা, তার সংস্কারমুক্ত আচরণ, তার মৃত শিশুর শবের জন্য উৎকণ্ঠা আমাদের মুগ্ধ করে।

এই সূত্রে 'আধারে আলো' কাহিনীর উল্লেখ করাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভদ্র ঘরের সুদর্শন যুবকের গঙ্গাস্নানে গিয়ে একটি অপরিচিতা নারীর সহিত আলাপ হয়। সে পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ট বন্ধুতায় পরিণত হয়। যুবকটির অনুরাগে কোন কৃত্রিমতা ছিল না। কিন্তু তরুণীটি পেশায় বাইজি। তাই তার ছোট মন নিয়ে তাকে ভুল বুঝেছিল। একদিন নিজের প্রকৃত পরিচয় দেবার উদ্দেশ্যে নায়ককে এক মজলিসে ডেকে পাঠাল। কিন্তু পরিণতি হল নিদারুণ। নায়কের মোহভঙ্গ এনে দিল নায়িকার প্রতি সুগভীর ঘৃণা। নায়িকার অন্তরে যে শুদ্ধ নারী মনটি ছিল আঘাত খেয়ে তা জেগে উঠল এবং বাইজি মরে গেল। যখন প্রশ্ন হল কোন্ রোগে মরেছে, উত্তর এল, যে রোগে আলো এবং আধার মরে।

এই সব কারণেই মনে হয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে শরৎচন্দ্র এমন অনন্য-সাধারণ সাফল্য লাভ করেছিলেন। যখন তিনি শিল্পের আহ্বানে সাড়া দিলেন, বিষয়টিকে তিনি হাল্কাভাবে গ্রহণ করেননি। দীর্ঘকাল ধরে রীতিমত সাধনা ক'রে তিনি সাহিত্যচর্চা শুরু করেছিলেন। তাই তাঁর রচনা এমন সর্বজনীন এবং

সর্বকালীন স্বীকৃতি পেয়েছিল। তাই দেখি রবীন্দ্রনাথের যুগে লেখনী ধারণ করেও তিনিই একমাত্র সাহিত্যিক যিনি নিজের গুণে একটি উচ্চ সম্মানের স্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রপ্রতিভার সর্বগ্রাসী দীপ্তি তাঁর রচনাকে ম্লান করতে পারে নি।

শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক চিন্তা

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করা যত কঠিন তার চেয়ে কঠিনতর জিনিষ হচ্ছে তাকে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখা। তার সুফলটুকু আনন্দে উপভোগ করা। কেবল চীৎকার করে বা শ্লোগান দিয়ে ফাঁকিবাজির মধ্যে দিয়ে যে স্বরাজ লাভ করা যায় তাকে টিকিয়ে রাখা সত্যিই এক দুরূহ ব্যাপার। স্বরাজকে মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে চাই দেশবাসীর অন্তরে ও মনে পূর্ণমাত্রায় কর্তব্যজ্ঞান এবং দায়িত্ববোধ। দেশবাসীকে স্বরাজ পাবার জন্যে যেমন তৈরী হতে হবে তেমনি তাকে রক্ষা করার জন্যে উপযুক্ত সৈনিকরূপে নিজেদের গড়ে তুলতে হবে। নচেৎ মুখের শ্লোগান দিয়ে কিছু হবে না। স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার বললে অরণ্যে রোদন হবে। তা না বলে স্বরাজের জন্যে আমাদের উপযুক্ত হতে হবে এই শ্লোগানই অধিকতর শ্রেয় এবং কার্যকর। অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একসময় হাওড়া বা হাবড়া জেলা কংগ্রেসকমিটির সভাপতি ছিলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে যুক্ত ছিলেন বলেই তৎকালে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের রীতিনীতি ও কর্মপ্রণালী সম্বন্ধে বিশেষ ওয়াকিবহাল ছিলেন। ঐ সংগঠনের মধ্যে কোথায় ভুল ত্রুটি হচ্ছে সে সম্বন্ধেও কটাক্ষ করতে পেছ-পা হন নি। এমন কি উক্ত সংগঠনের হাবড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতির পদ হতে ইস্তফা দিয়ে যে বক্তৃতা দেন তার মধ্যেও ধ্বনিত হয়েছে অন্যায়ের প্রতি তাঁর বলিষ্ঠ সুর। তিনি সভার মাঝে দাঁড়িয়ে তাঁর লেখা বিবৃতি পাঠ করে শুনিয়েছেন শ্রোতাদের, 'ভারতবর্ষের জাতীয় মহাসভার এই ক্ষুদ্র শাখার যে কর্ম্মভার আমার প্রতি ন্যস্ত ছিল তা থেকে বিদায় নেবার কালে আপনাদের কাছেই মুক্তকণ্ঠে তার হেতু প্রকাশ করাই এই সভার উদ্দেশ্য। একটা কথা উঠেছিল, চুপি চুপি সরে গেলেই ত হতো, এই লজ্জাকর ঘটনা এমন ঘটা করে জানাবার কি প্রয়োজন ছিল? আমার মনে হয় প্রয়োজন ছিল, মনে হয় নিঃশব্দে চুপি চুপি সরে গেলে চক্ষুলজ্জাটা বাঁচত, কিন্তু তাতে সত্যকার লজ্জা চতুর্গুণ হয়ে উঠত। এর পরে এ জেলায় কংগ্রেস কমিটী থাকবে কি থাকবে না, আমি জানিনে। থাকতে পারে, না

থাকাও বিচিত্র নয়; কিন্তু সে যাই হোক্ ভেতরে যার ক্ষত বাইরে তাকে অক্ষত দেখানোর পাপ আমি করতে চাইনে। এ একটা policy হতে পারে, কিন্তু ভাল policy বলে কোন মতেই ভাবতে পারি নে।'……(আমার কথা-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই হাবড়া জিলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগ কালে পঠিত অভিভাষণ।)

এই 'ক্ষত' বলতে কথাশিল্পী বলতে চেয়েছেন কর্তব্যের প্রতি অবহেলা এবং ত্রুটি। কোন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মধ্যে সবচাইতে বড় গুণ হচ্ছে কর্তব্যের প্রতি দৃঢ়তা, সততা এবং অবিচলিতা। তা নাহলে সে প্রতিষ্ঠানের শক্তি কমজোরি হয়ে পড়ে। আর শক্তিক্ষয় হলে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে শক্ত হয়ে ওঠে সঠিকভাবে দাঁড়িয়ে থাকা। এ কথা আগেকার কালে যেমন সত্য এখনকার দিনেও তেমনি।

বিশেষ করে কোন রাজনৈতিক সংগঠনের পক্ষে এ জিনিস অতীব সত্য। সেখানে যদি কেবল স্লোগান ও বাক্‌পটুতার মাতামাতি থাকে তো তার দ্বারা জনতাকে কেন্দ্রীভূত করা যায় বটে কিন্তু তাদের মঙ্গলের জন্যে সত্যিকার কোন গঠনমূলক কাজ করা যায় না। হ্যাঁ করা যায় তখন যখন আসল শক্তি ও প্রেরণা অন্তরে জেগে ওঠে এবং সেই স্লোগান বা সভার বক্তৃতা মুখ্য না হয়ে গৌণ হয় আর রাজনৈতিক কর্মী বা নেতার চরিত্র সদ্, ন্যায়নিষ্ঠ ও প্রকৃত কর্মবীরের ভূমিকা নেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লিখিত অভিভাষণে কথাশিল্পী যা বলতে চেয়েছেন তা নিম্নরূপ:

'পাঞ্জাব অত্যাচার উপলক্ষে বছর দেড়েক পূর্ব্বে একদিন যখন দেশব্যাপী আন্দোলন উত্তাল হ'য়ে উঠেছিল, তখন আমরা আকাশজোড়া চীৎকারে চেয়েছিলাম স্বরাজ। মহাত্মাজীর জয় জয়কার গলা ফাটিয়ে দিগ্বিদিকে প্রচার করে বলেছিলাম, স্বরাজ চাই-ই চাই। স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার। এবং স্বরাজ ব্যতিরেকে কোন অন্যায়েরই কোন দিন প্রতিবিধান হ'তে পারবে না। কথাটা যে মূলতঃ সত্য, এ বোধকরি কেহই অস্বীকার করতে পারে না। বাস্তবিকই স্বাধীনতায় মানবের জন্মগত অধিকার, ভারতবর্ষের শাসনভার ভারত বর্ষীয়দের হাতেই থাকা চাই এবং এ দায়িত্ব থেকে যে কেউ তাদের বঞ্চিত করে' রাখে সেই অন্যায়কারী। এ সবই সত্য। কিন্তু এমনি আরও ত একটা কথা আছে, যা'কে স্বীকার না করে' পথ নেই—সে হচ্ছে আমাদের কর্ত্তব্য।

Right এবং duty এই দুটো অনুপূরক শব্দ ত সমস্ত আইনের গোড়ার কথা। সকল দেশের সকল সামাজিক বিধানে একটা ছাড়া যে আর একটা এক মুহূর্ত্তও

দাঁড়াতে পারে না, এতো অবিসম্বাদি সত্য। কেবল আমাদের দেশেই কি এই বিশ্বনিয়মের ব্যতিক্রম ঘটবে? স্বরাজ বা স্বাধীনতা যদি আমাদের জন্মস্বত্ব হয়, ঠিক ততখানি কর্ত্তব্যের দায় নিয়েও ত আমরা মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয়েছি। একটাকে এড়িয়ে আর একটা পাব এত বড় অন্যায়, অসঙ্গত দাবী,—এত বড় পাগলামী আর ত কিছু হতেই পারে না। ঘটনাক্রমে কেবলমাত্র ভারতবর্ষীয় হয়ে জন্মেছি বলেই ভারতের স্বাধীনতার অধিকার উচ্চকণ্ঠে দাবী করাও কোন মতেই সত্য হ'তে পারে না। এবং এ প্রার্থনা ইংরাজ কেন স্বয়ং বিধাতাপুরুষও বোধ করি মঞ্জুর করতে পারেন না। এই সত্য, এই সনাতন বিধি, এই চির নিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা হৃদয় দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করার দিন আজ আমাদের এসেছে। একে ফাঁকি দিয়ে স্বাধীনতার অধিকার শুধু আমরা কেন, পৃথিবীতে কেউ কখন পায় নি, পায় না এবং আমার বিশ্বাস, কোনদিন কখনো কেউ পেতেও পারে না। কর্ত্তব্যহীন অধিকারও অনধিকারের সমান। কাজ কোরব না, মূল্য দেবো না অথচ পাবো, প্রার্থনার এই অদ্ভুত ধারাই যদি আমরা গ্রহণ করে থাকি, তাহ'লে নিশ্চয়ই বলছি আমি, কেবল মাত্র সমস্বরে ও প্রবলকণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ও মহাত্মার জয়ধ্বনিতে গলা চিরে আমাদের রক্তই বার হবে, পরাধীনতার জগদ্দল শিলা তাতে সূচ্যগ্র ভূমিও নড়ে বসবে না।'...(আমার কথা—ঐ)

দেশে বা সমাজে কোন নীতিই ফলপ্রসূ হয়ে ওঠে না যদি না তা প্রকৃত মানুষের হাতে পড়ে। প্রকৃত মানুষ হওয়া দুঃসাধ্য না হলেও সুসাধ্য নয়। তার জন্যে অনেকদিন ধরে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়। শিক্ষার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব বোধ যাতে জাগে তার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। আর এই ভাব জাগলেই জাতীয়তাবাদ আপনি ধীরে ধীরে শিকড় গেড়ে বসবে। দেশ তখন সত্যিকার ভাবমূর্তি ফিরে পাবে। তখন তার কাছে ন্যায়-নীতি বোধ প্রকৃত রূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে। তার আলোয় সে দেখতে পাবে, বিচার করতে পারবে তার দেশে বা সমাজের মঙ্গলের জন্যে কোন্ নীতিটি সর্বাপেক্ষা সত্য ও শ্রেয়। এই প্রসঙ্গে সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চিন্তার অধিকারী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র উক্ত অভিভাষণের এক জায়গায় বলেছেন, 'প্রিয়তম পরমাত্মীয় কাউকে যমে নিলে শোকার্ত্ত মন যেমন উপায়হীন বেদনায় কাঁদতে থাকে, অথচ, যা' অবশ্যম্ভাবী তার বিরুদ্ধে হাত নেই, এই বলে' মনকে বুঝিয়ে আবার খাওয়া-পরা, আমোদ-আহ্লাদ, হাসি-তামাসা, কাজ-কর্ম্ম যথারীতি পূর্ব্বের মতই চলতে থাকে, মহাত্মার সম্বন্ধেও দেশের লোকের

মনোভাব প্রায় তেমনি। তাদের রাগ গিয়ে পড়ল জজ সাহেবের ওপর। কেউ বললে তার প্রশংসা বাক্য কেবল ভণ্ডামি, কেউ বললে তার দু'বছর জেল দেওয়া উচিত ছিল, কেউ বললে বড় জোর তিন বছর, কেউ বললে না চার-বছর, কিন্তু ছ'বছর জেল যখন হ'ল তখন আর উপায় কি? গবর্ণমেন্ট যদি দয়া করে' কিছু আগে ছাড়েন তবেই হয়। কিন্তু এই ভেবে তিনি জেলে যাননি। তাঁর একান্ত মনের আশা ছিল হোক না জেল ছ'বছর, হোক্ না জেল দশ বছর,—তাঁকে মুক্ত করা ত দেশের লোকেরই হাতে। যে দিন তারা চাইবে, তার একটা দিন বেশী কেউ তাকে জেলে ধরে রাখতে পারবে না, তা সে গবর্ণমেণ্ট যতই কেন না শক্তিশালী হউন। কিন্তু সে আশা তাঁর একলারই ছিল, দেশের লোকের সে ভরসা করবার সাহস হলো না। তাদের অর্থোপার্জ্জন থেকে শুরু করে আহার নিদ্রা অব্যাহত চলতে লাগল, তাদের ক্ষুদ্র স্বার্থে কোথাও বিঘ্ন হলো না, শুধু তিনি ও তাঁর পঁচিশ হাজার সহকর্ম্মী দেশের কাজে দেশের জেলেই পচতে লাগলেন। প্রতিবিধান করবে কি, এতবড় হীনতার লজ্জা বোধ করবার শক্তি পর্যন্ত যেন এদের চলে গেছে। এরা বুদ্ধিমান, বুদ্ধির বিড়ম্বনায় ছুতো তুলেছে Non-violence কি সম্ভব? Non-co-operation কি চলে? গান্ধীজীর movement কি practical? তাইত আমরা…। কিন্তু কে এদের বুঝিয়ে দেবে কোন movement-ই কিছু নয়, যে move করে সেই মানুষই সব। যে মানুষ, তার কাছে Co-operation, Non-co-operation, Violence, Non-Violence সবই সমান, সবই সমান ফলপ্রসূ।'…(আমার কথা—ঐ)

এই মানুষ হওয়ার মধ্যে সেকালে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র যেমন অন্তরে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তেমনি করেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্গ জননীকে উদ্দেশ্য করে:

'সাতকোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী করে মানুষ করো নি।'

স্বামী বিবেকানন্দ জাতিকে উদাত্ত আহবান জানিয়ে বলেছেন—'এসো—মানুষ হও……'

সত্যি আগে আমাদের মানুষ হতে হবে। মানুষের মত মানুষ। নচেৎ হাত-পা-বিশিষ্ট মানুষ নামধারী দ্বিপদ জীব হলে চলবে না। তাতে দেশের অধোগতি বৈ উন্নতি হবে না। যেমন চলেছে বর্তমান কালে। এখন দেশে প্রকৃত মানুষ আছে কজন? বিশেষ করে রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃস্থানীয় ব্যাক্তিদের

মধ্যে? তাইতো দেশের এমন দুরবস্থা। চারদিকে হতাশার নিদারুণ অন্ধকার।

সে যুগেও সত্যিকার মানবিক বোধসম্পন্ন রাজনৈতিক কর্মী ও নেতার অভাব ছিল বটে তবে বর্তমান কালের মত এমন প্রকট নয়। বর্তমানে এইসকল কর্মীদের মধ্যে হাহাকার ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে যেন। আগেকার দিনে তা ছিল না। আগে যে ক'জন রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের মনেপ্রাণে নেমে এসেছিল রাজনৈতিক অপেক্ষা আধ্যাত্মিক এবং মানবিক ভাব-বিহ্বলতার দুকূলপ্লাবী বন্যা। তাই দেখি আমরা, তাঁদের রাজনৈতিক বক্তৃতা ও কর্মধারা জনসাধারণের কাছে হৃদয়স্পর্শী হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণ তাঁদের আহ্বানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাড়া দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। কেননা সকল প্রকার বিদ্যার শ্রেষ্ঠ বিদ্যা হচ্ছে অধ্যাত্ম বিদ্যা। সেই বিদ্যার সঙ্গে অন্য যে কোন বিদ্যার মিলন ঘটলে তা সর্বাঙ্গসুন্দর ও জনকল্যাণকর হতে বাধ্য। এমনি যোগাযোগ ঘটেছিল বলেই সেকালে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তৃতা জনসাধারণের মনে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছিল। আর নেতাদের চরিত্র ও কর্ম সেই সূত্রে ন্যায়নিষ্ঠ, নীতিনির্ভর ও কর্মমুখর হয়ে উঠেছিল যার জন্যে তাঁরা জনগণের হৃদয়াসনে দেবতার রূপে প্রতিষ্ঠিত হতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁদের দ্বারা দেশের যথার্থ মঙ্গলও হয়েছিল।

সত্যি কথা, দেশের নেতারা চরিত্রবান ও আদর্শবান না হলে দেশের জনসাধারণও চরিত্রবান ও আদর্শবান হতে পারেন না। এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পী 'আমার কথা'য় বলেছেন, 'আর জনসাধারণ? সে তো সর্ব্বথা ভদ্রলোকেরই অনুগমন করে।'

নারী ছাড়া যে সংসার এবং সমাজ অচল এ কথা বেশ ভালভাবেই জানতেন কথাশিল্পী ও নারীদরদী শরৎচন্দ্র। তিনি একাধিক রচনায় নারীকে যেরূপ মর্য্যাদা দিয়েছেন তা সেকালে অবহেলিতা ও নির্য্যাতিতা নারীসমাজের পক্ষে সত্যিই অতুলনীয়। নারী যখন সংসারের অন্যতম কর্ণধার তখন তাকে কেবল গৃহবধূ, গৃহিণী বা ভোগ্য বস্তুরূপে গৃহবন্দিনী করে রাখার মূলে কোন যুক্তি নেই। আর আমরা তেমনটি করেছি বলেই আমাদের সমাজযান অগ্রগামী না হয়ে পশ্চাদ্‌গামী হয়েছে। দেশের ক্ষতিও হয়েছে ততোধিক। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন নারী-স্বাধীনতায় বিশ্বাসী। আমাদের সমাজ তার প্রকৃত শক্তি নারীজাতিকে অনন্ত দুর্দশা ও অপমানের মধ্যে ফেলে রেখেছিল এবং পরে নিজের স্বার্থে তাদের

অযোগ্য ও অনুপযুক্ত অবস্থায় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছে। তার সেই প্রচেষ্টা আপাতদৃষ্টিতে সদ্ ও সাধু হলেও তার প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন কথাশিল্পী ও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক মানসের অধিকারী শরৎচন্দ্র। তিনি ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইন্‌ষ্টিটিউটে পঠিত অভি-ভাষণে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রসঙ্গে বলেছেন, 'আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন, কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছেন না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতি মুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হ'বার নয়। যে চেষ্টায় যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্য্যন্ত যাদের দিইনি তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে, শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য করেই এতবড় বস্তু লাভ করা যাবে না। মেয়ে মানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হ'তে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই। অত্যন্ত স্বার্থের খাতিরে যে দেশ, যেদিন থেকে কেবল তার সতীত্বটাকেই বড় করে দেখেছে, তার মনুষ্যত্বের কোন খেয়াল করে নি। তার দেনা আগে তাকে শেষ করতেই হবে।'

সমাজ ও দেশের কল্যাণে নারী স্বাধীনতা যে একান্ত অপরিহার্য এ কথা মন-প্রাণ দিয়ে অনুভব করেছিলেন দরদী ও দূরদর্শী কথাশিল্পী। তাই তো তিনি 'স্বরাজ সাধনায় নারী' অভিভাষণে লিখেছেন, 'আজ আমাদের অনেকেরই ঘুম ভেঙেছে। আমার বিশ্বাস এখন দেশে এমন একজনও ভারতবাসী নেই যে এই প্রাচীন পবিত্র মাতৃভূমির নষ্ট-গৌরব, বিলুপ্ত-সম্মান পুনরুজ্জীবিত না দেখতে চায়। কিন্তু কেবল চাইলেই ত মেলে না, পাবার উপায় করতে হয়। এই উপায়ের পরেই যত বাধা, যত বিঘ্ন, যত মতভেদ। এবং এখানেই একটা বস্তুকে আমি তোমাদের চিরজীবনের পরম সত্য বলে অবলম্বন করতে অনুরোধ করি। এ কেবল পরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা। যার যা দাবী তাকে তা পেতে দাও। তা সে যেখানে এবং যারই হোক্। এ আমার বই পড়া বড় কথা নয়, এ আমার ধার্ম্মিক ব্যক্তির মুখে শোনা তত্ত্বকথা নয়,—এ আমার এই জীবনের বার বার ঠেকে শেখা সত্য। আমি কেবল এইটুকু দিয়েই অত্যন্ত জটিল সমস্যার আজও মীমাংসা করি। আমি বলি মেয়েমানুষ যদি মানুষ হয়, এবং স্বাধীনতায়, ধর্ম্মে, জ্ঞানে যদি মানুষের দাবী আছে স্বীকার করি, ত এ দাবী আমাকে মঞ্জুর করতেই হ'বে, তা সে ফল তার যাই হোক।'...

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের দাবী' রাজনৈতিক উপন্যাস কিনা তা নিয়ে সমাজের পণ্ডিত ও বিদগ্ধ জনেরা তর্ক করুন। আমার মতে উক্ত উপন্যাসে কথা-শিল্পীর মনের যে সূক্ষ্মতম রাজনৈতিক চেতনার অভিব্যক্তি ঘটেছে তা অপূর্ব। বিশেষ করে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। উক্ত উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন কথাশিল্পী, "সুমুখে কে একজন দাঁড়াইয়াছিল, বসিয়া পড়িতেই অপূর্ব্বর কানের কাছে মুখ আনিয়া ভারতী চুপি চুপি কহিল, উনিই আমাদের প্রেসিডেণ্ট, সুমিত্রা।

'বলিবার প্রয়োজন ছিল না। অপূর্ব্ব দেখিয়াই চিনিল। কারণ, নারীকে দিয়াই যদি কোন সমিতি পরিচালনা করিতে হয়, এই ত সেই বটে! বয়স বোধ করি বিশের কাছে পৌছিয়াছে, কিন্তু যেন রাজ-রাণী! বর্ণ কাঁচা সোনার মত, দাক্ষিণাত্যের ধরণে এলো করিয়া মাথার চুল বাঁধা...কালো বোর্ডের গায়ে একটা হাত রাখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছিলেন, অপূর্ব্বর চোখে আর পলক পড়িল না। সে আঁক কষিয়াই মানুষ হইয়াছে, কাব্যের সহিত পরিচয় তাহার অত্যন্ত বিরল, কিন্তু, কাব্য যাঁহারা লেখেন, কেন যে তাঁহারা এত কিছু থাকিতে তরুণ লতিকার সঙ্গেই নারীদেহের তুলনা করেন তাহার জানিবার কিছু আর রহিল না। সন্মুখে একটি বিশ বাইশ বছরের সাধারণ গোছের মহিলা আনতমুখে বসিয়াছিলেন, ভাবে বোধ হয়, তাঁহাকেই কেন্দ্র করিয়া এই তর্কের ঝড় উঠিয়াছে। আবার তাঁহারই অনতিদূরে বসিয়া পৌঢ় গোছের একজন ভদ্রলোক। তাঁহার পরণের কাটছাট পরিশুদ্ধ বিলাতি পোষাক দেখিয়া অবস্থাপন্ন বলিয়াই মনে হয়। খুব সম্ভব তিনিই প্রতিপক্ষ, কি বলিতেছিলেন অপূর্ব্ব ভাল শুনিতেও পায় নাই, মনোযোগও করে নাই, তাহার সমস্ত চিত্ত সুমিত্রার প্রতিই একেবারে একাগ্র হইয়া গিয়াছিল। তাঁহার কণ্ঠস্বরে কি জানি কোন্ পরম বিস্ময় ঝরিয়া পড়িবে এই ছিল তাহার আশা। অনতিকাল পূর্ব্বের ক্ষোভের হেতু তাহার মনেও ছিল না। সাহেবি পোষাক-পরা ভদ্রলোকটির প্রত্যুত্তরে একবার তিনি কথা কহিলেন। এইত! নারীর কণ্ঠস্বর ত একেই বলে! ইহার কণাটুকুও না বাদ যায়, অপূর্ব্ব এমনি করিয়াই কান পাতিয়া রহিল। সুমিত্রা কহিলেন, মনোহরবাবু, আপনি ছেলে মানুষ উকিল নন্, আপনার তর্ক অসংলগ্ন হয়ে পড়লে ত মীমাংসা করতে পারব না।

'মনোহরবাবু উত্তর দিলেন, অসংলগ্ন তর্ক করা আমার পেশাও নয়।

'সুমিত্রা হাসিমুখেই কহিলেন, তাই ত আশা করি। বেশ, বক্তব্য আপনার

ছোট করে আনলে এইরূপ দাঁড়ায়। আপনি নবতারার স্বামীর বন্ধু। তিনি জোর করে তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান, কিন্তু স্ত্রী স্বামীর ঘর করতে চান না, দেশের কাজ করতে চান, এতে অন্যায় কিছু ত দেখিনে।

'মনোহর বলিলেন, কিন্তু স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য আছে ত? দেশের কাজ কোরব বল্‌লেই ত তার উত্তর হয় না।

'সুমিত্রা কহিলেন, দেখুন মনোহরবাবু, নবতারা কোন্ কাজ করবেন, না করবেন, সে বিচার তাঁর উপর, কিন্তু তাঁর স্বামীরও স্ত্রীর প্রতি যে কর্ত্তব্য ছিল, তিনি তা কোনদিন করেন নি, এ কথা আপনারা সবাই জানেন! কর্ত্তব্য ত কেবল একদিকে নয়।

'মনোহর রাগিয়া কহিলেন, কিন্তু তাই বলে স্ত্রীকেও যে অসতী হয়ে যেতে হবে, সেও ত কোন যুক্তি হতে পারে না! এই বয়সে এই দলের মধ্যে থেকেও উনি সতীত্ব বজায় রেখে যে দেশের সেবা করতে পারবেন,—এত কোন মতেই জোর করে বলা চলে না!

'সুমিত্রার মুখ হঠাৎ আরক্ত হইয়াই তখনি সহজ হইয়া গেল, বলিলেন, জোর করে কিছু বলাও উচিত নয়। কিন্তু আমরা দেখচি নবতারার হৃদয় আছে, প্রাণ আছে, সাহস আছে এবং সবচেয়ে বড় যা সেই ধর্ম্মজ্ঞান আছে। দেশের সেবা করতে এইটুকুই আমরা যথেষ্ট জ্ঞান করি। তবে, আপনি যাকে সতীত্ব বলছেন, সে, বজায় রাখবার ওঁর সুবিধে হবে কি না সে উনিই জানেন!'... (পথের দাবী—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ১৩১-১৩৩—তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন, ১৩৫৪)

এই প্রসঙ্গে উক্ত গ্রন্থের আর এক জায়গায় লিখেছেন কথাশিল্পী,—'ভারতী বলিল, কারণ সম্প্রতি আপনি আমাদের অভিভাবক। আজ সুমিত্রাদিদি অসুস্থ, নবতারা গেছেন অতুলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে ওপারে, আপনাকে যেতে হবে আমার সঙ্গে। আপনার প্রতি প্রেসিডেন্টের এই আদেশ। ওই ধুতি এনে রেখেছি, পরে নিয়ে চলুন।

'কোথায় যেতে হবে?

'মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ বড় বড় কারখানার ক্রোরপতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্যে লাইনবন্দী যে সব নরককুণ্ড তৈরি করে দিয়েছে সেইখানে। আজ রবিবারে ছুটির দিনেই সেখানে কাজ।

'অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু সেখানে কেন?

'ভারতী উত্তর দিল, নইলে, পথের দাবীর সত্যিকারের কাজ কি এই ঘরে হতে পারে? একটু হাসিয়া কহিল, আপনি এ সভার মাতববর সভ্য, সরজমিনে না গেলে ত কাজের ধারা বুঝতে পারবেন না, অপূর্ব্ববাবু।

'চলুন বলিয়া অপূর্ব্ব অফিসের পোষাক ছাড়িয়া মিনিট পাঁচেকের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া লইল।

'ভারতী আলমারি খুলিয়া কি একটা বস্তু লুকাইয়া তাহার জামার পকেটে রাখিতে অপূর্ব্ব দেখিতে পাইয়া কহিল, ওটা আপনি কি নিলেন?

গাদা পিস্তল।

পিস্তল? পিস্তল কেন?

আত্মরক্ষার জন্যে।'...(ঐ—পৃঃ ১৮৪-১৮৫)

এই প্রসঙ্গে আরও এক জায়গায় সুমিত্রার মুখ দিয়ে বলিয়েছেন কথাশিল্পী, '...এ ফাঁকির কথা। যারা কোনদিন দেশের কাজ করে নি এ তাদের কথা, দেশের চেয়ে নিজের স্বার্থ যাদের ঢের বড় এ তাদের কথা। এর মধ্যে এতটুকু সত্য নেই। আপনি নিজে যখন কাজে লাগবেন, তখনই এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করবেন যে যাকে আপনি নারীর বাইরে এসে ভিড় করা বলচেন সে যদি কখনো ঘটে, তখনি দেশের কাজ হবে, নইলে কেবলমাত্র পুরুষের ভিড়ে শুকনো বালির মত সমস্ত ঝরে ঝরে পড়বে, কোনদিন জমাট বাঁধবে না।'...(ঐ-পৃঃ ১৩৭-১৩৮)

এতে করে বেশ স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কথাশিল্পী, জনদরদী ও সূক্ষ্ম রাজনৈতিক মানসের অধিকারী শরৎচন্দ্র বিশ্বাস করতেন যে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী-পুরুষ সমাজের উভয় শ্রেণীরই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যোগ দেওয়া এবং এগিয়ে চলা উচিত।

পরাধীন স্বদেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্যে কথাশিল্পী যে কতদূর ভাবতেন এবং ভারতীয় জনগণের প্রতি বিজাতীয় ইংরেজদের অপমান, অত্যাচার যে কি নজরে দেখতেন তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর উক্ত গ্রন্থে লিখিত এক রচনাংশে। তিনি লিখেছেন:

'অপূর্ব্ব কহিল, আমরা পরাধীন জাতি, ইংরেজ নই, ফরাসী নই, আমেরিকান নই,—কোথায় পাবো আমরা অপ্রতিহত গতি? স্টেশনের একটা বেঞ্চে বসবার আমাদের অধিকার নেই, অপমানিত হয়ে নালিশ করবার পথ নেই,—বলিতে বলিতে সেদিনের সমস্ত লাঞ্ছনা,—ফিরিঙ্গী ছোঁড়াদের বুটের আঘাত হইতে ষ্টেশন মাস্টারের বাহির করিয়া দেওয়া অবধি সকল অপমান কষ্ট অনুভব করিয়া তাহার

দুই চক্ষু প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, কহিল, আমরা বসলে বেঞ্চ অপবিত্র হয়, আমরা গেলে ঘরের হাওয়া কলুষিত হয়,—আমরা যেন মানুষ নই! আমাদের যেন মানুষের প্রাণ, মানুষের রক্তমাংস গায়ে নেই! এই যদি আপনাদের সাধনা হয়, আছি আমি আপনাদের দলে।'...(ঐ—পৃঃ ১২৭)

সুতরাং এটা বেশ বোঝা যাচ্ছে যে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সাহিত্যরসে রসিক হয়ে কেবল নির্বিচারে সাহিত্য রচনায় কালাতিপাত করেন নি। সেই সঙ্গে তিনি ভেবেছিলেন পরাধীন স্বদেশের স্বদেশবাসীর দুঃখদুর্দশার কথা এবং তা দূর করার জন্যে যোগ্য স্বাধীনতাকামী যোদ্ধাদের দিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম করা দরকার। তাঁর মনের কোণে একাধারে ছিল সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমন্বয় আর তারই পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে 'পথের দাবী' নামক সর্বজনপ্রিয় উপন্যাসে।

এই প্রসঙ্গে কথাশিল্পীর ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দিলীপ কুমার রায়কে লেখা এক পত্রের অংশবিশেষ উল্লেখ করলে নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তিনি লিখেছেন, —'দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিলেন।...যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। শ্রীঅরবিন্দের 'The liberated man has no personai hopes'—এ সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই।...'

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র দূরদর্শী রাজনীতিকের মন দিয়ে বুঝেছিলেন যে দেশের স্বাধীনতা যথার্থ বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হবে। অহিংসা, ধর্মঘট বা অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে এ কাজ সম্ভবপর হবে না। আর তা এলেও ভূয়ো হবে। তার আক্কেল সেলামী দিতে হবে শোষিত ও নিষ্পেষিত হতভাগ্য জনসাধারণকে। তাই তো তিনি 'পথের দাবী' উপন্যাসের এক জায়গায় লিখেছেন, 'ডাক্তার বলিলেন, আজও ত খুঁজে পাইনি বোন। অনেক ঘুরেছি, অনেক পড়েছি, অনেক ভেবেচি। কিন্তু তোমাকে ত আমি আগেও বলেছি, ভারতী, অশান্তি ঘটিয়ে তোলার মানেই অকল্যাণ ঘটিয়ে তোলা নয়। শান্তি! শান্তি! শান্তি! শুনে শুনে কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেছে। কিন্তু এ অসত্য এতদিন ধরে কারা প্রচার করেছে জানো? পরের শান্তি হরণ করে যারা পরের রাস্তা জুড়ে অট্টালিকা প্রাসাদ বানিয়ে বসে আছে তারাই এই মিথ্যামন্ত্রের ঋষি। বঞ্চিত, পীড়িত, উপদ্রুত নরনারীর কানে অবিশ্রান্ত এই মন্ত্র জপ করে করে তাদের এমন করে তুলেছে যে, আজ তারাই অশান্তির নামে চমকে উঠে

তাবে এ বুঝি পাপ, এ বুঝি অমঙ্গল! বাঁধা গরু অনাহারে দাঁড়িয়ে মরতে দেখেচ? সে দাঁড়িয়ে মরে তবু সেই জীর্ণ দড়িটা ছিঁড়ে ফেলে মনিবের শান্তি-নষ্ট করে না। তাই ত হয়েছে, তাই ত আজ দীনদরিদ্রের চলার পথ একেবারে রুদ্ধ হয়ে গেছে! তবুও তাদেরই অট্টালিকা প্রাসাদ চূর্ণ করার কাজে তাদেরি সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে যদি আমরাও আজ অশান্তি বলে কাঁদতে থাকি ত পথ পাবো কোথায়? না ভারতী, সে হবে না। ও প্রতিষ্ঠান যত প্রাচীন, যত পবিত্র, যত সনাতনই হোক্—মানুষের চেয়ে বড় নয়,—আজ সে-সব আমাদের ভেঙে ফেলতেই হবে। ধুলো ত উড়বেই, বালি ত ঝরবেই, ইটপাথর খসে মানুষের মাথাতে ত পড়বেই ভারতী, এই ত স্বাভাবিক।'...(ঐ-পৃঃ ৩২৪)

এই প্রসঙ্গে বারান্তরে আরও বিশ্লেষণ করে লিখেছেন কথাশিল্পী, 'ডাক্তার বলিলেন, হ্যাঁ! তুমি জানো না, কিন্তু সুমিত্রা ভাল করেই জানে যে ধনীর আর্থিক ক্ষতি এবং দরিদ্রের অনশন এক বস্তু নয়। তার উপায়হীন কর্মহীন দিনগুলো দিনের পর দিন তাকে উপবাসের মধ্যে ঠেলে নিয়ে যায়। তার স্ত্রী পুত্র পরিবার ক্ষুধায় কাঁদতে থাকে,—তাদের অবিশ্রান্ত ক্রন্দন অবশেষে একদিন তাকে পাগল করে তোলে,—তখন পরের অন্ন কেড়ে খাওয়া ছাড়া জীবন ধারণের আর সে পথ খুঁজে পায় না। ধনী সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করেই স্থির হয়ে থাকে। অর্থ-বল, সৈন্য-বল, অস্ত্র-বল সবই তার হাতে,—সে-ই ত রাজশক্তি। সেদিন সে আর অবহেলা করে না,—তোমার ঐ সনাতন শান্তি ও পবিত্র শৃঙ্খলার জয়জয়কার হোক্ সেদিন নিরস্ত্র নিরন্ন দরিদ্রের রক্তে নদী বহে যায়।

'ভারতী রুদ্ধশ্বাসে কহিল, তার পরে?

'ডাক্তার বলিলেন, তার পরে আবার একদিন সেই সব পীড়িত, পরাভূত, ক্ষুধাতুর শ্রমিকের দল এসে সেই হত্যাকারীর দ্বারেই হাত পেতে দাঁড়ায়। ভিক্ষা পায়।

'ভারতী কহিল, তার পরে?

'ডাক্তার বলিলেন, তারও পরে? তারপরে আবার একদিন সে দলবদ্ধ হয়ে পূর্ব্ব অত্যাচারের আশায় ধর্মঘট করে বসে, তখন আবার সেই পুরাতন কাহিনীর পুনরাভিনয় হয়।

'ভারতীর মন মুহূর্ত্তকালের জন্য একেবারে নিরাশায় ভরিয়া গেল, ধীরে ধীরে কহিল, তবে এমন ধর্মঘটে লাভ কি দাদা?

'ডাক্তারের চোখের দৃষ্টি অন্ধকারেও জলিয়া উঠিল, কহিলেন, লাভ? এই

ত পরম লাভ ভারতী ! এই ত আমার বিপ্লবের রাজপথ ! বস্ত্রহীন, অন্নহীন, জ্ঞানহীন দরিদ্রের পরাজয়টাই সত্য হল, আর তার বুক জুড়ে যে বিষ উপ্‌চে উজ্‌লে ওঠে জগতে সে শক্তি সত্য নয় ? সেই ত আমার মূলধন। কোথাও কোন দেশে নিছক বিপ্লবের জন্যই বিপ্লব বাধানো যায় না, ভারতী, একটা কিছু অবলম্বন তার চাই-ই চাই। সেই ত আমার অবলম্বন। যে মূর্খ এ কথা মানে না, শুধু মজুরির কম-বেশি নিয়ে ধর্মঘট বাধাতে চায়, সে তাদেরও সর্ব্বনাশ করে, দেশেরও করে।'...(ঐ: পৃঃ ৩২৫-৩২৬)

রাজনৈতিক বিপ্লবের সঙ্গে সামাজিক বিপ্লবও চেয়েছিলেন কথাশিল্পী। কারণ এই দু'টি জিনিষ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। একটি আর একটির সম্পূরক। সামাজিক বিপ্লব না এলে যে রাজনৈতিক বিপ্লব আসে না আর এলেও তা সর্বাঙ্গ-সুন্দর হয় না, নড়বড়ে ভিত্তির ওপর কোনরকমে দাঁড়িয়ে থাকে এই সত্যটুকু বিলক্ষণ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন দূরদর্শী, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যদর্শী, সামাজিক মানুষ এবং সংস্কারমুক্ত মনের অধিকারী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র। তাইতো তিনি 'পথের দাবী' উপন্যাসে ডাক্তারের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন, 'তোমাকে ত বলেছি ভারতী, বিপ্লব মানেই শুধু রক্তারক্তি কাণ্ড নয়,—বিপ্লব মানে অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্তন। রাজনৈতিক বিপ্লব নয়,—সে আমার। কবি, তুমি প্রাণ খুলে শুধু সামাজিক বিপ্লবের গান শুরু করে দাও। যা কিছু প্রাচীন, জীর্ণ, পুরাতন,—ধর্ম, সমাজ, সংস্কার—সমস্ত ভেঙ্গে চুরে ধ্বংস হয়ে যাক,—আর কিছু না পারো, শশি, কেবল এই মহাসত্যই মুক্ত কণ্ঠে প্রচার করে দাও—এর চেয়ে ভারতের বড় শত্রু আর নেই'—(ঐ—পৃঃ ৩৬৩-৩৬৪)

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র সাহিত্যকে যেমন মন-প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তেমনি ভালবাসতেন দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে। এক সময় তিনি সাহিত্য হতে মনকে তুলে নিয়ে স্বরাজ সাধনায় সঁপে দিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্যতম জীবনীকার বিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'মানুষ শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থে লিখেছিলেন :

'শরৎচন্দ্র দেশবন্ধুকে এত গভীরভাবে শ্রদ্ধা করতেন যে তাঁর কথামত তিনি রাজনীতিতে যোগ দেন।

'শরৎচন্দ্র সাহিত্য ছেড়ে মহাত্মাজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় অনেকেই এটা পছন্দ করলেন না। কেউ পত্র দিয়ে, কেউ বা নিজে উপস্থিত হয়ে তাঁকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকতে বললেন।

'শরৎচন্দ্র কোন যুক্তিই মানলেন না। তিনি বললেন, আমাদের দেশ পরাধীন। সকলের উচিত মুক্তির আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া। আমি সাহিত্যিক, সাহিত্য নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না। তাহলে উকিল—ব্যারিষ্টারও তো বলতে পারেন আমরা আইন ব্যবসায়ী, মামলা-মোকর্দমা নিয়েই থাকবো, রাজনীতিতে যোগ দেব না। ছেলেরা বলবে, আমরা ছাত্র পড়াশুনা নিয়েই থাকবো, রাজনীতির মধ্যে যাব না। তাহলে রাজনীতিটা করবে কারা শুনি ?

'শরৎচন্দ্র কংগ্রেসে যোগদান করে চরকা কাটা, খদ্দর পরা শুরু করলেন। একবার মহাত্মা গান্ধী কলকাতায় এসে 'সারভেণ্ট' কাগজের অফিস দেখতে গেছলেন। সেখানে গিয়ে তিনি সবাইকে নিয়ে চরকা কাটতে চাইলেন। কতকগুলি চরকা আনা হল। সকলেই মহাত্মাজীর সঙ্গে বসে চরকা কাটতে লাগলেন, সেই দলের মধ্যে শরৎচন্দ্রও ছিলেন।

'মহাত্মাজী শরৎচন্দ্রের সূতা কাটা দেখে খুব খুসী হয়ে বললেন, শরৎবাবু আপনার কাটা সূতা বেশ মিহি হচ্ছে।

'শরৎচন্দ্র বললেন, আপনাকে ভালবাসি বলেই আমি চরকা কাটতে শিখেছি, চরকাকে ভালবেসে আমি সূতাকাটা অভ্যাস করিনি।'…

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের আধ্যাত্মিক মানস

ব্রহ্মচারী অরূপচৈতন্য

অনেকের ধারণা অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলার অন্যতম জনপ্রিয় লেখক। তাঁর এই জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ হচ্ছে তাঁর লেখা সাহিত্য গ্রন্থে সংসারে নিত্য ঘটমান বাস্তব ঘটনাসমূহের সমাবেশ। সেখানে নেই কোন অসম্ভব রকমের কল্পনা এবং অবাস্তব ঘটনা। নেই ঈশ্বর ও ধর্মকে নিয়ে মাতামাতি এবং তাঁদের মাহাত্ম্যকে ফেনায়িতরূপে প্রচার করার অসম্ভব প্রয়াস।

এমন ধারণা কিন্তু সম্পূর্ণ সত্য নয়। শরৎসাহিত্যে একদিকে আছে যেমন সত্য ও বাস্তব ঘটনার সমাবেশ তেমনি অন্য দিকে আছে কাল্পনিক ও ধর্মীয় চিন্তার প্রকাশ। তিনি প্রায় সকল স্তরের রচনা অর্থাৎ প্রবন্ধ, অভিভাষণ, ছোটগল্প এবং উপন্যাসে ঈশ্বর ও ধর্ম প্রসঙ্গ বহুবার উল্লেখ করেছেন। এমন কি চিঠিপত্রেও তিনি ধর্মের কথা বলেছেন। শ্রীঅরবিন্দের শিষ্য দিলীপ কুমার রায়কে লিখিত কথাশিল্পীর পত্রে গুরুর আশীর্বাদের মাহাত্ম্য কীর্তিত হয়েছে একাধিকবার। তিনি শ্রীঅরবিন্দের আশীর্বাদও প্রার্থনা করেছেন। তাঁর সদুপদেশ লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেছেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে দিলীপ কুমার রায়কে এক পত্রে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীঅরবিন্দকে স্মরণ মনন করে লিখেছেন, দেশোদ্ধার করবার জন্যে সুভাষের দল আমাকে বলপূর্বক কুমিল্লায় চালান করে দিয়েছিল।...যাই হোক রূপনারায়ণের তীরে আবার ফিরে এসেছি। শ্রীঅরবিন্দের 'The liberated man has no personal hopes'—এ-সত্য উপলব্ধি করতে আর আমার বাকি নেই।'...

'আমি কুঁড়ে মানুষ, চিঠি লিখতে ভয় পাই।......কিন্তু সে যাই হোক শ্রীঅরবিন্দ যা-কিছু ছোট মেসেজ দেন বা তোমাদের প্রশ্নের উত্তর দেন সে-সব যত্ন করে পড়ি, চিন্তা করি এবং আবার পড়ি। অবশ্য অনেক জিনিষই বুঝতে পারি নে স্বীকার করি, কিন্তু তাই বলে এ মনে কোরো না যে, তাঁর সম্বন্ধে তোমার বিমুখ আত্মীয়-বন্ধুদের কাছে আমি কখনো কোনো কিছু বলেছি। তাঁকে দেশ শুদ্ধ সবাই গভীর শ্রদ্ধা করে, করি নে শুধু কি আমিই? আচ্ছা, "শেষ প্রশ্ন" পড়তে দিলে তিনি কি পড়বেন? তাঁর মতো গভীর পণ্ডিত মানুষের

মতামত জানতে পারলে হয়ত আমার লেখার ধারাটা একটা নতুন পথ খোঁজে।'

১৩৩৩ সালের ৮ই বৈশাখ সামতাবেড় থেকে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর এক ঔপন্যাসিক কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে যে পত্র লেখেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানস। তিনি লিখেছেন,—

'......দেহ নিয়তই মন্দের দিকে পা ফেলিতেছে—মনে আছে হয়ত আপনার ৫১ বৎসরে যাবার দিন কুষ্ঠীতে ধার্য করা আছে, আর বড় তার বিলম্ব নাই,—বছর দেড়েক—জগদীশ্বর করুন তাই যেন হয়। আর যেন তিনি আমার ক্লান্তিকে বাড়াইয়া না দেন।'...

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ ই জুন তারিখে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর একটি পত্র লেখেন শরৎচন্দ্র। তার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানস। তিনি লিখেছেন:

'......আপনার শরীর এখন কেমন আছে কেদারবাবু? আগেকার চেয়ে ভালো ত? প্রর্থনা করি আপনি আরও কিছু দিন বেঁচে থেকে গল্প লিখুন। আমি প্রত্যেক ছত্রটি তার পড়ি।'...

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা কার্তিক তারিখে সামতাবেড় থেকে কেদার বন্দ্যোপাধ্যায়কে আর একটি পত্র লেখেন শরৎচন্দ্র। তার মধ্যেও প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানস। তিনি লিখেছেন:

'......ভাষা আর লেখার ভঙ্গীটি ভগবান যেন আপনাকে ঢেলে দিয়েছিলেন। এবং একটি হিতোপদেশও এই বইখানি থেকে সংগ্রহ করেচি।......ভগবান লেখার শক্তি আপনাকে অপর্যাপ্ত দিয়েছেন, কিন্তু এ কথা ভুললে চলবে না যে ঐশ্বর্যবানেরই মিতব্যয়ী হওয়া প্রয়োজন, কাঙালের সে আবশ্যক হয় না।'...

এমনিধারা ১৩৩৭ সালের ৭ই পৌষ তারিখের আর একটি পত্রে লিখেছেন কথাশিল্পী:

'চিরদিন সময় বইয়ে দিয়েই হোলো হুঁস, তাই এ জীবনের সকল কাম্যই এলো হাতের কাছে, কিন্তু নাগালের নীচে নাবতে আর চাইলে না। বার বার চিঠি লিখতে চাইলাম, বার বার দিন-ক্ষণ উত্তীর্ণ হয়েছে। সেই চিঠি আজ লেখাও হোলো, কিন্তু তার ফলটুকু আর পেলাম না। হাতের বাহিরেই রয়ে গেলো। আমার সান্ত্বনা এ আমার কপালের লেখা, একে এড়াবো কি ক'রে? ভালোবেসে খোঁজ-খবর নেবার মামলায় বিজয়ের দিকটা এ জন্মে আপনাকেই ছেড়ে দিলাম,—জন্মান্তর যদি থাকে, তখন আপিল কোরে একবার দেখবো।'...

উক্ত পত্রে কথাশিল্পী 'কপালের লেখা' এবং 'জন্মান্তরবাদ' প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। এ দুটিই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে যুক্ত।

২৪নং অশ্বিনী দত্ত রোড, কলকাতা থেকে প্রকাশক হরিদাস চট্টোপাধ্যায়কে যে পত্র লেখেন কথাশিল্পী তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানস। উক্ত পত্রে তিনি লিখেছেন:

'...ছোট বৌমা তাঁর যে যেখানে আছে সঙ্গে করিয়া মুঙ্গেরে পিতৃগৃহে ভাইয়ের বিবাহ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছেন। কবে তাঁরা ফিরিবেন শ্রীভগবান জানেন। ভাবি ভায়া বুড়োদের বাঁচিয়ে রাখেন তিনি কোন মহৎ প্রয়োজনে? শ্রীপাদপদ্মে একটু তাড়াতাড়ি স্থান দিলে দেখিতে, শুনিতে সকল দিকেই ত শোভন হয়। ৯ই শ্রাবণ, ১৩৪৪।'

ইং ১৩।৬।২৯ তারিখে সামতাবেড় থেকে দিলীপ কুমার রায়কে শরৎচন্দ্র যে পত্র লেখেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানস। তিনি লিখেছেন—'তোমার বয়সে আমি চার-চার বার সন্ন্যাসী হয়েছি।'...

'বৈকুণ্ঠের উইল' নামক উপন্যাসে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানসের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

'...ঝি সায় দিয়া বলিল, তা দিতে হবে বই কি বাবু।

গোকুল উৎসাহে চোখ-মুখ উদ্দীপ্ত করিয়া কহিল, তবে তাই বল্ না! আর এই মাণ্টী! তুই মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মত থাক্ না কেন? তুই কেন উইল করার মতলব দিতে গেলি? এইটে কি তোর মায়ের মত কাজ হলো? ধর্ম্ম নেই? তিনি দেখচেন না? নির্দ্দোষকে কষ্ট দিলে—তাঁর কাছে তোকে জবাব দিতে হবে না?' ...(বৈকুণ্ঠের উইল—পৃঃ ১২৯)

'দত্তা' উপন্যাসের এক জায়গায় কথাশিল্পী ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানসের অধিকারী শরৎচন্দ্র লিখেছেন: 'মানুষ যেমন অপরাধীই হোক, ভগবান তাকে যত দণ্ডই দিন, তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত।' (দত্তা-শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—পৃঃ ৪৭, তৃতীয় সংস্করণ)

'অনুরাধা' নামক ছোট গল্পেতেও শরৎচন্দ্রের সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানসের স্বরূপটি প্রকাশ পেয়েছে। উক্ত গল্পের এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

'...বিজয়ের কাছে উত্তর না পাইয়া সে বলিতে লাগিল, ভগবান জানেন আপনার বিরুদ্ধে কারো কাছে আমি একটা কথাও বলিনি। বললে আমার অন্যায় হ'তো, আমার মিছে কথা হ'তো। গাঙ্গুলিমশাই যদি কিছু বলে থাকেন

সে তাঁর নিজের কথা, আমার নয়। তবু তাঁর হয়ে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করি।'…
(অনুরাধা—পৃঃ ১৮৩-১৮৪)

'সতী' নামক ছোট গল্পের এক জায়গায় লিখেছেন কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র : '… তাঁহার নিজের স্বামী টিকির গোছা ও শ্রীগীতার মর্ম্মার্থ লইয়া মাতিয়া উঠিবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহাকে অনেক জ্বালাইয়াছেন।'…(সতী-পৃঃ ২২৫)

গল্প, উপন্যাস, চিঠিপত্র ইত্যাদি রচনায় যেমন সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানসের অধিকারী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে তেমনি প্রকাশ পেয়েছে তাঁর লেখা বিভিন্ন প্রবন্ধ, ভাষণ, অভিভাষণ ইত্যাদিতে।

১৯২২ সালের ১৪ই জুলাই তারিখে হাবড়া জেলা-কংগ্রেস কমিটির সভাপতিত্ব পরিত্যাগকালে পঠিত অভিভাষণে কথাশিল্পী ও সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক মানসের অধিকারী শরৎচন্দ্র বলেছেন : 'সত্য গোপন করা আত্মবঞ্চনারই সমান।' (স্বদেশ ও সাহিত্য)—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—আমার কথা—পৃঃ ২—দ্বিতীয় সংস্করণ)

'সত্য' হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার অন্যতম অঙ্গ। সত্য নিরাকার ব্রহ্মের অন্যতম স্বরূপ। সত্য, জ্ঞান ও আনন্দ হচ্ছে নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ। তাই সত্যের পথে যিনি পথিক তাঁর পক্ষে জাগতিক সংসারের সবরকম মিথ্যা, ভয়, প্রতারণা ইত্যাদি কপট বৃত্তি অনায়াসে ত্যাগ করা সম্ভব।

কথাশিল্পী ১৩২৮ সালের পৌষ মাসে শিবপুর ইনষ্টিটিউটে পঠিত অভিভাষণে 'স্বরাজ সাধনায় নারী' প্রসঙ্গে যে কথা বলেন তার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে অন্তর্য্যামী ভগবানের প্রতি তাঁর বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধা। তিনি বলেছেন :

'আজ যাঁরা স্বরাজ পাবার জন্যে মাথা খুঁড়ে মরছেন—আমিও তাঁদের একজন কিন্তু আমার অন্তর্য্যামী কিছুতেই আমাকে ভরসা দিচ্ছেন না। কোথায় কোন্ অলক্ষ্যে থেকে যেন তিনি প্রতিমুহূর্ত্তেই আভাস দিচ্ছেন এ হ'বার নয়। যে চেষ্টায় যে আয়োজনে দেশের মেয়েদের যোগ নেই, সহানুভূতি নেই, এই সত্য উপলব্ধি করবার কোন জ্ঞান, কোন শিক্ষা, কোন সাহস আজ পর্যন্ত যাদের দিইনি তাদের কেবল গৃহের অবরোধে বসিয়ে শুদ্ধমাত্র চরকা কাটতে বাধ্য ক'রেই এত বড় বস্তু লাভ করা যাবে না। মেয়ে মানুষকে আমরা যে কেবল মেয়ে করেই রেখেছি, মানুষ হ'তে দিই নি, স্বরাজের আগে তার প্রায়শ্চিত্ত দেশের হওয়া চাই-ই।'…

এতগুলি উদ্ধৃতির দ্বারা এটি স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র কোন অংশেই নাস্তিক ছিলেন না।

সাহিত্যিক ও অধ্যাপক গোপালচন্দ্র রায় তাঁর 'শরৎচন্দ্র' নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে লিখেছেন :

'শরৎচন্দ্র অনেক সময় বন্ধুমহলে নিজেকে একজন 'ঘোরতর নাস্তিক' বলে পরিচয় দিতেন। এ কথা যেমন তিনি মুখে বলতেন, তেমনি আবার কখনো কখনো চিঠিপত্রেও লিখে জানাতেন। কিন্তু এইভাবে তিনি নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিলেও, আসলে তিনি আদৌ নাস্তিক ছিলেন না। এ ছিল তাঁর আস্তিকতারই একটা অতি-বিনয়। তাই তাঁর নাস্তিক্যের প্রচারটা ছিল একান্ত ভাবে মৌখিক ও বাহ্যিক। এই মৌখিক কথার আড়ালে তাঁর অন্তরে ফল্গুধারার মতই ঈশ্বরভক্তির একটা গোপন স্রোত নিরন্তর প্রবাহিত হ'ত। তিনি ছিলেন সত্যকারের একজন ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্মিক মানুষ।

'শরৎচন্দ্র বন্ধুবান্ধবদের কাছে কথা-প্রসঙ্গে যেমন প্রায়ই নিজেকে নাস্তিক বলতেন, তেমনি একবার তিনি সাহিত্যিক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলেন। কেদারবাবুর যুক্তির কাছে সেদিন তাঁর নাস্তিক্যের আবরণ খসে গিয়ে আস্তিকতাই প্রকাশ পেয়েছিল। এই নিয়ে সেদিন কেদারবাবুর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের যে কথোপকথন হয়েছিল, কেদারবাবু নিজেই সে কথা তাঁর 'শরৎ-কথা' প্রবন্ধে লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন—

'তাঁর ধর্ম-বিশ্বাস সম্বন্ধে তাঁর অনুরক্ত ভক্তদের মধ্যে জিজ্ঞাসার উদয় হওয়া স্বাভাবিক...

'তাঁর সঙ্গে কাশীতেই আমার প্রথম সাক্ষাৎ। কথাপ্রসঙ্গে বললেন— মুক্তির আশায় বুঝি কাশীবাস করছেন ?

'বললুম—সেটা বলা কঠিন, হয়ে গেলে অ-লাভ নেই তো! তবে ঝঞ্ঝাট থেকে কতকটা মুক্তি পাবার জন্যে অনেকেরই আসা। ওই সঙ্গে দেশের লোকেও যে কিঞ্চিৎ মুক্তি না পায়—তাও নয়···

'এই যে ঠিক বলেছেন—বলে হাসলেন। বললেন—আমাকে নাস্তিক বলে অনেকেই জানেন, আপনিও জানেন বোধ হয় ?

'বললুম—অপরাধী করবেন না। আপনার বইয়ের মধ্য দিয়েই আপনার সঙ্গে পরিচয়। তাতে যে ছাপা হয়ে গিয়েছে—আপনি পরম আস্তিক।

—কে বললে, কোথায় ? ভুল কথা—

—যা নিয়ে কথা শুনতে পাই, সেই 'চরিত্রহীনেই' রয়েছে—দিবাকর গৃহদেবতা

নারায়ণের ভোগ না দিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল। তার মন কিন্তু সেই অপরাধের বেদনা এড়াতে পারে নি। ফেরবার পথে গঙ্গাতীরে গিয়ে অপরাধের জন্য সাশ্রুক্ষমা প্রার্থনা না করে বাড়ী ফিরতে পারে নি। এই সামান্য ঘটনাটা নাস্তিক বাদ দিতেন, বিশেষ ক্ষতিও হত না। আপনি পারেন নি…

—ও কিছু নয় কেদারবাবু, লেখকদের অমন অনেক অবাস্তবের সাহায্য নিতে হয়, ঐ একটাই তো ?…

—বহুৎ আছে। জগতে অবাস্তবও বহুৎ আছে। মন প্রিয়টা ধরেই চলে। ওই বই থেকেই বলি ;—আপনার সাধের সৃষ্টি কিরণময়ীকে একটি ইন্‌টেলেক-চুয়াল জায়েণ্ট বানিয়েছেন, আবার সুষমাকে (পশুটিকে) হিঁদুর ঘরের একটি সরল বিশ্বাসী প্রতিমা গড়েছেন। যার সামনে কিরণময়ী স্তব্ধ নিস্প্রভ হয়েই ফিরেছিল, এটা করলেন কেনো ?……

—আমার লেখা এমন করে কেউ দেখে বলে জানতুম না, তাহলে সাবধান হতুম।…

—অনেকেই দেখেন, যাঁর ভাল লাগে তিনিই দেখেন। দেখুন, নাস্তিকেরা অতি সাবধানী, তাঁরা মাথার সাহায্যে লেখেন বলেই মনে হয়। সুরমাতে মাধুর্য্য রয়েছে—ওটা যে প্রাণের জিনিস। দরদে গড়া।

—যান্ যান্ বেলা হয়েছে, নমস্কার! দেখতে যেন পাই। দ্রুত চলে গেলেন।' (ভারতবর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৪৪)

'উদ্ধৃত অংশটি থেকে দেখা যায় যে, শরৎচন্দ্র নিজেকে নাস্তিক বলে পরিচয় দিতে গেলেও, কেদারবাবুও উদাহরণ এবং যুক্তি দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন—তাঁর মুখের কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, সেটা আদৌ তাঁর অন্তরের কথা নয়। শরৎচন্দ্র কেদারবাবুর কাছে এইভাবে ধরা পড়ে গেলে, সেদিন তখন তাঁর 'যান্ যান্' বলে সরে পড়া ছাড়া আর উপায় ছিল না।'…(শরৎচন্দ্র'—১ম খণ্ড —গোপাল চন্দ্র রায়—পৃঃ ৪৪২-৪৪৩)

উক্ত গ্রন্থের আর এক স্থানে লিখেছেন গোপাল রায়,'…তিনি দেশবন্ধুর সহিত দিল্লী যান। দিল্লী হতে ফেরবার পথে বৃন্দাবন না হয়ে ফেরেন নি। তাঁর সঙ্গীদের অন্যতম ছিলেন, আমার জনৈক বন্ধু। তাঁর কাছে শুনেছি—আমাদের শরৎচন্দ্রকে গোবিন্দজীর মন্দিরে সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দিতে দেখে সকলেরই নয়ন সিক্ত হয়েছিল। অতিবড় নাস্তিকও সে দৃশ্য দেখলে আস্তিকত্ব পান।'

'শরৎচন্দ্রের ভক্ত মনের এ একটা বড় পরিচয়। আর শরৎচন্দ্র বৃন্দাবনে গোবিন্দজীর মন্দিরেই শুধু সাশ্রুনেত্রে গড়াগড়ি দেন নি, তিনি তাঁর নিজের বাড়িতেও একখানি ঘরকে বিষ্ণুমন্দির করে তুলেছিলেন। তিনি বাড়ীতে রামকৃষ্ণের একটি মূর্তি স্থাপন করে, অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত নিজে নিয়মিত পূজা করতেন। দেশবন্ধু শরৎচন্দ্রকে রাধাকৃষ্ণের এই মূর্তিটি দিয়েছিলেন।'... (শরৎচন্দ্র—১ম খণ্ড—গোপাল চন্দ্র রায়—পৃঃ ৪৪৬)

শরৎচন্দ্রের মাতুল সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'শরৎচন্দ্রের জীবনের একদিক' গ্রন্থে লিখেছেন: 'অনেক বেলা পর্যন্ত দেখা নাই, ব্যাপার কি? দুইজনে খুঁজিতে বাহির হইয়া পড়িলাম।

'কিছু দূরে একটা প্রকাণ্ড গাছের নীচে অমানুষিক ভিড় জমিয়াছে; একদল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ বাউল এক গৌরাঙ্গিনীকে ঘেরিয়া ঘেরিয়া নৃত্য ও কীর্ত্তন করিতেছে।

'শরৎ তাহাদের পাশে বসিয়া গভীর অভিনিবেশের সহিত কীর্ত্তন শুনিতেছেন এবং সেই আনন্দেই মগ্ন। স্নানাহারের কথা সেই মগ্নতার মধ্যে মনে আসাই সম্ভব নহে।

'আমাদের কথার অঙ্কুশে তাঁহার চৈতন্য হইল।

—'আর রোজই তো নাই খাই। শোন না; দেখ কি ভক্তি এদের...

'ভাল করিয়া দেখিলে বুঝিতে বাকি থাকে না যে, এই কীর্ত্তনীয়াদের সহিত ভাবোচ্ছাসে শ্রোতাটির অনেক অশ্রুই উচ্ছ্বসিত হইয়াছে।

'ফিরিতে ফিরিতে শরৎ বলিলেন

—'আহা। যদি ওই ভক্তি, ওই তন্ময়তা আমি পাই।

—'তাহলে?

—'আমার মান, যশ, টাকা-কড়ি, সমস্ত দিয়ে যদি আমি ওর এক কণাও পাই তো...ধন্য হয়ে যাই!

—'ওদের দলে ভিড়ে গেলেই পার।

—'তা যদি পারতুম।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস পড়িল।'...

এত সব প্রমাণ সত্ত্বেও কি বলা যায় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র নাস্তিক বা ঈশ্বর-অবিশ্বাসী ছিলেন?

শরৎচন্দ্র ও শরৎসাহিত্য

রমেন্দ্র নাথ মল্লিক

শরৎচন্দ্র ও শরৎসাহিত্য খাঁটি বাঙালিয়ানার কথাশিল্পী ও কথাশিল্প। শরৎচন্দ্রের জীবন প্রবাহে আড্ডা প্রিয় বাঙালি চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। আবার শরৎসাহিত্যে বাঙালি ঘরের নিজস্ব সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, আনন্দ-বেদনার ছায়া চোখে পড়ে। তাঁর প্রথম জীবন বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিসর্পিল পথে প্রবাহিত হয়। এই বিচিত্র অভিজ্ঞতাকে কল্পনার জারক রসে রাঙিয়ে শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাসে পরিবেশিত। বোধ হয় তাঁর জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা শ্রীকান্তের প্রথম পর্বের চিত্রগুলোতে তাঁর বাল্য জীবনের প্রতিচ্ছবি ও কিশোর মনের কোমল অনুভূতির ঘাত-প্রতিঘাত সহৃদয় রসমূর্তি পরিগ্রহ করেছে। তাঁর অনেক গল্প-উপন্যাসেও আত্মকাহিনীর আভাস লুকিয়ে আছে বলে অনেক সমালোচকের মত। শরৎচন্দ্রের লেখায় বিশুদ্ধ ঘরোয়া রোমান্স্-রস বা গল্প-রস সৃষ্টির মধ্যেও দেখা যায় সমাজকে প্রচলিত প্রথার দ্বারা নয়, চিরন্তন হৃদয়বৃত্তি ও সার্বভৌমিক ন্যায়নীতির দৃষ্টিতে বিচার করার একটা প্রবণতা। জীবনে অন্ধ সংস্কার-চালিত সমাজের অনেক হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা শরৎচন্দ্র প্রত্যক্ষ অনুভব করেছিলেন বলেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে সমাজের কৃত্রিম অংশটার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাই শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' 'অরক্ষণীয়া' ইত্যাদি গ্রন্থে সমাজের অন্ধ আবিলতায় নিষ্পেষিত মানুষের দুঃখবেদনার সকরুণ ইতিহাস গভীরভাবে পাঠকমনকে আলোড়িত করে। শরৎচন্দ্র তাদের সুখদুঃখ চিত্রিত করেছেন যেন তাদেরই একজন হয়ে—এই সমব্যথীর হয়ে সদবেদনাই শরৎসাহিত্যের বড় কথা।

মতিলাল চট্টোপাধ্যায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্রের সার্থক নাম রেখেছিলেন—শরৎচন্দ্র। জন্ম হয়েছিল হুগলী জেলার দেবানন্দপুরে ১২৮৩ সালের ৩১ শে ভাদ্র শরৎকালে। অথচ তখন বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের কটাক্ষে ও রোম্যান্স রসের বর্ষনে বর্ষা-কাল। বংকিমী উপন্যাসের জমকালো চরিত্রগুলো বাঙালি পাঠকদের কাছ থেকে প্রায় অনেক সময়েই দূরত্ব বজায় রেখে চলেছে। রবীন্দ্রনাথ বলেন কথা-সাহিত্যে কাব্যিক রবিদীপ্তি নিয়ে। এই সময় বাঙালী পাঠককে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য

জীবন গহ্বরের এক স্নিগ্ধতার সন্ধান দিলে। শারদীয় রাত্রির নীল নির্মল আকাশের বুকে চাঁদের আবির্ভাবে প্রকৃতির নগ্ন বাস্তব রূপ চিত্রিত হয়েছে সাহিত্যিক মুন্সীয়ানার কল্পনা-তুলির মায়াস্পর্শে।

শরৎচন্দ্র দরদী মানুষ। তাঁর দরদী মনের পরিচয় রেখেছেন প্রতিটি উপন্যাসের চরিত্রসৃষ্টিতে। হৃদয় দিয়ে তিনি হৃদয়কে অনুভব করতে চেয়েছিলেন। অনুভূতিপ্রবণ, সচেতন হৃদয়বত্তার পরিচয়ে শরৎসাহিত্য শরৎচন্দ্রকে অমর করে রাখবে। দুঃখ দারিদ্র প্রপীড়িত নীচুতলার মানুষদের সঙ্গে শরৎচন্দ্র প্রশস্ত হৃদয় নিয়ে মিশেছিলেন। তাঁর গল্প উপন্যাসের চরিত্রগুলোকে তিনি সেখান থেকে সংগ্রহ করে সাহিত্য পাঠকের কাছে চিরন্তন রস-সামগ্রী রূপে বাংলা সাহিত্যে রেখে গেলেন। বেদনার্ত চাষীর কাহিনী মহেশ বাংলা গণ-সাহিত্যের প্রথম পদক্ষেপ। শরৎচন্দ্র রচিত চরিত্রগুলো সম্বন্ধে পাঠকের সস্নেহ ঔৎসুক্য প্রবল। রমা, অভয়া, রাজলক্ষ্মী, কমলা, অচলা, সাবিত্রী ইত্যাদি শরৎচন্দ্রীয় নারী চরিত্রগুলোর মূল উৎস কোথায়—সেগুলো কি লেখকের স্বকপোল কল্পিত, না প্রকৃতই রক্তমাংসের শরীরে লেখক তাদের প্রত্যক্ষ করেছিলেন? জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি নিয়ে শরৎ সাহিত্যের পাঠককে অনুরূপ প্রশ্ন করতে প্রায়ই শোনা যায়। এ নিয়ে আজকের দিনে গবেষণাও কেউ কেউ করছেন। তাঁদের মতে শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট চরিত্রগুলোর সঙ্গে শরৎ জীবনের যোগ প্রত্যক্ষ। অভিজ্ঞতা নিয়েই শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সৃষ্টি। তাই শরৎসাহিত্যের আবেদন পাঠকের হৃদয়-অতল স্পর্শ করে।

শরৎচন্দ্রের জীবন উপলব্ধির পাকা ফসল—তাঁর সাহিত্য। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন, "সংসারে যারা শুধু দিলে পেলে না কিছুই, যারা বঞ্চিত, যারা দুর্বল, উৎপীড়িত, মানুষ যাদের চোখের জলের কখনো হিসাব নিলে না, নিরুপায় দুঃখময় জীবনে যারা কোনোদিন ভেবেই পেলে না, সমস্ত থেকেও কেন তাদের কিছুতেই অধিকার নেই,—এদের বেদনাই দিলে আমার মুখ খুলে, এরাই পাঠালে আমাকে মানুষের কাছে মানুষের নালিশ জানাতে।" এখানেই শরৎচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের পরম ও চরম কথা বলেছেন।

শরৎ-সাহিত্যের উৎস সন্ধান করতে হ'লে শরৎচন্দ্রের নিজের কথাতেই ফিরে আসতে হবে। ৫৩-তম জন্মোৎসবের ভাষণে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন—"নানা অবস্থা-বিপর্যয়ে একদিন নানা ব্যক্তির সংশ্রবে আসতে হয়েছিল। তাতে ক্ষতি যে কিছু পৌঁছায়নি তা নয়, কিন্তু সেদিন যাদের দেখা পেয়েছিলাম, তারা সকল ক্ষতি আমার পরিপূর্ণ করে দিয়েছে। তারা মনের মধ্যে এই উপলব্ধিটকু রেখে

গেছে, ত্রুটি বিচ্যুতি অপরাধ, অধর্মই মানুষের সবটুকু নয়। মাঝখানে তার যে-বস্তুটি আসল মানুষ—তাকে আত্মা বলা যেতেও পারে—সে তার সকল অভাব সকল অপরাধের চেয়েও বড়। আমার সাহিত্য রচনায় তাকে যেন অপমান না করি।" শরৎচন্দ্রের এই সাহিত্যিক মানসের ও জীবনদর্শনের পরিচয় শরৎ-সাহিত্য পাঠকের কাছে অনেকখানি মূল্যবান বলেই মনে হবে। দরদী হৃদয় নিয়ে কেমন ক'রে মানুষের আত্মা পরমাত্মার পর্যায়ে ফেলে ভালোবাসা যায়, শ্রদ্ধা করা যায়, এখানে এই দু'ছত্রে শুধু কেন, শরৎচন্দ্র সারা জীবনভোর সাহিত্য সাধনায় সে কথা প্রমাণ ক'রে গেছেন। প্রত্যেকটি গল্প উপন্যাসে ও প্রবন্ধে এই প্রাণ-প্রাচুর্যের আভাস সর্বজন সমাদ্রিত। শরৎচন্দ্রের উদারনৈতিক মন চির দিন হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে বিচার ক'রে তবেই জীবনের খাঁটি অংশটিকে গ্রহণ করেছেন। তাঁর কাছে সামাজিক চোখে অন্ধ কুসংস্কার কোন দিন বাধা হয়ে থাকলেও অন্তর দৃষ্টির চোখে তখন সব সংস্কারমুক্ত। অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত মানুষের অন্তর্নিহিত প্রেমকে তিনি মহৎ-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন সমকালীন সমাজকে স্বীকার করেই।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে তবে 'গৃহদাহে' অচলা স্বামীর গৃহত্যাগ করে সুরেশের সঙ্গ নিয়েছে কেন? সেখানেও একটি যুক্তি আছে। অচলা কি পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছে আমাদের ভেবে দেখতে হবে। মৃণালের সঙ্গে মহিমের সম্পর্কের কথা নিয়ে পূর্বাপর ঘটনাগুলোকে গভীরভাবে বিচার করে দেখতে হবে। তাহলে দেখা যাবে শরৎচন্দ্র এখানে অচলার হৃদয়াবেগে অন্তরের স্রোতকে ব্যাহত করতে চাননি কিন্তু অচলাকে তাই বলে একেবারে নীচেও নামিয়ে দেননি। পরিবেশের স্বাভাবিক প্রভাবে তাকে চালিত করেছেন। সতীর মত চিন্তায় রেখেছেন স্বামীকে। এবং গৃহদাহের শেষে আবার স্বামীর কাছে অচলার আত্ম সমর্পণ করিয়েছেন। এমনি ক'রে অনেক ঘটনার মধ্যে দিয়েই শরৎচন্দ্রকে বলা যেতে পারে সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে সামাজিক রক্তমাংসের মানুষের চরিত্র সৃষ্টি করেছেন।

যেমন সব যুগে সব দেশেই সমকালীন জীবনধারার প্রভাব সাহিত্যে দেখা যায় শরৎচন্দ্রের সাহিত্যেও সেই প্রভাব কম বা বেশি যাই বলা যাক না কেন তা স্পষ্টই প্রত্যক্ষ করা যায়। ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব তিনি তাই অনেক উপন্যাসেই সৃষ্টি ক'রেছেন। ত্রুটি তাঁর সমকালীন সমাজ দ্বন্দ্বের প্রভাবেই বলা যেতে পারে। এখানে শরৎ-সাহিত্যের একজন সমালোচকের উক্তি উল্লেখযোগ্য। তিনি

বলেছেন "আমাদের মনে দুই স্তরের অনুভূতি আছে। একটা অনুভূতি আমাদের বুদ্ধি সংস্কার ও সমাজ হইতে পাওয়া যায় আর দ্বিতীয় ও গভীর স্তরের অনুভূতির প্রেরণা আসে অবচেতন আত্মার নিকট হইতে। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছে এই পরস্পর বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্বের চিত্রণে।"

শরৎচন্দ্রের বাংলা সাহিত্যে চিরন্তন দানের কথা প্রমথ চৌধুরী সুন্দর ভাষায় বলেছেন শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পরেই। তিনি লিখলেন "আজকের দিনে আমাদের জিজ্ঞাসা হচ্ছে কি কারণে শরৎ-সাহিত্য এত লোকপ্রিয় হল? এর অবশ্য নানা কারণ আছে—আমিও শুধু দুটি স্পষ্ট কারণের উল্লেখ করতে চাই। প্রথম, তাঁর ভাষা। গল্প গড়গড়িয়ে বলা চাই যাতে ক'রে কথ্যবস্তু পাঠকের মন আকৃষ্ট করে। ছোটো গল্পে বাক্যের কারিগরির স্থান আছে, বড়ো গল্পে নেই। শরৎচন্দ্রের ভাষা সহজ সরল ও সচল আর তার 'ফ্লো' আছে। আর তাঁর লেখার দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে যে তাঁর নভেল কোনো ইংরাজি নভেলের নকল নয়। এই বাঙালি সমাজে যা ঘটতে পারে ও ঘটে তাই তাঁর কথার একমাত্র উপাদান। বর্ত্তমান সমাজ তিনি চোখে দেখেছেন ও আর পাঁচজনকে দেখিয়েছেন। অবশ্য তাঁর রচিত বাঙালি সমাজ ফোটো নয়, চিত্র।"

শরৎচন্দ্র তাঁর জন্মোৎসবের এক ভাষণে নিজের সাহিত্যিক সৃষ্টির বিষয়ে এই কথাই বলেছিলেন "গোটাদুই শব্দ আজকাল প্রায় শোনা যায়, আইডিয়ালিষ্টিক ও রিয়ালিষ্টিক। আমি নাকি এই শেষ সম্প্রদায়ের লোক। এই দুর্নামই আমার সবচেয়ে বেশি। অথচ কি ক'রে যে এই দু'টোকে ভাগ করে দেখা যায় তা আমার অজ্ঞাত।…প্রকৃতির বা স্বভাবের হুবহু নকল করা, ফটোগ্রাফী হতে পারে, সে কি ছবি হবে? এখানেই কথাশিল্পী তাঁর কথাশিল্পের খাঁটি পরিচয় রেখে গেছেন। এই তো শরৎসাহিত্যের ও শরৎমানসের সত্যিকারের সাহিত্য শিল্প বিচারের প্রথম জানার কথা। শরৎ-সাহিত্য তাই আমাদের শুধু বুদ্ধির ও চিন্তার খোরাকই যোগায় নি, চিরস্থায়ী মনের স্মৃতিপটে স্নিগ্ধ ছায়ার কোমল রেখাপাত করে।

শরৎচন্দ্র

জনৈক বাঙালী মুসলিমের দৃষ্টিতে

ডঃ গিরীন্দ্রনাথ দাস

হাওড়া ষ্টেশন। খড়্গাপুর লোকাল ট্রেনে উঠে বসেছি। পাশের লোকটি নিবিষ্ট-মনে শরৎ-রচনাবলী পড়ছেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি,—তিনি আমারই কলেজ-জীবনের সহপাঠী করিম শেখ।

বহুদিন পর তাঁর সঙ্গে দেখা। উৎসাহে আমি একপ্রকার চেঁচিয়ে উঠলাম,—আরে! করিম শেখ সাহেব যে! কোথায় চলেছেন?

করিম সাহেবও সমান উৎসাহ প্রকাশ করে বললেন,—বালিচকে। সেখানেই তো আমার বাড়ী।

আমি বল্লাম—ভালো হল। দেউলটি পর্যন্ত বেশ কথায় কথায় যাওয়া যাবে। আমি শরৎবাবুর ভিটে দেখ্‌তে যাচ্ছি।

ট্রেন ছাড়ল। উভয়ের মধ্যে কুশল লেন-দেন হল। কে কোথায় কি করি সে পরিচয়ও নেওয়া-দেওয়া হল। করিম শেখকে শরৎচন্দ্রের লেখা পড়তে দেখে আমার জিজ্ঞাসু মন যা চাইছিল আমি সেই প্রসঙ্গ টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলাম, ইসলামি দৃষ্টিতে আপনি কিভাবে শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন করেন?

শেখ সাহেব মাথার ফেজ টুপীটা খুলে পুনরায় ঠিক করে বসিয়ে বললেন,—শরৎচন্দ্রের মূল্যায়ন বলতে তো শরৎচন্দ্রের সাহিত্যের মূল্যায়নের কথা বল্‌ছেন?

আমি বল্লাম,—হ্যাঁ, প্রথমতঃ তা-ই বলুন।

করিম—আমি তো সাহিত্য সমালোচক নই,—একজন সাধারণ পাঠক মাত্র। তা ছাড়া শরৎ-সাহিত্যের কতটুকুই বা পড়েছি।

লেখক—যতটুকু পড়েছেন তা আপনার কেমন লেগেছে?

করিম—মোটামুটি।

লেখক—আপনার এ উত্তরে আমি খুশী হতে পারলাম না।

করিম—খুশী হওয়ার মতন উত্তর চাই?

লেখক—সত্য উত্তর চাই।

করিম—আমি মিথ্যা বলি নি।

লেখক—মোটামুটি বল্‌তে কিছু স্পষ্ট বোঝা যায় না।

করিম—বুঝিয়ে বলা মুস্কিল।

লেখক—ধরুন তারাশঙ্করের চেয়ে ভালো কি না?

করিম—দু'জনের তো একই লেখা নয়। শরৎচন্দ্রের তুলনা শরৎচন্দ্র নিজেই।

লেখক—শরৎচন্দ্রের কোন্ লেখা আপনার সবচেয়ে ভালো লাগে?

করিম—বেশ কয়েকটি জায়গা ভালো লাগে।

দেখলাম করিম সাহেব স্পষ্ট জবাব এড়িয়ে যাচ্ছেন। আমি নাছোড়-বান্দা। আমি নির্দ্দিষ্ট করে জিজ্ঞাসা করলাম,—

শ্রীকান্ত গ্রন্থের গহরের চরিত্র-চিত্রটি আপনার কাছে কেমন লাগে?

করিম—বাস্তব চিত্র বটে। তবে সব বাস্তব চরিত্রের সবদিক সমাজের সাম্‌নে পুনরুত্থাপন করার পক্ষপাতী আমি নই।

বুঝলাম আমার কথা এবারে করিম সাহেবের ইসলামি চিন্তাধারায় স্পর্শ করেছে। আমি প্রশ্ন করলাম,—কেন?

করিম—যে বাস্তব-চিত্র সমাজের লোককে ন্যায়-নিষ্ঠ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে নিতে প্রলুব্ধ করে, তা সমাজ-সমক্ষে না আনাই সাহিত্যিকের পক্ষে গৌরব-জনক কাজ।

লেখক—এইভাবে যে সাহিত্যিক বাস্তব সমাজ চিত্রকে বাদ দেবেন তাঁকে একচক্ষু হরিণ বল্‌তে হবে। এইরূপ পলায়নী-প্রবৃত্তিকে উৎসাহিত করা কি অপরাধ নয়?

করিম—যে সাহিত্যিক, সমাজকে সার্বিক কল্যাণ-কর কিছু দিতে পারেন না, যে সাহিত্যিক, জীবনে চলার পথে সহযোগী হিসাবে সমাজকে গতিশীল করার ভুমিকা নিতে পারেন না,—সাহিত্য-জগত থেকে তাঁর অপসারিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

লেখক—সাহিত্যিক কি সমাজ-সংস্কারের ভূমিকা নেবেন?

করিম—পরোক্ষভাবে তা-ই বটে।

লেখক—তাহলে সাহিত্যিক এবং সমাজ-সংস্কারকের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?

করিম—সার্ব্বিক কল্যাণকর আনন্দদানের মাধ্যমে সাহিত্যিক সমাজের সমস্যা সমাধানের সন্ধান দেন। সমাজ-সংস্কারক সমাজের সমস্যার সমাধান বাস্তবে রূপায়িত করেন মাত্র।

লেখক—গহরের চরিত্র-চিত্রনে এমন কি বাস্তব ঘটনা দেখলেন যা আপনার চিন্তাদর্শের বিরোধী ?

করিম—গহর সরল হৃদয়, কোন কোন ক্ষেত্রে নির্লোভ,—ভালো কথা ; কিন্তু মুরারী পুকুরের আখড়ার বৈষ্ণবী কমললতার সহিত গহরের প্রীতি-সম্পর্কের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, তা বাস্তব হতে পারে কিন্তু সমাজের সাধারণ লোক অবৈধ প্রণয়াবেগে উৎসাহিত হতে পারার সম্ভাবনা আছে বলে সাহিত্যে ঐরূপ চিত্র অঙ্কন সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য।

লেখক—রামায়ণের কাহিনী নিয়ে কাব্য লিখে কৃত্তিবাসকে হারিয়ে দেবার নেশা মুসলিম গহরের পক্ষে অপরাধজনক বলে মনে করেন কি ?

করিম—এতে মুসলিম মানসিকতা আহত হয়েছে।

লেখক—কেন ?

করিম—রামায়ণে দেখি নিষ্পাপ সীতা পরিত্যক্তা হয়েছেন। তিনি নিরপরাধিনী হয়েও শাস্তিপ্রাপ্তা। ইসলামি আদর্শে কখনো কোন নিষ্পাপ মহিলাকে শাস্তি দান অনুমোদন করে না।

লেখক—সব ঘটনা-ই তো তাহলে কোনো না কোনো মতবাদের বিষয় !

করিম—ধর্মীয় আদর্শে যা অনুমোদন করে না তা সমাজকে সার্ব্বিক কল্যাণকর কিছুই দিতে পারে না। অর্থাৎ ধর্মীয় আদর্শে অকল্যাণের কোন স্থান নেই। অতএব সাহিত্যিককে আগে অবশ্যই ধর্মপরায়ণ হতে হবে। ধর্ম-পরায়ন ব্যক্তির সৃষ্ট সাহিত্য সমাজের লোককে যতটুকু আনন্দই দিক—তা প্রকৃত আনন্দ ; সে সাহিত্য প্রকৃত সাহিত্য-গুণ-সমন্বিত।

লেখক—এক ধর্মের কাছে যা অনুমোদিত, অন্য ধর্মের কাছে তা অনুমোদিত নাও হতে পারে। সেখানে এক ধর্মাবলম্বী সাহিত্যিকের সঙ্গে অন্য ধর্মাবলম্বী সাহিত্যিকের দ্বন্দ্ব অবশ্যম্ভাবী।

করিম—সার্ব্বিক কল্যাণই ইসলামের আদর্শ যা বিশ্বময় ব্যাপ্ত। সেখানে ধর্ম দুটি হতে পারে না। সেখানে দ্বন্দ্ব মানে ধর্মের সঙ্গে অধর্মের দ্বন্দ্ব।

লেখক—কিন্তু আদর্শের জন্য কম আনন্দ লাভ করতে মানুষ ধৈর্যশীল নয়।

করিম—আদর্শ-অনুসারী সামগ্রিক কল্যাণ-ভিত্তিক আনন্দ পরিবেশনের মাত্রা কম হলেও নিঃসন্দেহে তা ভালো। পরিবেশনায় দূষনীয় আনন্দের প্রাচুর্য্য থাকায় লোককে ধৈর্যহারা হতে উত্তেজিত করছে। তারা আদর্শভ্রষ্ট

হচ্ছেও। এই দুষ্ট ধারা বন্ধ করে আদর্শ-অনুসারী সামগ্রিক কল্যাণ-ভিত্তিক আনন্দ পরিবেশনার মাধ্যম হিসাবে সাহিত্য সৃষ্টি হলে আস্তে আস্তে মানুষের রুচিরও পরিবর্ত্তন হবে। আমার অভিমত, অবিলম্বে এমন কি এখনই তার সূত্রপাত ব্যাপকভাবে হওয়া চাই।

বুঝলাম করিম শেখ সাহেব ধর্মীয় আদর্শের বাহিরে একচুলও আসতে চান না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, —মহেশ গল্পটি আপনার নিকট কেমন লাগে? করিম সাহেব বেশ উৎসাহ-সহকারে বল্‌লেন—খুবই ভাল লাগে।

লেখক—গফুর কোন এক কসাই-এর কাছে মহেশকে বিক্রী করতে চেয়েছিল। অর্থাৎ সে জেনে শুনেও গো-হত্যার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল। সেটা কি তার অপরাধ নয়?

করিম—যে সমাজ-ব্যবস্থায় দুস্তর প্রান্তর—গভীর অরণ্য থাকতেও গোরুর জন্য উপযুক্ত আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা নেই—শুধু আনুষ্ঠানিক গো-পূজার ব্যবস্থা রয়েছে, সে সমাজে এটিই বাস্তব ঘটনা।

লেখক—শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, চরিত্রহীন, শেষপ্রশ্ন, বিরাজবৌ প্রভৃতি আমার খুব ভালো লাগে। আপনার অভিমত কি?

করিম—ঐগুলি আমার যে একেবারেই ভালো লাগে না—তা নয়। কালিদাসের অভিজ্ঞান শকুন্তলম, শেক্সপীয়রের ওথেলো, ভিক্টর হুগোর লে মিজারেবল ইত্যাদি যেমন ভালো লাগে এও তেমনি।

লেখক—বক্তব্যটি আর একটু বিশদভাবে বলুন।

করিম—ইংলণ্ডের শেক্সপীয়রের রচনায় ইংরেজ সমাজের চিত্রই বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। একজন ইংরেজ তাঁর পরিচিত সমাজচিত্রের চরিত্রগুলি যত গভীরভাবে, আন্তরিকভাবে অনুভব করবেন—আমাদের পক্ষে তাকি সম্ভব?

লেখক—তা বটে। কিন্তু আপনিও বাঙালী আবার শরৎচন্দ্রও বাঙালী বটে!

করিম—মানুষ হিসাবে ইংরেজ-সেক্সপীয়রের সঙ্গে আমাদের মত বাঙালীর যেমন মিল আছে, বাঙালী হিসাবে হিন্দু শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আমাদের মতন মুসলিমের প্রায় তেমন মিল আছে। ইংরেজের সঙ্গে আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রে বাঙালীর নিশ্চয় কিছু পার্থক্য আছে। ঠিক তেমনিভাবে হিন্দু-বাঙালীর আচার-আচরণ এবং সংস্কৃতির কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম বাঙালীরও নিশ্চয় কিছু পার্থক্য আছে। সুতরাং হিন্দু আপনার নিকট, হিন্দু

শরৎবাবু ও তাঁর হিন্দু-সমাজ-চিত্র বিশিষ্ট সাহিত্যের মিল থাকায়, তা আকর্ষনীয় বটে যা আমার নিকট ততখানি নয়।

লেখক—ব্যক্তি হিসাবে শরৎচন্দ্রকে আপনি কিরূপ মনে করেন?

করিম—শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তো আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ছিল না। তবে শরৎ-সাহিত্য সংগ্রহের অষ্টম সম্ভারে "হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কে" যে বক্তব্য প্রকাশিত আছে, তাতে শরৎবাবু তাঁর সুখ্যাতি অনেকখানি বিনষ্ট করে ফেলেছেন বলে আমার মনে হয়।

লেখক—কি রকম?

করিম—শরৎচন্দ্র বলেছেন—"হিন্দুস্থান হিন্দুর দেশ। সুতরাং এ দেশকে অধীনতার শৃঙ্খল হইতে মুক্ত করিবার দায়িত্ব একা হিন্দুরই। মুসলমান মুখ ফিরাইয়া আছে তুরস্ক ও আরবের দিকে—এদেশে চিত্ত তাহার নাই। যাহা নাই তাহার জন্য অপেক্ষা করিয়াই বা লাভ কি এবং তাহাদের বিমুখ কর্ণের পিছু পিছু ভারতের জলবায়ু ও খানিকটা মাটির দোহাই পাড়িয়াই বা কি হইবে? আজ এই কথাটাই একান্ত করিয়া বুঝিবার প্রয়োজন হইয়াছে যে, এ কাজ শুধু হিন্দুর—আর কাহারও নয়।"

সিন্ধুনদীর দেশ সিন্ধুস্থান বা হিন্দুস্থান কি শুধু হিন্দুর জন্য? হিন্দু বলতে শরৎবাবু নিশ্চয় মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য-বাদীদের বা তৎ-বিশ্লিষ্ট জৈন, বৈষ্ণবাদি অধিবাসী-দের কথা বলেছেন। তা যদি হয়, ব্রাহ্মণ্যবাদ অনুসৃত সমস্ত আর্য্য মূলতঃ তো সিন্দুস্থান বা হিন্দুস্থানের লোক নন,—তাঁরাও তো ভারতের নিকট বিদেশী। আর যদি "হিন্দু" বলতে হিন্দুস্থানের অধিবাসী-মাত্রই বা বর্তমান ভারতের সকলের মিলিত ভাবাদর্শের কথা বলে থাকেন তবে মুসলমানরা তা থেকে বাদ যান কি করে? গৌড়ের সুলতান হুশেন শাহ্ বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যা করেছিলেন, সুলতান পরাগল খাঁ প্রথম বাংলা ভাষায় মহাভারত অনুবাদ করবার জন্য যা করেছিলেন ইতিহাসেও তার সাক্ষ্য রয়েছে। মোগল সম্রাট আকবর সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক "দীনইলাহী" প্রচার করেছিলেন এবং মহাভারত, উপ-নিষদাদি হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থগুলির আরবীভাষায় অনুবাদের জন্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছিলেন। শরৎচন্দ্র এসব কথা ভুললেন কি করে? মহারাজ নন্দকুমারের পাশে থেকে পলাশীর প্রান্তরে যুদ্ধের সময়ে মীর কাশিম যে জীবনপণ যুদ্ধ করলেন—শরৎবাবু কি তার কোনো মূল্য স্বীকার করেন না? তাছাড়া শরৎবাবু কি বীর বিপ্লবী—শহীদ তিতুমীরের জীবন দিয়ে স্বাধীনতা

রক্ষা করার কথা অস্বীকার করেন! কবি মুহম্মদ ইকবালের "সারে জাঁহাসে আচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা"—গানের মধ্যে কি শরৎচন্দ্র সাম্প্রদায়িকতার রক্তগঙ্গা লক্ষ্য করেছেন! দাদাভাই নৌরজী, আবুল কালাম আজাদ, ফজলুল হক এমন কি মহম্মদ আলি জিন্নাহ্ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেন নি একথা কে স্বীকার করবে? মুসলমানরা তুরস্ক ও আরবের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকলে কেন নজরুল ইসলাম বিদ্রোহের গান গাইলেন!

করিম শেখ সাহেব হঠাৎ থেমে গেলেন। পকেট থেকে ধবধবে পরিষ্কার একটা সাদা রুমাল বের করে কপালটা মুছে নিলেন। তারপর মাথার ফেজ-টুপীটা আর একবার মাথায় ঠিক করে বসিয়ে নেবার জন্য খুলে মাথায় হাত বুলালেন। আমি কোন কথাই বললাম না। বুঝলাম তিনি কিছু উত্তেজিত হয়েছেন। টুপীটা মাথায় দিয়ে আবার বলতে আরম্ভ করলেন, ব্রাহ্মণ্যবাদীগণ কি মুসলিমদের অকথ্য অত্যাচার করেনি! রাষ্ট্রশক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার বহু পূর্ব্বে আদর্শগত পরিচয় নিয়ে ইসলাম ভারতে প্রবেশ করে। পীর গোরাচাঁদ, পীর মোবারক বড় খাঁ গাজী প্রমুখ ইসলাম-অনুসারী সাধক পুরুষের ভাষা এদেশের লোকের কাছে তখন বোধগম্য না হলেও তাঁদের প্রচারিত বিশ্বমানবতার আদর্শ এতদ্দেশীয় নির্য্যাতিত, অবহেলিত, অস্পৃশ্য মানুষের অন্তরকে কিরূপ গভীর আকর্ষণে স্পর্শ করেছিল তার প্রমাণ বর্তমান ভারতের কোটি কোটি মুসলিম জনসাধারণ। মানুষ হিসাবে মানুষের সার্ব্বিক কল্যাণ ও মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সেই সব সাধক পুরুষগণ নিজেদের জীবনকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করে গেছেন। নিম্নবর্ণের হিন্দুরা তাঁদের সংস্পর্শে এসে জীবনের পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হয়েছে এবং দলে দলে মুসলিম হয়ে গিয়েছে। এদেশে যদি তাদের চিত্ত নাই তবে আর্য্যদের মতন সম্রাট আকবর প্রমুখ বহিরাগত মুসলিমগণ কেন এদেশেরই অধিবাসী হয়ে গেলেন? তবে হ্যাঁ, মুসলিমগণ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী এবং সেই কারণেই তাঁরা ইসলামি আদর্শের মূল ধারক ও বাহক আরবীয়গণের সাধনাকে অনুসরণ করে উন্নততর জীবন প্রবাহকে স্বাগত জানিয়েছে মাত্র।

করিম শেখ সাহেব এবারে থামলেন। আমিও চুপ করে থাকতে পারছিলাম না। প্রশ্ন করলাম,—তবে হিন্দু ও মুসলিমের মধ্যে দাঙ্গা হল কেন? কেন পাকিস্তানের সৃষ্টি হল?

করিম—স্বার্থবাদী লোক প্রায় সর্বদেশে সর্বকালে দেখা গেছে। নিঃস্বার্থে যাঁরা

জীবন দিলেন তাঁদের সে দেওয়ার কি কোন মূল্য নেই? কেন তবে গান্ধীজীকে আততায়ীর হাতে প্রাণ দিতে হল? কেন লিয়াকত আলি নিহত হলেন আততায়ীর হাতে?

করিম শেখ সাহেব হঠাৎ থেমে গেলেন এবং অনেকটা শান্ত গলায় বললেন,—আমি দুঃখিত! শরৎবাবু সম্পর্কে আলোচনার ক্ষেত্রে এ সব অতিরিক্ত কথা।

লেখক—শরৎচন্দ্রকে আপনি কি সাম্প্রদায়িক বলছেন?

করিম—রাজনৈতিক বক্তব্যে শরৎচন্দ্র তো অন্ততঃ খানিকটা সাম্প্রদায়িক বলে প্রকাশ হয়ে পড়েছেন। খানিকটা বলছি এই জন্যে যে এতে তাঁর কিছু অভিমানের পরিচয় আছে বলে মনে হয়।

লেখক—সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রকে আপনি সাম্প্রদায়িক বলতে পারেন কি?

করিম—তিনি প্রায় সবটাই হিন্দু বাঙ্গালীর জীবন নিয়ে লিখেছেন। জন্ম থেকে যে আদর্শ-ভিত্তিক জীবন ও সমাজের সঙ্গে আমার পরিচয় তা নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করলে শরৎবাবু আমার নিকট আরো বেশী অন্তরস্পর্শী হতেন। শরৎচন্দ্র বাঙালী-হিন্দুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হতে পারেন, কিন্তু শতকরা প্রায় সত্তর জন বাঙালী মুসলিমের নিকট তিনি তা নন।

লেখক—বাঙালীকে হিন্দু বাঙালী, মুসলিম বাঙালী, খৃষ্টান বাঙালী ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা কি উচিত?

করিম—আমি ভাগ করার কে! যা আছে তা বলছি মাত্র!

লেখক—যাতে ভেদ বাড়ে তার উল্লেখ করলে ভেদজ্ঞানে উৎসাহ দেওয়া হয় না কি?

করিম—আমাদের রঙ্, আকৃতি, আচরণ প্রভৃতিতে যে ভেদ; প্রকৃতির মধ্যে যে বৈচিত্র্য, তাকে অস্বীকার করাতে আর যা-ই থাক,—গৌরব নেই।

লেখক—তা হলে শরৎচন্দ্র যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তাকে আপনি সাম্প্রদায়িক বলে দোষারোপ করছেন না?

করিম—নিশ্চয়ই না। তা কেন করব! মুসলিম তিনি নন, মুসলিম সমাজ-জীবন নিয়ে উপযুক্ত সাহিত্য রচনা তাঁর পক্ষে সম্ভব না হওয়াটাই স্বাভাবিক। সে জন্যে তাঁকে দোষ দিতে যাব কেন! সেটা তাঁর অক্ষমতা। কবি গোলাম কুদ্দুস লিখেছেন 'বাঁদী' নামক উপন্যাস, যাতে মুসলিম সমাজচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। সেটা তাঁর ক্ষমতা। তিনি অমুসলিম জীবন নিয়ে

লিখতে পারেননি,—সেটা তাঁর অক্ষমতা। এই সব সহজ সত্যকে স্বীকারে কোন দুর্ব্বলতা থাকা উচিত বলে আমি মনে করি না।...আচ্ছা, আমি আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি কি ?

দেখলাম শেখ সাহেবকে অনেকক্ষণ বকিয়েছি—আর নয়। এবার আমাকে একটু বক্‌তে হয়। বল্‌লাম—নিশ্চয়, নিশ্চয় !

করিম—আপনি কেবল গহর আর গফুরের কথা বিশেষভাবে জিজ্ঞাসা কর্‌লেন। কি ব্যাপার ?

লেখক—শরৎবাবুর চিত্রিত গহর ও গফুর হল মুসলিম চরিত্র। আপনি নিজে মুসলিম হিসাবে তাদেরকে কতখানি সম্পূর্ণ (অন্ততঃ মুসলিম বা ইসলামি দৃষ্টিতে) বলে মনে করেন তা জান্‌তে চেয়েছি।

করিম—মুসলিম নামধারী সাহিত্যিক বা মুসলিম নামধারী চরিত্র নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি হলেই তা ইসলামি সাহিত্য হবে এমন ধারণা নিতান্ত বিভ্রান্তিমূলক। মনে রাখতে হবে সার্ব্বিক কল্যাণকর সত্য নিয়ে ইসলামি সাহিত্য রচিত হতে পারে। অথবা বলা যায়—ইসলামি আদর্শ অনুসারী সাহিত্যই প্রকৃত পক্ষে ইসলামি সাহিত্য।

এর পর আমাদের কথোপকথন প্রসংগান্তরে গেল। এখানে তার বিবরণ প্রদান নিরর্থক।

শরৎচন্দ্র

শ্রীসুধী প্রধান

[প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে হিজলী বন্দী শিবিরের মধ্যে রাজনৈতিক বন্দীদের ওপর বৃটিশ সরকারের নৃশংস গুলী চালনার পূর্বদিনে বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপনের উদ্যোগ নেওয়া এক অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা। অগ্নিযুগের অন্যতম খ্যাতনামা বিপ্লবী এবং উক্ত বন্দীশালায় বন্দীদের দ্বারা গঠিত শরৎ জন্ম-বার্ষিকী কমিটির সম্পাদক শ্রীসুধী প্রধান এই প্রবন্ধটি রচনা করেন ; কিন্তু বন্দীশালায় গুলী চালনায় সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেনগুপ্ত নিহত হওয়ার ফলে শরৎ জন্ম-বার্ষিকী পালিত হতে পারেনি। সে যুগে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীগণ শরৎচন্দ্রকে কি দৃষ্টিতে গ্রহণ করেছিলেন —এ প্রবন্ধটি তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।—সম্পাদক]

আজ শরৎচন্দ্রের জন্মতিথি উপলক্ষে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছি। যাঁহার চরণে শ্রদ্ধার অর্ঘ দিব তাঁহাকে ভাল করিয়া জানা দরকার। পরিচয় অত্যন্ত নিবিড় হওয়ার পরও অন্ততঃ নিজের মনে একবার আনাগোনা করা প্রয়োজন যে তাঁহাকে কতটুকু জানিয়াছি—কিভাবে জানিয়াছি। তাঁহাকে যেরূপে আমি দেখিলাম তাহার সহিত পারিপার্শ্বিক অন্য সকল দৃষ্টির মিল হইল কিনা—কিছু যায় আসে না।, শুধু যে মানুষ আপন দাবীতে আমার অন্তরে আসন করিয়া লইয়াছে—সেই আমার আপন অন্তরের মানুষটির সহিত সাক্ষাৎ সত্য পরিচয় আমার কতখানি, নিজের সঙ্গে সেই বুঝাপড়া হইলেই হইল।

তাই এই আত্ম-জিজ্ঞাসার তাগিদের মুখে এই অভিনন্দন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শুধু এই কথাই মনে হইতেছে যে শরৎচন্দ্রকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতে আসিয়াছি—কথাশিল্পীকে এ পূজা নয়—মানুষকে এই পূজা। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র আপন হৃদয়-বিত্তে, কল্পনার ঐশ্বর্যে আপনাকে বহু ব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছেন। শুধু তাঁহার চারিদিকের বর্তমানকে নয়,—সমগ্র অনাগত কালের মধ্যে নিজেকে তিনি নিঃশেষে দান করিয়াছেন। যে যুগান্তর আজিও সুদূর ভবিষ্যতের কুহেলীমলিন নীহারিকায় বীজরূপে লীন রহিয়াছে সেখানকার অজাত মানুষও তাহাদের নবাঙ্কুর চেতনায়

অরুণালোকে শিল্পী শরৎচন্দ্রকে আপনার স্বজন বলিয়া চিনিয়া লইবে। এই বিপুল শিল্প-প্রতিভাকে উপযুক্ত সম্মান দান একদিনের বা একযুগের মানুষের বা কোন যুগের মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। শক্তি যেখানে আপন মহিমায় চারিদিকের সকলকে মুক করিয়া তোলে—সেখানে সেই নির্ব্বাক মৌনতাই শক্তিমানের শ্রেষ্ঠ-সম্মান। তবু শ্রদ্ধা নিবেদনের পথে মানুষ আত্মশ্রদ্ধার উৎস খুঁজিয়া ফিরে—তাই আজ এক মুহূর্ত্তের জন্য শরৎচন্দ্রকে তাঁহার সকল ঐশ্বর্যের আবরণ মুক্ত করিয়া তাঁহার আপন অন্তরের দীপ্ত দীপ মনিকোঠায় তাঁহার নিজস্বরূপ প্রত্যক্ষ করিব। আজিকার এই পুষ্পাঞ্জলি সেইখানেই দিব যেখানে তিনি একান্তভাবে মানুষ—সেখানে তিনি বিপ্লবী—অর্থাৎ—যেখানে তিনি প্রলয়ী ও স্রষ্টা। যেখানে ধ্বংসের রুদ্র বিষাণ ও সৃষ্টির কল্যাণ শঙ্খ একহাতে বাজিয়াছে—সেই নটরাজকে আজ প্রণাম করিব।

বিপ্লবী? হাঁ বিপ্লবী। মানুষের জীবন নিত্য প্রগতিশীল। মানুষ তার পারিপার্শ্বিক আবেষ্টনের প্রভাবে বিভিন্ন চরিত্র ও ভাবের ঘাত-প্রতিঘাতের দোলায় দুলিতে দুলিতে অবিরত অজানা ভবিষ্যতের পানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই চলার পথে অপরিমেয় শক্তির পাথেয় লইয়া যে মানুষ চলিয়াছে—গতি তাহার অপ্রতিহত—সে আপন গৌরবের লক্ষ্যে নিঃশব্দে পৌছায়—আর এই পাথেয় যাহার প্রচুর নয়—পথের চিরন্তন বাধাবন্ধের দ্বন্দ্বে ভুল-ত্রুটির গ্লানির ভারে ডুবিয়া সে মানুষ মরে। ব্যক্তিগত জীবনের এই ঘটনা সমাজ-জীবনেও সত্য। মানুষের সমাজও নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল—নিত্য নূতন অজানা পরীক্ষার মধ্য দিয়া তাহাকে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতে হয়। এই পরীক্ষার কালে একবার ভুল হইলে সেই ভুলের রন্ধ্রপথে দুর্ব্বলতা প্রবেশ করে এবং একটার পর একটা এই দুর্ব্বলতা আসিয়া একদিন তাহার অভিযান-শক্তি নষ্ট করিয়া ফেলে। এই হৃত-শক্তি রিক্ত জাতির অবস্থা হয় তখন বদ্ধ জলার মত নিশ্চেষ্ট, জড় ও পঙ্গু। বিশ্বের সহানুভূতি হারাইয়া এই আত্মবিশ্বাসহীন জাতি দিনের পর দিন অন্ধকার মরণের পথে চলিতে থাকে। এইরূপ অবস্থায় এই মরা জাতির মধ্যে কখন কখন আসেন দু'একজন মানুষ যাঁহারা চারিদিকের মৃত্যু-নিস্তব্ধতার মধ্যে নিজেরা জাগ্রত ও জীবিত এবং সর্ব্বোপরি তাঁহারা আত্মচেতনাবান। তাঁহাদের চৈতন্যের দীপ্ত শিখায় তাঁহারা আপন অবস্থা দেখিতে পান এবং ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারেন যে এই জাতির বাঁচিবার উপায় এই বদ্ধ অবস্থার প্রতিকার। যুগ-যুগান্তরের অন্ধকার জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—কোনও একটি বা দুইটি জানালা খুলিয়া দিলে এই মৃত্যু-

পুরী আলোকিত হওয়া আর সম্ভব নয়—ইহাকে আলোকিত করিতে হইলে—ইহাকে স্বাস্থ্য শক্তিতে সচল-সুন্দর করিতে হইলে যতগুলি গবাক্ষ আছে সবই খুলিতে হইবে—যেখানে যা কিছু আবর্জ্জনা আছে সবই পরিষ্কার করিতে হইবে। এই কাজে যা কিছু পচা, যা কিছু দূষিত, পুরাতন শুধু পুরাতনত্বের দাবীতে সমস্ত অনাগত ভবিষ্যতের বুক চিরিয়া দুষ্টক্ষতের মত তাহাকে বিকৃত করিতেছে—তাহাদের সব বর্জ্জন করিতে হইবে—যাহা কিছু ইহার বাধা সব ভাঙিয়া পিষিয়া ধূলায় গুড়াইয়া দিতে হইবে—যাহারা এই কাজের বিরোধী তাহাদের নির্ম্মম হস্তে সংহার করিতে হইবে—এক কথায় এই মরণোন্মুখ জাতিকে বাঁচিতে হইবে এবং ইহার বাঁচিবার একমাত্র উপায় ইহার বর্ত্তমান অবস্থার একটা অত্যন্ত দ্রুত আমূল পরিবর্ত্তন।

পরিবর্ত্তন শুধু ধ্বংস নয়। পরিবর্ত্তন বলিলে বুঝায় একটা অবস্থাকে ছাড়িয়া আর একটা গ্রহণ। এই গ্রহণ কথার ভিতর সৃষ্টির ইঙ্গিত রহিয়াছে। অকর্ম্মণ্য পুরাতনকে ধ্বংস করিয়া মঙ্গলময় নূতনকে সৃষ্টি—ইহাই বিপ্লবের মূলকথা, একমাত্র আদর্শ। জাতীয় যুগ সন্ধিকালে প্রাণহীন জাতির প্রাণে মৃতসঞ্জীবনী প্রদান যাঁহারা করেন—এই বিপ্লববাদ তাঁহাদের একমাত্র মূলমন্ত্র।

কিন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যায় যে বিপ্লব কর্ম্মতঃ অনুষ্ঠান হইতে সময় লাগে। কারণ কর্ম ভাবানুসারী অর্থাৎ ভাব কর্ম্মের সূচক। তাই বিপ্লবাদর্শের যাঁহারা অগ্রদূত,—তাঁহাদের কাজ, জাতির মর্ম্মমূলে ভাবের দীক্ষা দান, জাতিকে আত্ম-চৈতন্যে উদ্বুদ্ধ করা। এই উদ্বোধন সঙ্গীত যখন কোনও শক্তিশালী গায়কের কণ্ঠে বাজিতে থাকে তখন দেখা যায় প্রকৃত বিপ্লব অনুষ্ঠিত হইবার বহু পূর্ব্বেই বিপ্লব সাধিত হইয়া গিয়াছে।

এইজন্য শরৎচন্দ্র বাংলার বিপ্লব-যজ্ঞের অন্যতম ঋত্বিক বাংলার নবযুগের একজন শ্রেষ্ঠতম বিপ্লবী এবং এই তাঁহার সত্য পরিচয়।

বস্তুতঃ বিপ্লবীর যথার্থ পরিচয় কি? তাঁর সহানুভূতিশীল একটা বিরাট প্রাণ—সেই কি তাঁর একমাত্র পরিচয় নয়? এমন একটা প্রাণ সকলকার জন্যই সমান দরদ—সে দরদে আনন্দ আছে, দুঃখ আছে, ব্যথার জ্বালা, হিংসার বিষ আছে, সর্ব্বোত্তম ক্ষমা ও ভয়ঙ্কর প্রতিহিংসার বাসনায় ঘেরা সেই দরদী—সে-ই তো বিপ্লবী। শরৎচন্দ্রকে তো আমরা এইরূপেই দেখিতে পাই।

তাঁর প্রতিভার প্রকাশ তাঁর সাহিত্যে। সে অভিজাতের সাহিত্য নয়। উচ্চতম মানবতার সুমেরু-শিখর আলোকিত করিয়াই সে সূর্য অস্ত যায় নাই।

সর্ব্বনিম্ন অধিত্যকায় যেখানে কংকর-বন্ধুর বনতলে আলো-আঁধারে ছায়াময় বৈচিত্র্য রচনা করিয়াছে—তাঁর প্রতিভাসূর্য সেখানেও আলোক রেখাপাত করিয়াছে।

অপরিমেয় দরদের সহিত বড়ছোট সমাজের সব স্তরে তিনি ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিয়াছেন বলিয়া কোন দুঃখ-বেদনার কাহিনী তাঁহার চোখ এড়াইয়া যায় নাই। মানুষের গভীরতম বেদনার সমক্ষে দাঁড়াইয়া তিনি মর্ম্মের অশ্রু ফেলিয়াছেন। বুকফাটা আর্তগুমরানির কাছে দাঁড়াইয়া তাঁরও বুক ফাটিয়াছে। ছোট বড় সব বিপ্লবীর জীবনের গূঢ়তত্ত্ব এই।

কিন্তু এই অবস্থায় অশ্রু বিসর্জ্জনের যুগ বেশীদিন নয়। শিল্পীর জীবনে পরিবর্ত্তন আসিয়াছে। তিনি বিদ্রোহ ঘোষণার কথা চিন্তা করিতেছেন। "বিরাজ বৌ" হইতে শুরু হইয়া "দেবদাসের" যুগ প্রথম পর্ব্বে শেষ করিয়া শ্রীকান্ত এখন জীবনের অভিজ্ঞতায় দ্বিতীয় যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। চোখের জল পড়ে বটে তবে সহ্য না করিয়াও যে পারা যায়, প্রতিবিধানের সে পথ আছে সঙ্গে সঙ্গে একথাও ভাবিতে শুরু করিয়াছেন। বিদ্রোহ করিলে কেমন হয় ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত "অভয়াকে" লইয়া তাহার একটা পরীক্ষা করিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা করিতেছেন—বাংলার গৌরবে উজ্জ্বল দিনের—অনাগত বাংলার মহত্ত্বকে বর্তমানের দুঃখ ব্যথার সঙ্গে জড়িত করিয়া দেখিতেছেন। মজ্জায়, মজ্জায় দেশগত প্রাণ শিল্পী স্বপ্ন দেখিতেছেন—অমা রজনীর অবসানে দেশের কি রূপ হইতে পারে। বাঙ্গালীকে তিনি বুঝিয়াছেন, বাংলার প্রাণবস্তুর তিনি সন্ধান পাইয়াছেন। যেন ধ্যান করিতেছেন বাঙ্গালী, বাঙ্গালীই থাকিবে এমন দোষে গুণে মানুষ। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশের মানুষের মত, কিন্তু তবু কোথায় যেন একটু স্বতন্ত্র—মানুষ হইয়াও যেন কি এক অতিমানুষী মহত্ত্বের অধিকারী। সতীশ সাবিত্রী, কিরণময়ী, নরেন্দ্র, রমা, রমেশ,—ইহারা ভাবুকের স্বপ্নের মানুষ, অনাগত যুগের বাঙ্গালী। আজিকার দুঃখ-ব্যথার মধ্যে ক্ষত-বিক্ষত হইতে হইতেও ইহাদের জীবন কেমন করিয়া ভবিষ্যতের মধ্যে অঙ্কুরিত হইতেছে—শিল্পী অত্যন্ত পরিতৃপ্তির সহিত চক্ষু চাহিয়া তা-ই দেখিতেছেন—দৃষ্টিতে অমৃত ঝরিতেছে। কিন্তু এখনও তাঁহার রণোন্মাদ—বেশ নয়—এখনও, "Revolutionary in the making।" এখনও আপনমনে হাসা-কাঁদা, স্বপ্নের জাল বোনা, রূপনারায়নের তীরে নীরব-নির্জ্জনে বসিয়া আপন মর্ম্মগীতি শোনা। সার্থক বিপ্লবীদের জীবনে এও এক ঘটনা—এ বোধ হয় শক্তি সঞ্চয়ের কাল—সাধনার যুগ।

এই সাধনা শেষে তৃতীয় বা বর্তমান যুগের আরম্ভ। এখন আর অক্ষম-কান্নার সময় নাই। কান্না শেষ করিয়া চোখের জল এখন অগ্নিস্ফুলিঙ্গ হইয়াছে। আজন্ম নিপেষিত মানুষ আজ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে বিদ্রোহ করিতে—এ বিদ্রোহ সামান্য নয়—কারণ বিদ্রোহী যে সেও তো আজ আর সামান্য মানুষ নাই। সে বাঙ্গালী বটে, কিন্তু সে Burma oil company-র কারখানার boiler। শান্ত, নিরুপদ্রব, সুন্দর বহিরাবরণের অভ্যন্তরে অগ্নির প্লাবন বহিয়া যাইতেছে। নব যুগের বিপ্লবী বাংলার এইরূপ সব্যসাচী কমল। আজ আর কোনও সংশয় কোনও দ্বিধা নাই। রাষ্ট্র, ধর্ম, সমাজ, নীতি—যেখানে যতকিছু অসুন্দর-মলিনতা, অত্যাচার—সব কিছুকে নির্মম হস্তে ধ্বংস করিতে হইবে। যা কিছু মানুষের সর্ব্বোত্তম মুক্তির পরিপন্থী—তাহাকেই বিনাশ করিতে হইবে। ইট-কাঠ খসিবে, চুন-বালি উড়িবে, চারিদিক অন্ধকার হইয়া অশান্তি ঘনাইয়া আসিবে—কিন্তু তা আসুক ;—অশান্তি মানে তো অকল্যাণ নয়। দুঃসহ অশান্তির পথে মানুষের চরমতম কল্যাণের বন্দনার গান রচিত হইবে। মহামানবের মুক্তির সাগরে মানবের রক্তধারা তরঙ্গ তুলিয়া ছুটিয়া যাক—যুগ-যুগান্তের পরিশ্রমে গড়া সৌধ ভাঙ্গিয়া পড়ুক কোন দুঃখ নাই; কারণ এই ভাঙ্গার অভিযানেই মানুষের পরম গৌরব। কেননা আজিকার এই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কান পাতিয়া আমরা অদূরবর্ত্তী মহা-মানবের ক্ষীণ পদধ্বনি শুনিতে পাইতেছি।

আজ পর্যন্ত শরৎচন্দ্রের জীবনের এই পরিণতি আদর্শ বিপ্লবীর পরিণতি। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত দেখিলে মনে হয় না যে, ভাব-জগতের বিপ্লবাদর্শে ইহার চেয়ে বড় কিছু থাকিতে পারে।

আজ এই প্রসঙ্গে মনে পড়িতেছে আর একজনের কথা—যিনি বাংলার বিপ্লব-মন্ত্রের প্রথম উদ্গাতা—স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর কথা এখানে বিশদ আলোচনা সম্ভব নয়। শুধু এইটুকু বলিব যে বিবেকানন্দকে না বুঝিলে শরৎচন্দ্রকে বোঝা সম্ভব নয়। সে চেষ্টা করিতে গেলে তাঁহাকে নিছক ঔপন্যাসিক বলিয়াই বুঝিব। কিন্তু ঔপন্যাসিক তিনি ঘটনাচক্রে মাত্র। প্রকৃতপক্ষে তিনি বিপ্লবী স্বামী বিবেকানন্দের পরিপূরক। বিবেকানন্দ Theory,-শরৎচন্দ্র Practice. বিবেকানন্দ Philosophy-তত্ত্ব, শরৎচন্দ্র তার রূপকার, Pictorial interpretation.

শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধে একটা সাধারণ অভিযোগ এই যে তিনি সমস্যার সমাধান করেন নাই—তিনি কিরূপ বিপ্লবী? কিন্তু আমার মনে হয়—এইখানেই শরৎ-চন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। বিপ্লবী সমাধানের উপদেশ দান করেন না—সমাধানের পথ

দেখাইয়া দেন। শরৎচন্দ্র আনুষ্ঠানিক বিপ্লবী নহেন—তিনি ভাবজগতের বিপ্লবী এবং এই কারণেই তিনি বিপ্লবের যুগ প্রবর্ত্তক। তিনি সব্যসাচী নহেন—সব্যসাচীর রথ-সারথী। কণ্ঠে তাঁহার বাজিয়াছে পিনাকীর মহাশঙ্খ—সেই শঙ্খনাদের মধ্যে প্রলয় ও সৃজনের বার্ত্তা। সেই শঙ্খধ্বনিতে ভাব-ভাগীরথী নামিয়াছে—তাহার গতিরোধ করে কাহার সাধ্য। সে ভীম-তরঙ্গ গর্জ্জনে সর্ব্বধ্বংসী ক্ষুধার বিভীষিকা, কিন্তু সেই তরঙ্গোচ্ছ্বাস বিশ্ব-মানবের আত্ম-চেতনার সাগর-সঙ্গমে যখন যুক্ত হইতে চলিল তখন তীরে তীরে তরুণ সৃষ্টির শ্যামলিমা আপনি বিকশিত হইবে। নদীর স্বাভাবিক ধর্ম্মই তো এই। তাই এই নদীর প্রবাহ আপন জটাজুট হইতে মুক্ত করেন ধ্বংস ও সৃষ্টির বিধাতা শিব।

শরৎচন্দ্র এই শিব শক্তির প্রকাশ। এই জানিয়াই তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

আজ এই শান্ত শরতের সায়াহ্ন-বেলায় বর্ষণক্লান্ত মেঘমালার সমারোহে লোকালয় হইতে বহুদূরে নির্ম্মল প্রান্তর মধ্যে সামান্য কয়েকজন মানুষের, ঐ যুগমানবের চরণে এই পূজা, মহাকালের হিসাবের খাতায় হয়ত অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর একটা ঘটনা,—কিন্তু ব্যক্তিগত চেতনার মহাকাব্যে আজিকার এই একটি প্রণামের মূল্য তুচ্ছ নয়।

শরৎচন্দ্র এবং আমরা

ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী

১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মশতবার্ষিকী পালিত হবে। অবশ্য শরৎসাহিত্যর বয়স প্রকৃতপক্ষে একশো বছর হয়নি। তবু প্রায় পঁচাত্তর বছরের সময় সীমাও খুব কম নয়। শরৎ সাহিত্যের আবেদন আধুনিক বাঙালী মনে কতোখানি এবং তা কোন্ কারণে—এই জিনিসটি মোটামুটি যাচাই করে নেবার পক্ষে এই সময় সীমাই যথেষ্ট। জন্মশতবার্ষিকীতে ব্যক্তিবিশেষের মূল্যা-য়নের ক্ষেত্রে অহেতুক শ্রদ্ধা নিরপেক্ষকে আচ্ছন্ন করে সাধারণতঃ ভাবপ্রবণ সমাজের কটুক্তি উপেক্ষা করে শতবার্ষিক মূল্যায়ন নিরপেক্ষভাবে করা সম্ভবপর হয় না। মূল্যায়নে কিছু ভালো ও মন্দ থাকবেই।

শরৎসাহিত্যে আমরা যে সমাজের সাক্ষাৎকার পাই, তা আজকের বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। কিন্তু আগেকার যুগের বাঙালী সমাজের নিখুঁত দলিলচিত্র আমরা এই শরৎসাহিত্যে পাই। বর্তমানের সমাজ তার থেকে অনেকখানি পরিবর্তিত হলেও, যে পথ পেরিয়ে এই পরিবর্তন এসেছে, সেই পথের কথা শরৎ-চন্দ্রই প্রথম আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেইজন্য তিনি অবশ্যই আমাদের শ্রদ্ধার্হ।

শুধু সমাজেই নয়, এই পঁচাত্তর বছরে আমাদের পাঠক মনেও যথেষ্ট পবিবর্তন এসেছে। সেইজন্য, বিংশ শতকের প্রথমদিকে শরৎ সাহিত্যের সব গ্রন্থই যে ধরণের চাহিদা সৃষ্টি করতো, তাব প্রেম, তার রোমান্স যে রকম দারুণ জনপ্রিয়তা অর্জন করতো,—বিশ শতকের এই চতুর্থপাদের সুরুতে ততোটা জনপ্রিয়তা আর চোখে পড়ে না। অরক্ষণীয়া, দত্তা, দেবদাস, পরিণীতা ইত্যাদি গল্পের রোমান্স আজকের যুবকের কাছে দারুণ কিছু তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে সস্তা সেন্টিমেণ্ট বলে মনে হয়ে থাকে। প্রেম নামক মানসবৃত্তিটি চিরকালের হলেও, সমাজ মানসের পরিবর্তনে তার প্রকাশেরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে।

একটি বিশেষ বয়সের কাছে শরৎচন্দ্রের কিছু কিছু উপন্যাস ভালো লাগলেও

পরিণত মানসের কাছে তা আজ আর ততোটা আদরণীয় বলে মনে হচ্ছে না। তার কারণ সম্পর্কে আজকের সমালোচকের মত এই যে, শরৎসাহিত্যে আবেগের চর্চা যতোটা হয়েছে, বুদ্ধিবৃত্তি বা মননের চর্চা ততোটা হয় নি। আজকের সমাজজীবন অনেক বেশি জটিল। সেই জটিলতার সমধর্মী কিছু উপাদান শরৎসাহিত্যে নেই।

শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রগুলির আদর্শ হচ্ছে প্রশ্নহীন পাতিব্রত্য। এই পাতিব্রত্য এবং সনাতন নারীত্বের আদর্শ নিয়েই শরৎসাহিত্যে যাবতীয় শিল্পকর্মের বিস্তার। কিন্তু মানবজীবনের আরও বহু বিচিত্র দিক নিয়ে যে নারীকে আমরা প্রতিদিন দেখি, শরৎসাহিত্যে সেই নারীর কোনো প্রতিলিপি নেই। শরৎচন্দ্রের শেষপ্রশ্ন-এর কমল্ বা চরিত্রহীন-এর কিরণময়ী যে অর্থে আমাদের কাছে অনেক বেশি বাস্তব, শরৎসাহিত্যের আর কোনো নায়িকা—এমন কি রাজ-লক্ষ্মীকেও আজ আমাদের ততোখানি বাস্তব বলে মনে হয় না। কমল এবং কিরণময়ী—এই চরিত্রদুটি শরৎসাহিত্যের নারীচরিত্রের বিস্ময়কর ব্যতিক্রম; এবং আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিপ্লবী নারী চরিত্রের সার্থক পুরোধা।

শরৎসাহিত্যের পুরুষ চরিত্রগুলি নিদারুণ হতাশাব্যঞ্জক বলে আজকের দৃষ্টিতে মনে হয়। সমাজ ও সংসারের মধ্যে নারীমহিমা পরিস্ফুট করতে গিয়ে এই সমাজ ও সংসারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ পুরুষ শরৎসাহিত্যে প্রায় অবাস্তব বলেই মনে হয়। দেনাপাওনা উপন্যাসের জীবানন্দ হঠাৎ প্রজাদরদী হয়ে উঠে নিজের ও নিজের দলের বিপদ ডেকে আনছে; দত্তা উপন্যাসের রাস-বিহারী বিলাসবিহারী—সবাই অবাস্তব আচরণ করছে; নরেন, শ্রীকান্ত বা দেবদাস প্রভৃতি নায়করা খ্যাপাটে আচরণ করছে;—এজাতীয় ঘটনা এখন আমাদের চোখে অত্যন্ত বিসদৃশ বলে মনে হয়। আজকের পুরুষচরিত্র অনেক বেশি মানসিক দ্বন্দ্বে ভোগে, নিজের সঙ্গে সংঘাতে সে অনেক বেশি ক্ষয় পায়, কিন্তু তার বাহ্য আচরণে সে কোনো অসঙ্গতি ঘটতে দিতে চায় না। কারণ নিজের পরিপার্শ্ব সম্বন্ধে সে অত্যন্ত সচেতন। এমন কি প্রেমের ক্ষেত্রেও সে নারীর কাছেও বিন্দুমাত্র দুর্বলতা প্রকাশ করতে চায় না। তাকে সে প্রেমের অপমান বলেই মনে করে।

শরৎচন্দ্র শেষপ্রশ্নে বা চরিত্রহীনে যতোই সাহসের পরিচয় দিন, একমাত্র গৃহদাহ-এর সুরেশ চরিত্র ছাড়া কোথাও তিনি রক্তমাংসের প্রেম দেখাতে পারেন নি। দেহবাদী প্রেমের ক্ষেত্রে তিনিও বঙ্কিমের মতো শুচিতাবাদী। সে ক্ষেত্রেও

রোহিনীর মতো দেহবাদী প্রেমিক সুরেশকে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে পাপ মোচন করতে হয়েছে। শ্রীকান্ত-রাজলক্ষ্মী, বিজয়া-নরেন বা রমা-রমেশ অতো কাছাকাছি থেকেও বিন্দুমাত্র দৈহিক শুচিতা নষ্ট করে নি। এর ফলে আজকের পাঠকের কাছে এই পুরুষ চরিত্রগুলিকে ক্লীব বলে মনে করা বিচিত্র নয়।

আধুনিক সমাজমানস ও ব্যক্তিমানসের জটিলতা শরৎসাহিত্যে খুঁজলে ভুল হবে। কেননা শরৎচন্দ্রের সময়ে যদিও মাত্র পঞ্চাশ বছর পূর্বেও আজকের ব্যক্তি ও সমাজমানস আজকের রূপে প্রকট ছিলো না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর এবং স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালীজীবনে যে বৈপ্লবিক আঘাতসমূহ এসেছে এবং তার মধ্যে দিয়ে যে পরিবর্তন এসেছে, শরৎসাহিত্যে তার প্রতিরূপ খোঁজা বৃথা।

অবশ্য শরৎসাহিত্যের আবেদন একেবারেই ফুরিয়ে গেছে—এটা বলাও সমালোচকের গোঁয়ার্তুমি। শরৎসাহিত্যের আবেদন রয়েছে আবেগের কাছে। সেইজন্য দত্তা, দেবদাস, পরিণীতা বা অরক্ষণীয়া ইত্যাদি বিশেষ সেন্টিমেন্টসর্বস্ব বইয়ের আবেদন আজও আছে। প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবার চিন্তা আজও আমাদের মনে একজাতীয় এফেক্ট সৃষ্টি করে। সনাতন হিন্দুর সতীত্ব এবং নারীত্বের আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে আমাদের সংস্কার আজও শরৎসাহিত্যে তার আশ্রয় লাভ করে। সাহিত্যে বিভিন্ন মননধর্মী দিকের চর্চা যতোই হোক, ব্যক্তিমন যতোই জটিলতা লাভ করুক, আবেগের বা সেন্টিমেন্টের গুরুত্ব জীবনে থাকবেই। শরৎসাহিত্যের চিরকালীন আবেদন সেইখানে।

শরৎসাহিত্যের চিরন্তনত্ব বিচারে আরো কয়েকটি দিক উল্লেখযোগ্য। প্রথমত তাঁর গল্প উপন্যাসের পার্শ্বচরিত্রগুলি। গৃহদাহ-এর মৃণাল; শেষপ্রশ্ন-এর, আশুবাবু, শ্রীকান্ত-এর গহর বা ইন্দ্রনাথ বা কমললতা বোষ্টমী, অরক্ষণীয়ার পোড়াকাঠ,—এই সব চরিত্রগুলি ছোটো হলেও এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো দীপ্ত। এদের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন নেই। দ্বিতীয়ত শরৎচন্দ্রের ভাষা। এই ভাষা ও সংলাপের ক্ষেত্রে শরৎসাহিত্য অনেক আধুনিক সাহিত্যের চেয়েও আধুনিক। এই ভাষার গুণেই শরৎসাহিত্য আজও অনেক বেশি পঠিত হয়ে থাকে।

গত পঁচাত্তর বছরের মধ্যে বাঙালীর ব্যক্তিমানস ও সমাজমানস একটি বিশেষ জটিলতা ও আত্মদ্বন্দ্বের মধ্যে এসে পড়েছে। সামাজিক জটিলতার চেয়ে ব্যক্তিমনের জটিলতাই যেন আজ অনেক বেশি বলে মনে হয়। প্রেম, প্রীতি, শ্রদ্ধা ইত্যাদি সম্বন্ধে পরিবর্তিত সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে 'আমিত্বের' সংস্কার ও

মূল্যবোধও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই নিয়ত পরিবর্তিত মানসের কাছে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে শরৎসাহিত্য কতোটা আকর্ষক হবে, তা বলা যায় না। তবে গত যুগের সামাজিক জীবন ও সংস্কার এবং মূল্যবোধের নির্ভরযোগ্য দলিল হিসেবে শরৎসাহিত্য নিশ্চয়ই সম্মান পাবে।

শরৎচন্দ্রের শতবার্ষিকী মূল্যায়ণ আমাদের কাছে অপরিহার্য। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিঃসঙ্কোচ নিরপেক্ষতা শরৎচন্দ্রের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে না। বরং আত্মসন্তুষ্টি তথা আত্মপ্রতারণা আমাদের পরবর্তী বহু মূল্যায়নকে দূষিত করতে পারে। বর্তমান লেখকের পক্ষে কৈফিয়ৎ প্রার্থনা এই দিক স্মরণ করেই।

শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ চৌধুরী

গোষ্পদের মধ্যেও অনন্ত আকাশ বিম্বিত হয়, বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুর রহস্য প্রচ্ছন্ন থাকে। অন্তর্লোকের ক্ষুদ্র একটি অনুভব-তরঙ্গে সমগ্র জীবনকে প্রত্যক্ষ করা যায়। মনুষ্য জীবন বিচিত্র, মানুষের অন্তর্লোক নিঃসীম। ইহার দিক চক্রবালে কখনো পৌছানো যায় না। এপিক্ উপন্যাস শেষ করিয়াও শিল্পীকে বলিতে হয়, সমস্ত কথা বলা হইল না, সমগ্র রহস্যের সন্ধান্ দেওয়া গেল না। উপন্যাসের বিস্তৃতির নির্দিষ্ট সীমা নাই। তাই উপন্যাসের মধ্যে আমরা জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র দেখিতে চাই। অন্তর্লোকের ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রত্যেকটি অনুভূতির বিশ্লেষণ এবং ইহার সামগ্রিক-রূপ উপন্যাসের বিশাল পরিধির মধ্যে বিবৃত হইতে পারে। খণ্ড এবং অখণ্ড দুই ইহার মধ্যে বিভাসিত হয়। এই খণ্ড এবং অখণ্ডের মধ্যে শিল্পী একটি যোগসূত্র আবিস্কার করেন। বিচিত্রতার মধ্যে উহাই ঐক্যের বন্ধন—চরিত্রের ঐক্য, প্লটের ঐক্য। তাই খণ্ড অখণ্ডের উপর আলোক সম্পাত করে, অখণ্ডের দ্বারা খণ্ডের তাৎপর্য পরিস্ফুট হয়। কিন্তু খণ্ডের মধ্যেও জীবনের সমগ্র রূপ বিধৃত হয় না, এমন নহে। অন্তর্লোকের অসংখ্য অনুভবের একটির আলোকেও জীবনের সম্পূর্ণ রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এক একটি ছোট গল্প জীবনের বিচিত্র ধারার এক একটি তরঙ্গ। খণ্ডের নিজস্ব রূপ মাধুরী আছে, এই মাধুর্যের জন্য এবং ইহার মধ্যে বিধৃত সমগ্রের আভাসের জন্য, সাহিত্যে ছোট গল্পের সমাদর।

মহেশ গল্পটির মধ্যে একটি দরিদ্র চাষার জীবনের একটা দিক বিভাসিত হইয়াছে—চাষাটির অন্তর্লোকের একটি সংবেদন। যে দরিদ্র, নিরন্ন, লাঞ্ছিত, অবনমিত, যাহার অন্তঃপুরের লজ্জাসম্ভ্রম পথিকের করুণার উপর নির্ভর করিতেছে, একটি বৃদ্ধ ; অকেজো গরুর জন্য তাহার স্নেহের সীমাপরিসীমা নাই। এই স্নেহ গফুর চাষার লাঞ্ছিত, বিড়ম্বিত জীবনের একটি দিক বটে, কিন্তু গল্পের মধ্যে দেখা যায় ইহাই চরম দিক—জীবনের চরম পরিচয়। তাহার জীবনে যত লাঞ্ছনা জমা হইতেছে, সমস্তই আসিতেছে এই স্নেহের পথ বাহিয়া। অতএব এই

স্নেহানুভূতিকে যদি তাহার অন্তর্লোকের একটি তরঙ্গ বলা যায়, এই তরঙ্গের মধ্যে তাহার সমগ্র জীবনকে প্রত্যক্ষ করি। মনে হয় গফুর চাষার আর সমস্ত পরিচয় মুছিয়া গিয়াছে, সে কেবল একটি দুর্বল, অশক্ত অপ্রয়োজনীয় অ-বোলা জীবের স্নেহাতুর প্রতিপালক। ইহারই জন্য সে পল্লীর জমিদারের হাতে লাঞ্ছিত। ইহার জন্যই গ্রামের তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ভৎ'সনা তাহাকে বিনা প্রতিবাদে সহ্য করিতে হয়, বর্ষার ঘরের মধ্যে মাথা গুজিবার ঠাঁই থাকিবে না, জানিয়াও চালের খড় নামাইয়াও ইহাকে আহার করাইতে হয়, নিজের একমাত্র কন্যার সঙ্গে ছলনার অভিনয় করিয়া, নিজে উপবাসী থাকিয়া এই মূক জীবের সে আহার যোগায়; আবার অদৃষ্টের এমনি বিড়ম্বনা, এই অদ্ভুত স্নেহই দয়াহীন সংসারে প্রতি মুহূর্তে লাঞ্ছিত হইয়া স্নেহের পাত্রেরই মৃত্যুর কারণ হইল। সমগ্র সমাজ যেন চক্রান্ত করিয়া পরম স্নেহশীল চাষাটির হাত দিয়া তাহার পুত্রাধিক স্নেহের পাত্রটিকে নিহত করিল। মহেশ গেল, গফুরের গৃহ-বাসের প্রয়োজনও ফুরাইল।

অতএব আমরা বিন্দুর মধ্যে সিন্ধুকে দেখিলাম। একটি মানুষের একটি মর্মান্তিক সংবেদনের মধ্যে সমগ্র মানুষটিকে দেখিয়া লইলাম।

ছোট গল্পের রস-ঘন নিবিড় পরিবেশের মধ্যে জীবনের অসংখ্য বৈচিত্র্যে ছবি আঁকিবার অবসর না থাকিলেও নিপুণ শিল্পী একটি ঘটনার আলেখ্যের মধ্যেও যে জীবনের মূল সত্যের (মানুষের নিত্য প্রকৃতির) আভাস দিতে পারেন, সমগ্র জীবনের ট্রাজেডি বা আনন্দমূর্তি আঁকিয়া তুলিতে পারেন, তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মহেশ গল্প। মহেশের মধ্যে সমাজচিত্র রহিয়াছে, একাধিক চরিত্রও রহিয়াছে। কিন্তু গফুর চাষার বাৎসল্য কিভাবে ইহাদের হাতে লাঞ্ছিত হইয়াছিল, কেবল সেইটুকু পরিস্ফুটনার জন্যই গল্পের মধ্যে ইহাদের স্থান। লেখক সুকৌশলে দেখাইয়াছেন গো-ব্রাহ্মণ হিতায় যে-হিন্দু জীবন ধারণ করে, তাহার গোভক্তি আর শাস্ত্রজ্ঞানহীন নিরক্ষর মুসলমান চাষার বাৎসল্য-স্নেহের ব্যবধান কোথায়। ব্রাহ্মণ জমিদার শাস্ত্র পূজা করেন, সেই শাস্ত্রের মধ্যে 'গো' শব্দটি আছে—গরু নাই। ছায়া আছে—কায়া নাই। তাই জীবন্ত গো-দেবতার মুখের খড় তিনি কাড়িয়া লন, সঙ্গে সঙ্গে গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শুনাইয়া গো-মাতার নামে মস্তক অবনত করেন। ম্লেচ্ছ গফুর গো-নাম ভজনা করে না। যে-গরুটি একদিন তাহাকে অন্ন দিয়াছে, নিজে উপবাসী থাকিয়া তাহার আহার জোগায়, গো-পূজারী হিন্দুসমাজের পীড়ন সহ্য করে।

অভাগীর স্বর্গ। গল্পটির মধ্যেও ছোট্ট একটি সমাজচিত্র রহিয়াছে—গ্রামের

সঙ্গতিসম্পন্ন ঠাকুরদাস মুখুজ্যে, তাহার পুত্র, স্থানীয় জমিদারের গোমস্তা অধর রায়, তাহার পাইক পেয়াদা, অভাগীর স্বামী রসিক বাঘ, ঈশ্বর বাগ্‌দি, বিন্দির পিসি ইত্যাদিকে লইয়া এই সমাজ। কিন্তু অভাগীর একটি মাত্র শেষ ইচ্ছার সঙ্গে ইহাদের যতটুকু সম্পর্ক, তাহার অধিক কিছু এই সমাজ চিত্রের মধ্যে নাই।

ঠাকুরদাস মুখুজ্যের ভাগ্যবতী স্ত্রীর চিতার আগুন জ্বলেবো অভাগীর চোখে স্বপ্নের ঘোর লাগাইয়াছিল। অভাগী, কাঙ্গালিনী, অস্পৃশ্যদের বহু উঁচুতে যে-ভাগ্যবতীরা বাস করেন, জীবনে তাঁহাদের সমকক্ষ হইবার দুরাশা কোনো অভাগী স্বপ্নেও মনে স্থান দেয় না। কিন্তু এই অভাগী কেমন করিয়া বুঝিল ভগবানের উর্ধ্বলোকে জাত বিচার নাই। বড় ছোট-র ভেদ নাই। মৃত্যুর পরে পেটের সন্তানের হাতের আগুনটুকু পাইলে তাহার মতো চিরদুঃখিনীর জন্যও স্বর্গের সোনার রথখানি আসিয়া উপস্থিত হইবে—যে রথখানি মুখুজ্যের গৃহিণীকে স্বর্গে লইয়া গেল। সংসারে ইহাদের উপর মানুষের অবিচারের শেষ নাই বলিয়াই ভগবানের সুবিচারের উপর ইহাদের বিশ্বাসের সীমা থাকে না। চির দুঃখী বলিয়াই ভাবিতে বসে কাঙাল বলিয়া দুঃখী বলিয়া দেবতা তো পায়ে ঠেলিবেন না।

অভাগীর স্বপ্ন, কাঙালিনীর স্বপ্ন, সফল হইতে পারিল না। দুঃখীর বহু স্বপ্ন, বহু আশার উপর দিয়া হৃদয়হীন সমাজ চিরকাল যেমন তাহার অত্যাচারের রথ টানিয়া লইয়া যায়, কাঙালীর জননীর অতি তুচ্ছ স্বপ্নও সেই রথচক্রে পিষ্ট হইয়া ধুলায় মিশিল। অভাগী পেটের সন্তানের হাতের আগুন পাইল না। অধর গোমস্তা, তাহার পাঠক পেয়াদা, অভাগীর নিজের হাতে-পোঁতা গাছটিও কাটিতে দিল না। ঠাকুরদাস মুখুজ্যের দয়া হইল না, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ নন্দন কাঙালীর আব্দার শুনিয়া অবাক হইলেন—"সব ব্যাটাই এখন বামুন কায়েত হতে চায়।"

আশ্চর্যই বটে।

শরৎসাহিত্যে পুরুষ

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত

'...শরৎ-সাহিত্যে নারীর প্রাধান্য সর্বজনবিদিত। উপন্যাস-সাহিত্যে তাঁহার প্রধান অবদান এই যে তিনি রমণীকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন। তিনি দেখিয়াছেন যে নারীর শ্রেষ্ঠ পরিচয় ইহা নহে যে সে সাধ্বী স্ত্রী। তাহার আসল পরিচয় এই যে সে নারী; তাহার ধর্মবোধ প্রবুদ্ধ, তাহার লোকনিন্দাভীতি তীক্ষ্ণ, সমাজের অনুশাসন দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, কিন্তু সবাইকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে তাহার দুর্বল হৃদয়। শরৎ-সাহিত্যে পুরুষের স্থান অপেক্ষাকৃত গৌণ। অধিকাংশ উপন্যাসে পুরুষ চরিত্রের অবতারণা করা হইয়াছে নারীচরিত্র বিকাশের সহায়ক হিসাবে। এই সকল পুরুষের স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এমন নহে। তবে মনে হয় যে তাহাদের কাহিনী স্বতন্ত্রভাবে স্রষ্টার প্রতিভাকে উদ্বোধিত করিতে পারিত না; তাহাদের প্রত্যেকেই যে একটি প্রখর ব্যক্তিত্বশালিনী রমনীর চিত্ত উদ্বেলিত করিয়াছে ইহাই তাহাদের জীবনেন্দ্র সব চেয়ে বড় কথা। অবশ্য শরৎচন্দ্রের পুরুষ-চরিত্রের মধ্যেও তাঁহার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের ছাপ রহিয়াছে। সংসারের বিচারে ইহাদের মধ্যে অনেকেই উচ্চস্থান অধিকার করিতে পারে নাই, সম্মান লাভ করিতে পারে নাই; কিন্তু তাহাদের অগৌরবের অন্তরালে যে ব্যক্তিত্ব রহিয়াছে তাহা শ্রদ্ধেয়, যে হৃদয় রহিয়াছে তাহা সহজেই অপরকে আকৃষ্ট করে। সাংসারিক বুদ্ধিতে নীলাম্বর তাহার ভাই পীতাম্বর অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট; অধিকন্তু সে গাঁজা খাইত, এবং কোন প্রকার লাভজনক কাজ করিত না। অথচ, তাহার চরিত্রে যে মহত্ব ছিল, তাহা তথাকথিত ভাল লোকদের মধ্যে পাওয়া যায় না। গোকুল ও প্রিয়নাথ ডাক্তারকে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোক বলা যায় না, কিন্তু তাহাদের নির্বুদ্ধিতার অন্তরালে ঔদার্যের ও সৎসাহসের যে ফল্গুধারা নিরন্তর প্রবাহিত হইত, তাহার তুলনা কোথায়? শরৎ-সাহিত্যে এই এক শ্রেণীর নায়ক আছে; ইহারা সবাই সরল প্রকৃতির লোক এবং বৈষয়িক লাভালাভ সম্বন্ধে তেমন সচেতন নহে। কিন্তু শরৎচন্দ্র আরও কয়েকজন নায়কের চিত্র আঁকিয়াছেন; তাহারা শুধু যে নিষ্কর্মা

তাহাই নহে; তাহাদের চরিত্র কলঙ্কলিপ্ত। প্রথমেই মনে হইবে দেবদাসের কথা। প্রতাপের সঙ্গে দেবদাসের অবস্থাগত সাদৃশ্য আছে, উভয়েই বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাত দ্বারা নিপীড়িত হইয়াছে। কিন্তু প্রতাপের কাহিনী চিত্তজয়ের কাহিনী, তাহার মৃত্যুর মধ্যে সংযমের বিজয় ঘোষিত হইয়াছে। দেবদাসের কাহিনী চিত্তদৌর্বল্যের কাহিনী, তাহার মধ্যে রহিয়াছে অসংযমের কলঙ্ক, পরাজয়ের গ্লানি, কিন্তু তবু গ্রন্থকার তাহাকেই নায়ক করিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রীতি ও সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছেন। 'চরিত্রহীন' উপন্যাসে গ্রন্থকার এই বিষয়ে আরও সাহসী হইয়াছেন। তিনি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন সতীশকে লক্ষ্য করিয়া। সাধু সমাজে সতীশকে যে আখ্যা দেওয়া হইবে, তিনিও তাহাই গ্রহণ করিয়াছেন। ইহার মধ্যে প্রচলিত নীতির উপরে অপ্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ রহিয়াছে; দেবদাসের জন্য তিনি কৃপা ভিক্ষা করিয়া ছিলেন, কিন্তু সতীশের সম্পর্কে তাঁহার সেই সঙ্কোচ ভাব নাই। বরং তিনি যেন জোর করিয়া বলিতে চাহেন যে প্রচলিত নীতি যাহাকে চরিত্রহীন বলিয়া ঘৃণা করিবে, মতের উদারতায়, মনের গভীরতায়, অনুভূতির ব্যাপকতায় সে অনন্যসাধারণ, এমন কি উপেন্দ্রের মত চরিত্রবান্ মহৎ লোকও তাহার কাছে নিষ্প্রভ।

প্রবন্ধান্তরে দেখাইয়াছি যে শরৎসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তথায় রমণী হৃদয়ে অবিশ্রাম দ্বন্দ্ব চলিয়াছে গভীর, আজন্মার্জিত সংস্কার ও উচ্ছ্বসিত, দুরতিক্রম্য হৃদয়াবেগের মধ্যে। যে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া এই সংঘর্ষের সৃষ্টি হইয়াছে তাহার চরিত্রের বৈশিষ্ট্যও এই সংঘর্ষের পরিপুষ্টি সাধনই করিয়াছে, তাহাকে পরিসমাপ্তির পথে অগ্রসর করে নাই। শরৎ-সাহিত্যে যে সকল প্রেমের কাহিনী আছে, তাহাদের নায়কগণ অনুভূতিশীল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অনেকেই অন্যমনস্ক বা উদাসীন। তাহারা নায়িকাদের মনের কথা বুঝে না, অথবা বুঝিলেও সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিতে চাহে না। দেবদাস পার্বতীর মনের কথা জানিত, পার্বতীও সমস্ত সঙ্কোচ পরিত্যাগ করিয়া তাহার কাছে আত্মনিবেদন করিয়াছিল, কিন্তু দেবদাস তাহা উপেক্ষা করিয়াছিল। অবশ্য এই উপেক্ষার মূলে ছিল ভয়—অন্যমনস্কতা বা ঔদাসীন্য নহে। অন্যমনস্কতা চরমে পঁহুছিয়াছিল 'বড়দিদি'-র সুরেন্দ্রনাথে, যদিও সুরেন্দ্রনাথ ঠিক উদাসীন নহে। সে বড়দিদির স্নেহাকাঙ্ক্ষী, শুধু বড়দিদির হৃদয়ের খবর সে রাখে নাই। আর একজনের অন্যমনস্কতা নানা জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল; সে নরেন্দ্রনাথ। বিজয়ার হৃদয়ে সংঘর্ষ হইয়াছিল প্রণয়াকাঙ্ক্ষা ও নারীজনসুলভ সঙ্কোচের মধ্যে; ইহা

দীর্ঘায়ত হইয়াছে নরেন্দ্রনাথের অন্যমনস্কতার জন্য। কিন্তু এই সংঘর্ষ অনতিক্রমনীয় নহে; তাই ইহার পরিসমাপ্তি হইয়াছে বিবাহের আনন্দ-মিলনে।

শরৎচন্দ্রের নায়িকাদের মধ্যে সাবিত্রী সর্বাপেক্ষা ত্যাগশালিনী; সেই জন্যই সতীশকে কবি অন্যমনস্ক বা উদাসীন করিয়া সৃষ্টি করেন নাই। সতীশ সর্বতোভাবে সাবিত্রীকে কামনা করে, তবুও তাহাকে পায় না। (শ্রীকান্তের পক্ষে সেই কথা খাটে না। শ্রীকান্তকে রাজলক্ষ্মী পাইতে চাহে তাহার সম্পূর্ণ মন ও প্রাণ দিয়া, কিন্তু ধর্মবিশ্বাস ও মাতৃত্বের গৌরব শ্রীকান্তকে দূরে সরাইয়া দেয়। শ্রীকান্তকেও শরৎচন্দ্র দিয়াছেন অতিশয় অনুভূতিশীল হৃদয়, অতি তীক্ষ্ণ সম্ভ্রম-বোধ ও একটি ভবঘুরে মন; তাই সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে সে অনায়াসে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে পারে। প্রথম পর্বে রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্তকে বিদায় দিয়াছিল তাহার মাতৃত্বের সম্মান রক্ষা করিবার জন্য। কিন্তু দ্বিতীয় পর্বের প্রথমেই দেখি রাজলক্ষ্মীর সমস্ত ঐশ্বর্য পায়ে ঠেলিয়া শ্রীকান্ত বর্মায় চলিয়া গেল। বর্মা হইতে ফিরিয়া আসিলে পর তাহাদের মিলন হইল বটে, কিন্তু রাজলক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া প্রয়াগ যাইতে অস্বীকার করায় রাজলক্ষ্মী যে কাণ্ড করিয়া বসিল তাহাতে শ্রীকান্ত বুঝিল তাহাদের সম্পর্কের মধ্যে কোথায় অসম্মানের বীজ নিহিত রহিয়াছে। তাই সে তাহাকে অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। গঙ্গামাটিতে রাজলক্ষ্মী সরিয়া গিয়াছে সুনন্দার নিকট, শ্রীকান্তের মন উধাও হইয়াছে বর্মায় অভয়ার উদ্দেশ্যে, সে ভাবিয়াছে অফিসের কাজে ফিরিয়া যাওয়ার কথা। রাজলক্ষ্মী বাহির হইয়াছে তীর্থদর্শনে, শ্রীকান্ত চলিয়া গিয়াছে সতীশ ভরদ্বাজের সদগতি করিতে। চতুর্থ পর্বের প্রারম্ভে এই উদাসীন্য এত চরমে উঠিয়াছে যে শ্রীকান্ত পুঁটুকে বিবাহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছে। তারপর সমস্ত ব্যবধান ঘুচিয়া গেল। শ্রীকান্তের বর্মা অভিযান স্থগিত রহিল, রাজলক্ষ্মীর উৎকট ধর্মচর্চা প্রশমিত হইল। এই অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, কারণ ইহাদের মধ্যে ব্যবধান অন্তর্হিত হইল, অথচ ইহাদের প্রেম ফুলে ফলে সার্থক হইল না। রাজলক্ষ্মীর কাজের সহায় বজ্রানন্দ, তাহার অবসর সময়ে শ্রীকান্তকে অসুস্থ কল্পনা করিয়া সে আদর যত্নের আতিশয্য করিয়া ফেলিয়াছে। শ্রীকান্তও যেন তাহার ব্যক্তিত্ব হারাইয়াছে, সে যেন রাজলক্ষ্মীর অবসর বিনোদনের ক্রীড়নক মাত্র। সেই ব্যক্তিত্ব, সেই বৈরাগ্য সেই ভবঘুরে প্রবৃত্তি—সবই যেন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বিপ্লবী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র

শরৎচন্দ্র বসু

বাংলাদেশের দরদী সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র। বাংলাদেশের মানুষের সুখ দুঃখের কাহিনী তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে অমর হয়ে ফুটে উঠেছে। যে অসংগতি, যে বঞ্চনা আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জীবনকে দুঃসহ পাংশুতার বেদনায় জর্জ্জরিত করে তুলেছে শরৎচন্দ্রের সন্ধানী দৃষ্টি সেই দিকেই প্রসারিত হয়েছে সহানুভূতি, প্রীতি ও সুস্থ সমাজ গড়বার প্রেরণা নিয়ে। বাংলাদেশ তথা সারা ভারতবর্ষের জনতা, যুগসন্ধিক্ষণে এই প্রতিভাদীপ্ত সাহিত্যিকের আবির্ভাবকে স্মরণ করে রাখবে চিরকাল।

বাংলার নিপীড়িত লাঞ্ছিত জনতার বেদনার কাহিনীকে শরৎচন্দ্র মর্ম্মগ্রাহী ভাষায় পৃথিবীর সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। যারা সকলের অবজ্ঞেয়, লোকচক্ষুর অন্তরালে, অন্ধকারে, চোরাগলিতে যাদের আনাগোনা, তাদের কথাই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল সবচেয়ে বেশী। তিনি বুঝেছিলেন আজকের সমাজ যাদের অস্তিত্বকে স্বীকার করতে চায় না, যাদের মধ্যে সাধারণ চক্ষু গ্লানি ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না, তারাই হল সমাজের প্রকৃত মেরুদণ্ড, তাদের প্রাণশক্তিতেই আজও সমাজ বেঁচে আছে। কিন্তু এই বিরাট অসংগতি, এই অর্থহীন অসামঞ্জস্য নিয়ে সমাজ কিছুতেই বেঁচে থাকতে পারে না—তাও এই সত্যদ্রষ্টা সাহিত্যিকের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে থাকে নি, তাই তাঁর সাহিত্যে আমরা দেখেছি ভাবী বিপ্লবের ইঙ্গিত। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের দৃষ্টি নিয়ে এই বিপ্লবকে তিনি উপলব্ধি করেন নি, কেবলমাত্র বৈদেশিক শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই তাঁর অভিযান সীমাবদ্ধ ছিল না। সেখানে যে অন্যায়, যে অত্যাচার তাঁর লক্ষ্যপথে এসেছে তার বিরুদ্ধেই তাঁর লেখনী তীব্রতম ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছে। সর্বরকম অন্যায়, পাপ, অত্যাচারের সমাধির উপর তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছেন স্বাধীন সুস্থ সুন্দরতম সমাজব্যবস্থা, শোষিত জনতাকে অন্ধকার নির্বাসন থেকে তিনি আনতে চেয়েছেন আলোকোজ্জল উন্মুক্ত সরণিতে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি 'পথের দাবী' তে গণমুক্তির এই আহ্বানই ধ্বনিত হয়েছে বারবার। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে আমরা শুনেছি নবজাগ্রত জনতার পদধ্বনি, নিঃসঙ্গ অবহেলিত সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসছে, এগিয়ে আসছে দুর্বার গতিতে, এই অনাগত ইংগিতই আমরা পেয়েছি শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে।